KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number ৪৯/৪ ৪৯/৫ ৪৯/৬ ৪৯/৭	Year of Publication শ্রাবণ ১৩৯৫ || Aug 1988 ভাদ্র ১৩৯৫ || Sep 1988 আশ্বিন ১৩৯৫ || Oct 1988 কার্তিক ১৩৯৫ || Nov 1988 Condition : Brittle Good ✓
Editor : আবদুর রাউফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৪৯ বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা অকটোবর ১৯৮৮

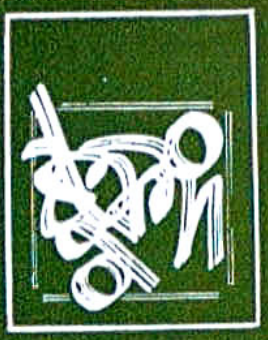

সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জন্মশতবর্ষে তাঁর দর্শনচিন্তা, ছাত্রবৎসল শিক্ষকস্বরূপ এবং রাষ্ট্রপতিরূপে প্রশাসনকে পরিচ্ছন্ন রাখার প্রয়াস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন অধ্যাপক অমিয়কুমার মজুমদার।

পেরেস্ত্রৈকা, গ্লাস্‌নস্‌তের পরিপ্রেক্ষিতে যাঁর পুনর্বাসন ঘটেছে, এমন একজন নেতা যিনি একসময়ে নিন্দিত, এমনকি রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের দায়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত, অকটোবর বিপ্লবের অন্যতম সেই তাত্ত্বিক নেতা নিকোলাই বুখারিনকে নিয়ে অধ্যাপক সুনীল সেনের আলোচনা।

অধ্যাপক বিনয় চৌধুরী তাঁর "ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন" প্রবন্ধের দ্বিতীয় কিস্তিতে আলোচনা করেছেনে কিভাবে জমিদারবিরোধী, নীলকরবিরোধী ফরাজি-ওহাবি আন্দোলন রাজবিরোধী রূপ নিল।

গণতন্ত্রের দাবিতে উত্তাল ব্রহ্মদেশের প্রতি নিবদ্ধ এখন দুনিয়ার দৃষ্টি। এই দেশে দীর্ঘদিন প্রবাসী বাঙালি বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন 'বর্মামুলুকে'র জীবনকাহিনী। শিল্পরসজ্ঞ এবং সমাজতাত্ত্বিক অশোক মিত্রের দ্বারা সম্পাদিত সেই কাহিনী প্রকাশিত হচ্ছে এই সংখ্যা থেকে।

কাশ্মীরী ভাষার চার মহিলা-কবির পরিচয় দিয়েছেন কিরণশঙ্কর মৈত্র।

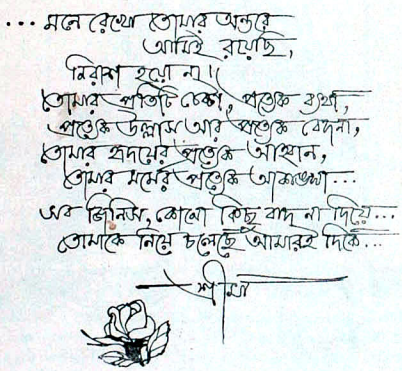

বর্ষ ৪৯। সংখ্যা ৬
অকটোবর ১৯৮৮
আশ্বিন ১৩৯৫

সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণান্ অমিয়কুমার মজুমদার ৪৫৯
নিকোলাই বুখারিন প্রসঙ্গ সুনীল সেন ৪৯০
ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন বিনয় চৌধুরী ৫১৪
বিষয় : ব্রহ্মদেশ বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় ৫৩৪

আমার বন্ধুর বাড়ি সুবেন্দু মল্লিক ৪৮৫
প্রকৃতিমানুষ সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ৪৮৭
কথা থাকতে পারে মতি মুখোপাধ্যায় ৪৮৮
নারীকণ্ঠ মল্লিকা সেনগুপ্ত ৪৮৯

বেড়ালের গপ্পো প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায় ৪৯৯

গ্রন্থসমালোচনা ৫৪১
শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, আজহারউদ্দীন খান, রণেন্দ্রনাথ দেব
কান্তি গুপ্ত

প্রতিবেশী সাহিত্য ৫৫৬
কাশ্মীরের মহিলা-কবি : তাপসী, প্রেমপিয়াসী কিরণশঙ্কর মৈত্র

মতামত ৫৬৪
প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়, বিপ্লব বিশ্বাস, রেখা মুখোপাধ্যায়
সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, অনিলচন্দ্র সাহা

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ৪৪ সাতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে
অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

অলংকারশিল্পে প্রিয় একটি নাম

ডি. কে. চন্দ্র
জুয়েলার্স
৩৪ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-১২ ফোন ঃ ২৬-৮৫৩৯
(লালবাজারের কাছে)

সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণান্

অমিয়কুমার মজুমদার

সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণান্ ১৮৮৮ সালে ৫ই সেপটেম্বর দক্ষিণ ভারতে চিতুর জেলার অন্তর্গত তিরুত্তানি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ভেলোরের ভুর্হিস কলেজ ও মাদ্রাজ খ্রীষ্টান কলেজে অধ্যয়ন করে ১৯০৯ সালে দর্শনে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। এম. এ. পরীক্ষায় তিনি একটি গবেষণানিবন্ধ পেশ করেছিলেন যার বিষয় ছিল বেদান্তে নীতিশাস্ত্রের ভূমিকা। কোনো-কোনো খ্রীষ্টান মিশনারিদের একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে বেদান্তদর্শনে নীতিবোধের কোনো স্থান নেই। এই অভিযোগের প্রত্যুত্তর হিসাবেই রাধাকৃষ্ণান্ ওই নিবন্ধটি লেখেন এবং তাঁর অধ্যাপক এ. জি. হগ-এর কাছ থেকে প্রভূত প্রশংসা লাভ করেন। রাধাকৃষ্ণানের প্রতিভা অধ্যাপক হগকে এত মুগ্ধ করেছিল যে, তিনি রাধাকৃষ্ণানের এম. এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে মাদ্রাজ প্রেসিডেনসি কলেজে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে নিয়োগ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই রাধাকৃষ্ণানের অধ্যাপনার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে, এবং তিনি দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের সরল এবং হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যাতা হিসাবে পণ্ডিতসমাজের অভিনন্দন লাভ করেন। ১৯১৬-১৭ সালে তিনি পূর্ণ মর্যাদায় অধ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত হলেন। সেই সময় মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আমন্ত্রণ পান এবং সেখানে ১৯১৮ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি অধ্যাপনায় রত ছিলেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ড. রমেশচন্দ্র মজুমদারের বড়ো ভাই সতীশচন্দ্র মজুমদার সর্বভারতীয় সেচ বিভাগের ইনজিনিয়ার হিসাবে সেই সময়ে মহীশূরে কার্যোপলক্ষে বাস করছিলেন। তখন রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে সতীশ মজুমদার মহাশয়ের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। ভারতীয় দর্শনের নানাদিক আলোচনা প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণানের মনীষা এবং বিচারবুদ্ধি সতীশবাবুকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে, এবং তিনি তাঁর ভাই রমেশচন্দ্রকে একটি চিঠিতে জানান যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. ব্রজেন্দ্রনাথ শীল শীঘ্রই অবসর নেবেন, সেই শূন্যপদে যদি রাধাকৃষ্ণান্‌কে নিয়োগ করা হয়, তাহলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সবদিক দিয়ে লাভবান হবেন। এই প্রস্তাব যদি তদানীন্তন উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর কাছে পেশ করা যায় তাহলে তিনি নিশ্চয়ই এই অসামান্য-প্রতিভাসম্পন্ন দার্শনিককে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগের কথা বিবেচনা করবেন। এই ব্যাপারে যাতে রমেশচন্দ্র একটু তৎপর হন, সেইরকম নির্দেশ দিয়ে অগ্রজ সতীশচন্দ্র রমেশচন্দ্রকে চিঠি লেখেন। স্যাডলার কমিশনের কাজ উপলক্ষে স্যার আশুতোষকে সেইসময় মহীশূরে যেতে হয়। তিনি রাধাকৃষ্ণান্‌কে তাঁর

সঙ্গে দেখা করবার জন্য নির্দেশ দেন। রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় স্যার আশুতোষ মুগ্ধ হন এবং তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগে প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন। সেই সময় এই পদটির নাম ছিল "কিং জর্জ দি ফিফথ্ প্রফেসর অব মেনটাল অ্যানড মরাল সায়েন্স"। (বর্তমানে এই পদের নামকরণ হয়েছে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রফেসরশিপ অব ফিলসফি।) রাধাকৃষ্ণান্ এই পদে প্রথমে ছিলেন ১৯২১ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত; তারপরে ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি আন্ধ্রা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন, এবং ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন।

১৯২৬ সালে তিনি প্রথম ইংল্যানডে যান। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন দার্শনিক পত্রিকায় রাধাকৃষ্ণান্ মাঝে-মাঝে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য পাঠাতেন। তাঁর বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ ইনটারন্যাশনাল জার্নাল অব এথিক্স্, মনিস্ট, কোয়েস্ট এবং হিবার্ট জার্নালে প্রকাশিত হয়। এই সময় রাধাকৃষ্ণান্ রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি রচনাবলী গভীরভাবে পড়তে শুরু করেন। হিন্দুর নীতিশাস্ত্র, মায়াবাদ, সর্বমুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে রাধাকৃষ্ণান্ তাঁর নিজের মতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য লক্ষ করে তৃপ্তি এবং আনন্দ লাভ করেন। ১৯১৮ সালে রবীন্দ্রনাথের উপর তাঁর লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধের একটি সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। বইটির নাম দেওয়া হয় "দি ফিলসফি অব রবীন্দ্রনাথ টেগোর"। এই বইটি ১৯১৯ সালে পুনরমুদ্রিত হয়, কিন্তু রাধাকৃষ্ণান্ এই বইটিকে আর প্রকাশযোগ্য মনে করেন নি। তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে, যেহেতু সমগ্র রবীন্দ্ররচনাবলী বাঙলা ভাষার মাধ্যমে পড়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, সেজন্য সামান্য কয়েকটি ইংরাজি অনুবাদ এবং কয়েকটি মূল ইংরাজি গ্রন্থের উপর নির্ভর করে রবীন্দ্রদর্শনের গভীরতা এবং ব্যাপকতা পরিমাপ করা তাঁর পক্ষে সুকঠিন। তবুও এ কথা স্বীকার করতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ ওই বইটির এক কপি লেখকের কাছ থেকে শ্রদ্ধানিদর্শনস্বরূপ হাতে পেয়ে গভীর আনন্দে রাধাকৃষ্ণান্কে জানিয়েছিলেন, যে রবীন্দ্রদর্শনের মূল্যায়নে তিনি যে অসামান্য অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন এবং সুললিত ভাষায় দার্শনিকের তাত্ত্বিক ও কূট সূত্রভাষ্য বর্জন করে কবির জীবনতত্ত্বের সরস এবং প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা পরিবেশন করেছেন, তা কবিকে মুগ্ধ করেছে।

হিবার্ট জার্নালে রাধাকৃষ্ণানের প্রবন্ধগুলি পড়ে ওই পত্রিকার সম্পাদক ড. এল. পি. জ্যাক্স্ (তিনি অক্স্ফোর্ডের ম্যানচেস্টার কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন) মুগ্ধ হন এবং ওই কলেজের তরফ থেকে তাঁকে 'আপটন্ লেকচার' দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানান। এই বক্তৃতামালা পরবর্তী কালে "দি হিন্দু ভিউ অব লাইফ" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন। ১৯২৬ সালে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে রাধাকৃষ্ণান্ দুটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন। একটির নাম "দি কংগ্রেস অব দি ইউনিভার্সিটিজ অব দি ব্রিটিশ এমপায়ার"; অপরটি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত "ইনটার-ন্যাশনাল কংগ্রেস অব ফিলসফি"।

"দি হিন্দু ভিউ অব লাইফ" বইটিতে রাধাকৃষ্ণান্ হিন্দুধর্মকে একটি প্রগতিশীল মানবিক আন্দোলন বলে বর্ণনা করেছেন। ১৯২৯ সালে রাধাকৃষ্ণান্ অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে "হিবার্ট লেকচার" দেবার জন্য আমন্ত্রিত হন। এই বক্তৃতামালা "অ্যান আইডিয়ালিস্ট ভিউ অব লাইফ" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণানের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, হিন্দুধর্মের সত্যগুলিকে বুদ্ধি-বিচারের দ্বারা পাওয়া যায় না, এই সত্যগুলি পাওয়া যায় অপরোক্ষানুভূতির মাধ্যমে।

রাধাকৃষ্ণানের প্রচেষ্টায় ইনডিয়ান ফিলসফিক্যাল কংগ্রেস নামে দর্শনশাস্ত্রের ছাত্র ও অধ্যাপকদের এক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৫ সালে। এই সংস্থার প্রথম অধিবেশনে মূল সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯২৭ সালের অধিবেশনে মূল সভাপতি হলেন রাধাকৃষ্ণান্ স্বয়ং এবং ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তিনি এই কংগ্রেসের কার্যকর সমিতির সভাপতি ছিলেন। ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণান্ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টগ্র্যাজুয়েট কাউন্সিল্ ইন্ আর্টস-এর সভাপতি ছিলেন। ১৯৩১ সালে তিনি এক বিশেষ সম্মান লাভ করেন। তিনি ১৯৩১ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত একটি প্রখ্যাত সংস্থার মনোনীত সদস্য হিসাবে কাজ করেছেন যে সংস্থার নাম "লীগ অব নেশনস্ কমিটি ফর ইন-টেলেকচুয়াল কো-অপারেশন"।

অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন স্পলডিং প্রফেসর অব ঈস্টার্ন রিলিজনস্ অ্যানড এথিক্স্-পদের সৃষ্টি হয় তখন ওই পদে প্রথম অধ্যাপক রূপে ১৯৩৬ সালে রাধাকৃষ্ণান্ যোগদান করেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৮ সালে রাধাকৃষ্ণান্ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকরূপে, কিং জর্জ ষ্ঠ ফিফ্থ্ প্রফেসর অব মেনটাল অ্যানড ম্যরাল সায়েন্স্ পদে যোগদান করেন। এই সময়ে ব্যবস্থা ছিল রাধাকৃষ্ণান্ বছরের ছয় মাস থাকবেন অক্স্ফোর্ডে আর ছয় মাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। উনি যখন অক্স্ফোর্ডে অধ্যাপনা করতেন তখন ওঁর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কাজ তিনজন ভাগ করে নিতেন। এই তিনজন হলেন ড. রমা চৌধুরী (তখন কুমারী রমা বসু), সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং আবু সয়ীদ আইয়ুব।

১৯৩৭ সালে তিনি স্টিফেনস্ নির্মলেন্দু ঘোষ স্মারক বক্তৃতামালায় তাঁর ভাষণ দেওয়ার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হন। এই বক্তৃতামালার অন্যতম শর্ত ছিল যে নির্বাচিত বক্তা খ্রীষ্টধর্মের গরিমা এবং প্রাধান্য প্রতিপন্ন করবেন। রাধাকৃষ্ণান্ এই শর্ত মানতে রাজি হন নি। তিনি তাঁর বক্তৃতামালায় এই সত্যই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন যে বেদান্তই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম যার মাধ্যমে সর্বধর্মসমন্বয় সম্ভব হতে পারে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে নয়দিন-ব্যাপী তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্যে বিপুল জনসমাগম হয়েছিল। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অনেককেই হলের বাইরে সিঁড়িতে, বারান্দায় এবং প্রাঙ্গণে বসে সেই ভাষণ শুনতে হয়েছিল। প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা ওই বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই রাধাকৃষ্ণানকে এই বলে অভিযুক্ত করেছিলেন যে তিনি অদ্বৈত বেদান্তের অপব্যাখ্যা করেছেন; তিনি হেগেলের চোখ দিয়ে শংকরাচার্যকে দেখেছেন। প্রত্যুত্তরে রাধাকৃষ্ণান্ বলেছিলেন: 'এ পর্যন্ত বেদান্তের যে কয়টি ভাষ্য রচিত হয়েছে তার মধ্যে রাধাকৃষ্ণান্-ভাষ্য সর্বকনিষ্ঠ এবং আধুনিকতম। একমাত্র মহাকাল বিচার করবে যে আমি শংকরাচার্যের অদ্বৈতবেদান্তের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পথভ্রষ্ট হয়েছি কিনা।'

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে রাধাকৃষ্ণান্ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যপদ গ্রহণ করেন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের আমন্ত্রণে। কিন্তু উপাচার্যের বেতন তিনি গ্রহণ করতেন না। ১৯৪১ সালে তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করেন যে পদের নাম স্যার সয়াজীরাও গায়কোয়াড প্রফেসর অব ইনডিয়ান কলেচার অ্যানড সিভিলাইজেশন। ১৯৪২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে তিনি কমলা বক্তৃতামালায় ভাষণ দেন এবং এই ভাষণ "রিলিজন অ্যানড সোসাইটি" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯৪৪ সালের মে মাসে চীন সরকারের আমন্ত্রণে রাধাকৃষ্ণান্ চীনদেশের বিখ্যাত চিন্তানায়কদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন এবং বারোটি ভিন্ন-ভিন্ন বিষয়ে ভাষণ দেন। ১৯৪৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা

বিষয়ে বক্তৃতা করেন; এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হার্ভাড, কর্নেল, ইয়েল, মিশিগান এবং লস এনজেলেস। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণান্ ইউনেসকোর কার্যকর সমিতির অন্যতম সদস্যপদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৮ সালে তিনি এই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। রাধাকৃষ্ণান্ই প্রথম ভারতীয় যিনি ব্রিটিশ অ্যাকাডেমির ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন। ব্রিটিশ অ্যাকাডেমির আমন্ত্রণে তিনি তাঁদের বার্ষিক বক্তৃতামালায়—যার নাম ছিল মাস্টার মাইনড বক্তৃতামালা—গৌতমবুদ্ধ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁর বক্তৃতা এত তথ্যপূর্ণ, মনোজ্ঞ হয়েছিল যে কোনো এক বিশিষ্ট সাময়িক পত্রিকা মন্তব্য করেছিল যে এক মনীষীর ওপর আর-একজন মনীষীর ভাষণ ('অন এ মাস্টার মাইনড বাই এ মাস্টার মাইনড')। এ ছাড়া তিনি আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানারকম সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৪৯ সালে তিনি অল ইনডিয়া পি. ই. এন.-এর সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৮-৪৯ সালে তিনি ভারতের কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলির অন্যতম সদস্য হিসাবে স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনায় যোগদান করেন। ১৯৪৯ সালে তিনি সোভিয়েত রাশিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। সেই সময় সোভিয়েত প্রধান স্তালিন তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে সংবর্ধনা জানান। বর্তমান লেখককে রাধাকৃষ্ণান্ বলেছিলেন তিনি তাঁর গ্রন্থাবলীর অখণ্ড সংকলন স্তালিনকে উপহার দিয়েছিলেন। তিনি সন্দিহান ছিলেন যে স্তালিন আদৌ রাধাকৃষ্ণানের ধর্ম এবং দর্শন সংক্রান্ত বইগুলি পড়বেন কিনা। রাষ্ট্রদূতের পদ থেকে বিদায় নেবার সময়ে স্তালিন তাঁর নিজের পাঠকক্ষে রাধাকৃষ্ণানকে আহ্বান করেন এবং ঘরোয়া আলোচনার সময়ে রাধাকৃষ্ণান্ লক্ষ করেন যে তাঁর "ইনডিয়ান ফিলসফি" ও অন্যান্য বইগুলি স্তালিন শুধু যত্নসহকারে পড়েছেন তাই নয়, বরং প্রয়োজনবোধে বইগুলির নানা জায়গায় ব্যক্তিগত মন্তব্য লিখে রেখেছেন।

১৯৫২-র মে মাসে তিনি ভারতের উপরাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণ করেন এবং পরে রাষ্ট্রপতিপদে উন্নীত হন। ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে ইনটারন্যাশন্যাল পি. ই. এন.-এর ৩০তম অধিবেশনে রাধাকৃষ্ণান্ জার্মানির সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত হন; তাঁকে গোটে মেডাল অব দি সিটি অব ফ্রাঙ্কফুর্ট দেওয়া হয়। এই সম্মানের যাঁরা আয়োজন করেছিলেন তাঁরা রাধাকৃষ্ণানকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর বিপুল সাহিত্যসম্ভারের মাধ্যমে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে একটি মিলনের সেতু রচনা করেছেন এবং যাতে পূর্ব ও পশ্চিম, উভয় উভয়কে ঠিকমত বুঝতে পারে তার জন্যে আজীবন নিরলস সাধনা করেছেন। গ্যেটের প্রসিদ্ধ উক্তি 'পূর্ব ও পশ্চিম আর পৃথক হয়ে থাকতে পারে না' রাধাকৃষ্ণানের জীবনে সকল প্রকারে সার্থক হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১৭ এপ্রিল এই লোকোত্তর প্রতিভাসম্পন্ন দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, ভারতীয় সাধনা ও সংস্কৃতির সুযোগ্য ধারক ও বাহক এবং সর্বোপরি অনন্যসাধারণ মানবমিত্র রাধাকৃষ্ণানের জীবনাবসান ঘটে।

হিন্দুধর্ম : বেদান্ত

মানবজীবনে ধর্মের ভূমিকা কী, এই প্রশ্নের আলোচনা করতে গিয়ে রাধাকৃষ্ণান্ প্রথমেই হিন্দুধর্মের বৈশিষ্ট্য বিচার করেছেন। মানুষ যে অমৃতের পুত্র, অখণ্ড ভাগবত শক্তির খণ্ড প্রকাশ, এইটাই সার সত্য। এই সত্যের উপলব্ধি একমাত্র অপরোক্ষানুভূতির দ্বারাই সম্ভব।

রাধাকৃষ্ণান্ অবশ্য বিচারবিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন না; তাঁর বিশ্বাস এই যে, যেহেতু সৃষ্টির নানাদিক পরস্পরের সঙ্গে সমন্বয়ে আবদ্ধ, সেইজন্য যে মাধ্যমের দ্বারা চরম সত্যকে উপলব্ধি করতে হবে সেই মাধ্যম খণ্ড, সঙ্কীর্ণ এবং সীমিত

হতে পারে না। বুদ্ধি এবং বোধি আলো এবং অন্ধকারের মতো পরস্পরবিরুদ্ধ নয়। বুদ্ধি পরিমার্জিত হলে এবং আধ্যাত্মিক শক্তি তার মধ্যে সঞ্চারিত হলে বুদ্ধি বোধিতে পরিণত হয়। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সময় রাধাকৃষ্ণান্ আবিষ্কার করেছেন যে, অনন্তের পথে যাত্রী হিসাবে তিনি একক এবং অসঙ্গ নন। তাঁর সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায় প্লেটো, প্লটাইনাস্, সেনট পল, সেনট অগাস্টিন্, লুথার এবং প্যাস্কাল্-এর চিন্তাধারার মধ্যে। রাধাকৃষ্ণানের মতে, ব্রহ্মকে যেখানে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্ বলা হয়েছে, সেখানে "শান্ত" কথার অর্থ এমন নয় যে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর এক অসীম সমুদ্রের মধ্যে শান্ত সমাহিতভাবে অবস্থান করছেন, এবং জীব ও জগৎ সেই অনন্ত শান্ত সমুদ্রে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। যাঁরা বলেন যে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তাঁরা ভুলে যান যে ঈশ্বরের সৃষ্টি মানুষের সৃষ্টির মতন নয়। ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টি কবির কাব্যসৃষ্টির মতন, এই সৃষ্টি দেশে কালে নিবদ্ধ হয়ে থাকে না। ঈশ্বরের সৃষ্টি চিরন্তন সৃষ্টি, নিত্যকালের সৃষ্টি। ঈশ্বর এবং ব্রহ্ম সম্পর্কে দার্শনিকদের চুলচেরা মতপার্থক্য রয়েছে। রাধাকৃষ্ণান্ সেই সমস্যার সমাধানকল্পে বলেছেন যে, ঈশ্বর এবং ব্রহ্ম উভয়েই চিৎশক্তি। ব্রহ্ম দেশকাল-রহিত, অব্যয়। ঈশ্বর সেই ব্রহ্মেরই একটি প্রকাশ বা একটি ভঙ্গিমাত্র। এই সিদ্ধান্তে আসার মূলে যে দুজন দার্শনিকের মত রাধাকৃষ্ণান্কে প্রভাবিত করেছে, তাঁদের মধ্যে একজন হলেন বিবেকানন্দ, অপরজন শ্রীঅরবিন্দ। বিবেকানন্দ-এর প্রতি ঋণ রাধাকৃষ্ণান্ বহু জায়গায় স্বীকার করেছেন, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের প্রতি তিনি প্রকাশ্যে ঋণ স্বীকার না করলেও তাঁর অজস্র রচনাবলীর মধ্যে শ্রীঅরবিন্দের প্রভাব সুস্পষ্ট। ১৯৬৩ সালে ২০শে জানুয়ারি কলকাতায় স্বামী বিবেকানন্দের শতাব্দী জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন: 'যখন আমি ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস অথবা তার কাছাকাছি কোনো ক্লাসের ছাত্র ছিলাম, তখন আমরা অদম্য উৎসাহে স্বামীজির পত্রাবলী বহু সংখ্যায় নকল করে ছাত্রসমাজের মধ্যে বিতরণ করতাম। স্বামীজির রচনাবলী পড়ে যে রোমাঞ্চ অনুভব করেছি, যে আশার আলোক দেখেছি, যে আত্মপ্রত্যয়ের সন্ধান পেয়েছি, তা তুলনাহীন। স্বামীজির রচনাবলীর মধ্যে এক অসামান্য সম্মোহনী শক্তি ছিল যা তরুণ চিত্তকে অতি সহজে আকৃষ্ট করত। তাঁর রচনাবলী পড়ে আমরা তরুণ বয়সেই উপলব্ধি করেছি যে তিনি যে ধর্মের কথা বলতেন সেটা মানুষ গড়ার ধর্ম। তিনি তাঁর জীবন দিয়ে স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন যে, ধ্যানের জগৎ আর সমাজ-সেবার জগৎ—এ দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ নয়; একই সত্যের এপিঠ আর ওপিঠ। স্বামীজি উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অপরিমেয় আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। সেই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে মানুষ ধীরে-ধীরে নিজেকে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যায়। এই পরিপূর্ণতা অবাধ অর্থসঞ্চয়ের মধ্যে নেই, নেই খ্যাতি আর প্রতিপত্তির মধ্যে। এই পরিপূর্ণতা রয়েছে মানুষের হৃদয়কন্দরে, যেখানে অসীমের স্পর্শ মানুষকে নিরন্তর এমন প্রেরণা দেয় যাতে সে বহু মানবের মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে পারে; জীবকে শিবরূপে উপাসনা করতে পারে।'

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর "লাইফ ডিভাইন" গ্রন্থে যে সত্যদৃষ্টির সন্ধান দিয়েছেন, তারই প্রতিধ্বনি রাধাকৃষ্ণানের অসংখ্য রচনাবলীর মধ্যে প্রকট রয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের মতে সত্যকারের অদ্বৈতদৃষ্টি আসলে সেই দৃষ্টি যা জগৎচরাচরে সকল বস্তুকেই ব্রহ্মের প্রকাশ বলে গ্রহণ করে। অদ্বৈতদৃষ্টি কখনই দৃশ্য বস্তুবিশ্বকে ভুজাগে ভাগ করে একটিকে চিরন্তন সত্য এবং অপরটিকে চিরন্তন মিথ্যা বলে গ্রহণ করে না।

রাধাকৃষ্ণান্ মনে করেন যে, অদ্বৈতবেদান্তের 'নেতি' অংশের উপর এতকাল বেশি জোর পড়েছে বলেই আমরা শংকরোত্তর যুগে কতকগুলি প্রাণহীন, তর্কসর্বস্ব ফরমুলা পেয়েছি। কিন্তু নিছক তর্কের

জাল বুনে আর যাইই পাওয়া যাক না কেন, 'দর্শন' পাওয়া যায় না। রাধাকৃষ্ণান্ বুদ্ধির আবেদন এবং বোধির আবেদনকে পৃথক করে দেখেন নি; তিনি চেয়েছেন এ দুটোর সমন্বয় করতে—এই প্রচেষ্টায় তিনি অনেকাংশে সফলও হয়েছেন। যাঁরা শুধু তর্ককেই দর্শনের প্রাণ বলে মনে করেন, তাঁদের কাছে নেতিবাদ-বিশ্লেষণ একটি আকর্ষণের বস্তু সন্দেহ নেই; কিন্তু নেতিবাদ শেষপর্যন্ত তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করলে দেখা যায় যে চরম সত্তা যে নিরগুণে পর্যবসিত হয়েছে তা নয়, সে এক মহাশূন্যের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাধাকৃষ্ণান্ বিশ্বাস করেন যে, সেই দর্শনই মানুষের জীবনকে মহত্তর করে তুলতে পারে যাতে ব্রহ্ম এবং জগতের মধ্যে সত্যিকারের সমন্বয় করা হয়েছে। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, রাধাকৃষ্ণানের জীবনে একটি বড়ো জায়গা জুড়ে আছে ভক্তিবাদের প্রেরণা; তাই তিনি বলেন যে, যে তর্কবিজ্ঞান 'বহু'কে মিথ্যা বলে অস্বীকার করে এবং এক অদ্বৈতকে কেবল সত্য বলে গ্রহণ করে, সে তর্ক একদেশদর্শী, ভ্রান্ত তর্ক। উপনিষদের তাৎপর্য হচ্ছে 'এক'-এর মধ্যে 'বহু'র সম্ভাবনা আছে; 'বহু'র মধ্যে 'এক' অনুস্যূত আছেন। কাজেই একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি গ্রহণ করা চলে না। শংকর এবং রামানুজের মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলেছেন রাধাকৃষ্ণান্। তিনি শংকর এবং রামানুজ সম্বন্ধে বলেছেন: the best qualities of each are the defects of the other—একজনের সর্বোত্তম গুণগুলি অপরের ক্ষেত্রে দোষ হয়ে দেখা দিয়েছে। নিরগুণ ব্রহ্ম এবং সগুণ ব্রহ্ম—দুটোরই ভূমিকা এবং তাৎপর্য বজায় রাখতে চান রাধাকৃষ্ণান্। শংকর সগুণ ব্রহ্মের ব্যবহারিক সার্থকতা মেনেছেন, কিন্তু একে পরম তত্ত্ব বলে স্বীকার করেন নি। রাধাকৃষ্ণান্ এই মত গ্রহণ করতে রাজি নন; কিন্তু অপরদিকে তিনি মনে করেন রামানুজের মতে যে ব্রহ্ম আমরা পাচ্ছি তা আসলে ব্রহ্মই নয়, তা হচ্ছে ঈশ্বর। চরম সত্যকে সসীম, সান্ত চিন্তাধারার সাহায্যে নিঃশেষে প্রকাশ করা যায় না সত্য; কিন্তু যদি সসীমের ভিতর দিয়েই অসীম এবং অনন্তকে প্রকাশ করবার প্রেরণা জাগে তবে রামানুজ-প্রদর্শিত পথেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। এই পরিবর্তনশীল জগৎ এবং সীমাবদ্ধ সত্তাকে অতিক্রম করবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত। তাই যখন মানুষ তর্কের সাহায্যে, অসীম অনন্ত সত্তাকে প্রকাশ করবার জন্য ব্যাকুল হয়, তখন আসলে সে সসীম থেকে অসীমে যাত্রা করে না; যে পরিবেশ থেকে তার চিন্তা আর তর্কের প্রেরণা আসে সে পরিবেশ হচ্ছে সসীম-অসীম। মানুষ যখন সত্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, যখন জ্ঞানের যাত্রাপথে একটির পর একটি অর্ধসত্য এবং সত্যকল্পকে পরিত্যাগ করে অপরটিকে যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করে দেখে, তখন তার মনে এই আশাই জাগে যে চরম সত্য অসামান্য ঐশ্বর্যশালী; পথের শেষে যে সম্পদ সে লাভ করবে তা মহাশূন্য নয়, তা হচ্ছে সচ্চিদানন্দ। এই অপরূপ ঐশ্বর্য ন্যায়শাস্ত্রের সূত্রে নিঃশেষে প্রকাশ করা যায় না—এ সত্য অনুভূতিবেদ্য। রাধাকৃষ্ণান্ মনে করেন যে, ভাব (thought) ও সত্তা (being) মূলত এক —এই অভ্রান্ত একক বচনকে আশ্রয় করে আমরা জ্ঞান অর্জনে প্রবৃত্ত হই। আমার চিন্তা নিছক চিন্তা-মাত্র—এর সাহায্যে আমি হয়তো কোনোদিনই সত্যের সন্ধান পাব না, এই ধারণা আত্মঘাতী। মানুষ এই ভাব আশ্রয় করে সত্যানুসন্ধানে অগ্রসর হতে পারে না। রাধাকৃষ্ণান্ মনে করেন ব্র্যাডলি (Bradley) যেভাবে বচন (Judgment)-এর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে আমাদের জীবনের সমস্ত জ্ঞেয়বস্তুই বিরোধাত্মক, তা হচ্ছে ভ্রান্ত, খণ্ডিত দৃষ্টির ফল। আসলে প্রত্যেক বচনের উদ্দেশ্য এবং বিধেয় সমানভাবে সত্য; তাদের মধ্যে বিরোধ নেই; সেইরকম দ্রব্য এবং গুণ সমানভাবে সত্য। এই দৃষ্টি-ভঙ্গি ছিল বলেই রামানুজ পরমব্রহ্মকে জগতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত দেখেছেন। তিনি জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, ব্রহ্ম হচ্ছেন আত্মা; জগৎ তাঁর দেহ। জগৎ যে ব্রহ্মাশ্রিত, ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল—এই কথাই বলতে চেয়েছেন রামানুজ। রামানুজদর্শনের এই অংশটুকু রাধাকৃষ্ণান্ মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছেন। জগৎ স্বয়ংসর্বস্ব, স্বাধীন, নিরপেক্ষ সত্তা নয়; দেহ এবং আত্মা যেমন একটি অপরের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে, তেমনি জগৎ এবং ঈশ্বর একটি অপরের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। যুক্তির সাহায্যে যখন রামানুজদর্শনের বিচার করা হয়, তখন রাধাকৃষ্ণান্ রামানুজের সব কথা মেনে নিতে পারেন না। প্রশ্ন হচ্ছে: ঈশ্বর বা ব্রহ্ম যদি জগতের দ্বারা সম্পৃক্ত হন তবে জগতের দুঃখ, কষ্ট, পাপ, অন্যায় প্রভৃতিও কি ঈশ্বরকে স্পর্শ করে না? রামানুজদর্শনে এ প্রশ্নের সদুত্তর মেলে না। এই প্রসঙ্গে একটি সংকটের উল্লেখ করা যেতে পারে: ব্রহ্ম যদি অব্যয়, অপরিবর্তন বিখাতিগ সত্তা হন তা হলে, ইতিহাসের গতি এবং কালের পরিণতি তিনি কেমন করে আত্মসাৎ করেন? অপরপক্ষে, যদি ইতিহাসের গতিকেই চরম তাৎপর্যপূর্ণ বলে গ্রহণ করা হয় তবে আর অব্যয়, ত্রিগুণাতীত সনাতন ব্রহ্মকে চরম সত্য বলে স্বীকার করা যায় না। সেক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান পূর্ণতাকেই চরম সত্য বলতে হয়। অথচ এ দুটি বিকল্পের কোনোটাই রামানুজের অভিপ্রেত নয়। রাধাকৃষ্ণান্ স্বকীয় পদ্ধতিতে এই সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করেছেন। প্রশ্নটা হচ্ছে, নিরগুণ ব্রহ্ম এবং সগুণ ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্ক কী? পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে অব্যয়, অপরিবর্তন ব্রহ্মের সম্পর্ক কী? নিরগুণ ব্রহ্ম হচ্ছেন স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদ-রহিত; তিনি অসঙ্গ, নিষ্কল, নিরঞ্জন। জগতের সঙ্গে নিরগুণ ব্রহ্মের সম্পর্কের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না, কারণ পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম একমাত্র সত্য; আসলে জগতের সৃষ্টি কোনোদিন হয় নি। আমরা যে ভেদবিশিষ্ট জগৎ দেখছি, তা আমাদের ভ্রান্ত দৃষ্টির ফল। সগুণ ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা এবং নিয়ামক; জীব এবং জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সত্যিকারের সম্পর্ক। ব্রহ্ম এবং ঈশ্বর কি একই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ? এ প্রশ্ন নিয়ে দার্শনিকগণ বহু বিচার করেছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো সদুত্তর পাওয়া যায় নি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: সত্য একই, ভক্তির দিক দিয়ে যখন দেখি তখন বলি ঈশ্বর, জ্ঞানমার্গে যাঁকে পাই তিনি ব্রহ্ম—যেমন জল আর বরফ। শংকরের মতে, ঈশ্বরের ব্যবহারিক সত্তা আছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরও মিথ্যা। ব্র্যাডলি বলেছেন, ঈশ্বর পরম ব্রহ্মের প্রকাশ—কিন্তু সে যেন ব্রহ্মের ছায়ার (appearance) মতো। রাধাকৃষ্ণান্ এ কয়টি মতের একটিও সমর্থন করেননা। তাঁর মতে, ব্রহ্ম কূটস্থ, নির্বিকার নন, ব্রহ্ম গতিশীল, ব্যাপক। ব্রহ্ম হচ্ছেন অসীম শক্তিপুঞ্জের আকর, এই শক্তিপুঞ্জের প্রকাশ হচ্ছে অসৎ থেকে সৎ-এ এবং এর আত্মপ্রকাশের পর্যায় হচ্ছে—জড় পদার্থ, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান। ব্রহ্মের দিক থেকে অবশ্য সৃষ্টির কোনো তাগিদ নেই; তবু যে সৃষ্টি আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, ব্রহ্ম সে সৃষ্ট জগৎ থেকে মুক্ত। পরম ব্রহ্মের প্রকাশের সম্ভাবনা অনন্ত এবং অনির্দিষ্ট; এই অনন্ত সম্ভাবনার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি ঈশ্বরতত্ত্বে। এ ছাড়া ব্রহ্মের অনন্ত সম্ভাবনা কিভাবে কখন মূর্ত হবে, তা কেউ বলতে পারে না। তা হলে ব্রহ্মকে যখন জগতের পরিপ্রেক্ষিতে দেখি, তখনই তাঁকে ঈশ্বর বলি। একই সত্যের বিভিন্ন দিক হচ্ছে ব্রহ্ম এবং ঈশ্বর। ব্রহ্ম অনন্ত সম্ভাবনা। ঈশ্বর সেইসকল সম্ভাবনার একটি বিশেষ মূর্ত বিগ্রহ।

রাধাকৃষ্ণানের মতে, হিন্দুধর্ম কতকগুলি স্থবির দেশাচার ও লোকাচারের সমষ্টি মাত্র নয়, হিন্দুধর্ম নিয়ত বিকাশশীল; এই ধর্মের একজনমাত্র প্রবক্তা নেই, আবার একটিমাত্র গ্রন্থের ভিতর এই ধর্মের সার সত্য লিখিত নেই। হিন্দুধর্ম বহুভাবে বিস্তৃত এবং এর গভীরতা এবং ব্যাপকতা পরিমাপ করা সুকঠিন। হিন্দুধর্ম মতুয়া বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিয়ে নি; এই ধর্ম

অপরোক্ষানুভূতির উপর জোর দিয়েছে। সত্য হচ্ছে একটি হীরকখণ্ডের মতো দ্যুতিময়; সেই দ্যুতি নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এক-একটি সাম্প্রদায়িক ধর্মমত এ দ্যুতির এক-একটি রশ্মিরেখাকে অবলম্বন করে অগ্রসর হয়েছে। কাজেই একটি বিশেষ ধর্মমত সত্য, আর সকলই মিথ্যা—একথা বলা চলবে না। আসলে বলা সঙ্গত যে, বিভিন্ন ধর্মমত একই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। এই সত্যটি হচ্ছে এই যে, মানুষ অমৃতের পুত্র, সে ভয়শূন্য এবং তার ভিতরে অনন্ত সম্ভাবনা সুপ্ত আছে; তার দেহের অবসান ঘটলেও তার আত্মার বিনাশ ঘটে না। কারণ আত্মা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ এবং মুক্ত। হিন্দুধর্ম আধ্যাত্মিক মূল্যকে অন্য সকল মানবিক মূল্যের উপরে স্থান দিয়েছে। হিন্দু-ধর্মের তিনটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি রাধাকৃষ্ণান্ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; প্রথমত 'মায়া' কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি প্রচলিত লৌকিক মত খণ্ডন করেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে জগৎকে মায়া বলার অর্থ, জগৎ মিথ্যা, মরীচিকা, শূন্য—এর কোনোটাই নয়। 'মায়া' কথার অর্থ—রহস্যময়তা, অনির্বচনীয়তা। স্বগত ভেদ, সজাতীয় ভেদ এবং বিজাতীয় ভেদ—এই তিন প্রকার ভেদশূন্য ব্রহ্ম থেকে কী করে ভেদপূর্ণ সীমিত ভুলভ্রান্তিতে ভরা জগতের সৃষ্টি হল, এটাই রহস্য। অন্য ভাষায় বলতে গেলে বলা যায়, যে 'এক'র ভিতরে 'বহু'র বীজ নিহিত নেই, সেই 'এক' কী করে 'বহু' হলেন? এই রহস্যের কোনো কিনারা আমরা আজ পর্যন্ত পাই নি। দ্বিতীয়ত, হিন্দুধর্ম এই শিক্ষাই দিয়েছে যে, জগৎপ্রপঞ্চ পূর্ববর্তী কোনো অবস্থার পুনরাবৃত্তি নয়। অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে নানা সোপান আছে। মানুষ যে পরিমাণে আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হয়, সেই পরিমাণে সে নীচের সোপান থেকে উপরের সোপানে আরোহণ করে। সেইজন্য উপনিষদে আমরা ধাপে-ধাপে ব্রহ্মকে বা আত্মাকে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং সর্বশেষে আনন্দময় রূপে দেখি। উপনিষৎ এই কথাই বলতে চান যে, মানুষের বুদ্ধি যতই পরিপূর্ণতা লাভ করুক না কেন, অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে সেই বুদ্ধি বা বিজ্ঞান শেষ কথা নয়। বিজ্ঞানের চাইতেও বৃহত্তর এবং মহত্তর অবস্থার অস্তিত্ব আছে, তার নাম আনন্দ। এই অবস্থা লাভ করলে আমি অন্তর্যামী ঈশ্বরকে বহির্জগতের কেন্দ্রগত সত্য ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন বলে উপলব্ধি করি। আমার সকল অসম্পূর্ণতা তখন পূর্ণতা পায়, আমার সকল খণ্ড-খণ্ড বিচ্ছিন্ন অনুভব তখন এক ছন্দোময় সত্তায় রূপান্তরিত হয়। এই প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণান্ উপনিষদের সারসত্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। চরম সত্য অপরোক্ষানুভূতির দ্বারাই লভ্য। এই সত্যের রহস্য বিচারবুদ্ধির দ্বারা উদ্ঘাটন করা যায় না (নৈষেয়া); তবুও এ সত্য অজ্ঞেয় থাকে না। দ্রষ্টা ঋষিরা ঘোষণা করেছেন যে চরম সত্যকে তাঁরা জেনেছেন; অন্ধকারের পরপারে সেই মহান পুরুষকে তাঁরা দেখেছেন। রাধাকৃষ্ণান্ উপনিষদের বাক্যগুলিকে সমন্বিত করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, যদিও চরম সত্যকে বিচার-বুদ্ধির দ্বারা জানা যায় না, তবুও যখন দ্রষ্টা ঋষিরা সেই সত্যকে জেনেছেন বলে ঘোষণা করেছেন, তখন এই জানা বা উপলব্ধির মাধ্যম বুদ্ধি-অতিরিক্ত অন্য কোনো উৎস; সেই উৎসই হল স্বজ্ঞা বা অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি। উপনিষৎ কোনো ধরাবাঁধা ছককাটা পথে অগ্রসর হয় নি এবং সত্যের অন্বেষণে কোনো প্রকার মতুয়াবুদ্ধিকে প্রশ্রয় দেয় নি। অবিদ্যা অথবা অজ্ঞানের জন্যই মানুষে-মানুষে ভেদবুদ্ধি জাগে, মানুষের সঙ্গে তার পরিবেশের বিরোধ দেখা দেয়, এবং অজ্ঞানতা থেকেই স্বার্থান্ধতা, ধর্মান্ধতা, লোভ, হিংসা প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটে। অজ্ঞানের জন্যে যখন এজাতীয় দোষগুলি ঘটে, তখন পরাজ্ঞানের মাধ্যমেই মুক্তি বা মোক্ষ আসবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। মুক্তির পর্যবসান প্রেমে, অপরূপ দ্যুতিতে। মানুষ যে অমৃতের পুত্র, সে যে অনন্তের অধিকারী, মুক্তিলাভের সঙ্গে-সঙ্গে এই ভুলেযাওয়া সত্যটি

জীবনকে মহিমামণ্ডিত করে। শংকরাচার্য তাঁর ভাষ্যে বারবার এই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, মুক্তি কোনো প্রাপ্য বা লভ্য জিনিস নয়। আসলে মানুষ স্বভাবতই মুক্ত; অজ্ঞানের আবরণের জন্য এই সত্যকে সে উপলব্ধি করতে পারে না। অতএব মুক্ত হওয়া বা মোক্ষ লাভ করা কথার অর্থ হল এই যে, অজ্ঞানের মেঘ কেটে গেলে মানুষ তার স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতনতা লাভ করে।

বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধেও রাধাকৃষ্ণানের মতামত বিশেষ মূল্যবান। রাধাকৃষ্ণান্ গৌতম বুদ্ধকে একজন হৃদয়-বান মানবমিত্ররূপে চিত্রিত করেছেন। দর্শনের জগতে বুদ্ধ কোনো তত্ত্বকথা শোনাতে আসেন নি। নিরন্তর শুভকর্মের মধ্য দিয়ে মানুষ যাতে পরস্পরকে ভালো-বাসতে পারে, বুদ্ধ সেই পথেরই নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাধাকৃষ্ণানের মতে, বুদ্ধ অবিদ্যা দূরীকরণের জন্য বস্তুনিষ্ঠ পথ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নৈতিক আইনকানুনের দ্বারা মানুষের স্বাধীনতাকে খর্ব করতে চান নি। শীল এবং প্রজ্ঞা অর্থাৎ সৎ আচরণ এবং সম্যক অনুভূতি—এই দুইটিই মানবের পরম সম্পদ। একটি অপরটির উপর নির্ভরশীল। এই দুটি পথ অবলম্বন করেই মানুষ অবিদ্যা দূর করবার দিকে অগ্রসর হয়। রাধাকৃষ্ণান্ অনেক তথ্য সংগ্রহ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে বুদ্ধের শিক্ষার আকর নিহিত রয়েছে উপনিষদের মধ্যে এবং তাত্ত্বিক প্রশ্নের জবাবে বুদ্ধ যে নিরুত্তর থাকতেন, তার অর্থ এই নয় যে তিনি নাস্তিক ছিলেন। আসলে বুদ্ধ বিশ্বাস করতেন যে স্রষ্টা ঈশ্বর, অপরিবর্তন আত্মা প্রভৃতি প্রশ্নের আলোচনা নিরর্থক। মানুষ যদি সত্য এবং অহিংসাকে আশ্রয় করে সৎ জীবনযাপন করে এবং ধর্মকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে গণ্য করে, তাহলেই মানুষের মঙ্গল। 'ধর্ম' কথাটি বুদ্ধ, ঋত বা নিয়ম অর্থে ব্যবহার করেছেন। সত্য, ঋত এবং ধর্ম সমার্থক শব্দ। উপনিষদেও এই ধরনের উক্তি পাওয়া যায়। 'নির্বাণ' কথাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাধাকৃষ্ণান্ বলেছেন যে নির্বাণের অর্থ শূন্য নয়; এর অর্থ এই যে পারমার্থিক সত্যের তুলনায় ব্যবহারিক জগৎ ক্ষণস্থায়ী। মুক্ত পুরুষ সম্বন্ধে আমরা স্পষ্ট করে কিছুই বলতে পারি না। পরোক্ষভাবে আমরা বলে থাকি যে মুক্ত পুরুষ কর্ম এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত, তাঁর সঞ্চিত কর্মরাশি ভস্মীভূত। সে এক অনির্বচনীয় শান্তির মধ্যে বাস করে এবং তার পুনরায় দেহধারণের কোনো প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন থাকে না। বুদ্ধের দৃষ্টি কার্যকরী (pragmatic) ছিল বলেই তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। একদিকে অবাধ ইন্দ্রিয়সুখ উপভোগ অন্যদিকে আত্মনিগ্রহ এবং কৃচ্ছ্রসাধন—এই দুই কোটিকেই বুদ্ধ বর্জন করেছিলেন। রাধাকৃষ্ণান্ বিশ্বাস করেন যে, উপনিষদে যে বিদ্যার কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ শাস্ত্রের অন্তর্গত তত্ত্বকে জানা নয়, বিদ্যা অর্থ চরম সত্যের সঙ্গে ব্যক্তিমানুষের অভিন্নতার উপলব্ধি। বুদ্ধ উপনিষদের এই তত্ত্বকে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা সহজতর হয়েছিল।

বুদ্ধের শিক্ষা কোনো বিশেষ অধিকারী সম্প্রদায়ের জন্য নয়; তাঁর শিক্ষা সর্বস্তরের মানুষের জন্য অভি-প্রেত। সূর্য বা চাঁদের আলো যেমন পরিব্যাপ্ত, এই আলো ধনী-নির্ধন, সাধু-অসাধু পণ্ডিত-মূর্খ—সকলের গৃহেই প্রবেশ করে, তেমনি বুদ্ধের বাণীও সর্বসাধারণের জন্য অভিপ্রেত। রাধাকৃষ্ণান্ এক উদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বুদ্ধের অনাত্মা মতবাদের ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষের দেহমনই যদি একমাত্র সত্য হবে আর আত্মা যদি মিথ্যা হবে, তা হলে মানুষের নৈতিক প্রচেষ্টা, পাপ-পুণ্যের ভালো-মন্দের অনুভূতি নিরর্থক হয়ে পড়ে। সেইজন্য রাধাকৃষ্ণানের মতে বুদ্ধ ব্যবহারিক সত্য এবং পারমার্থিক সত্য দুটোই স্বীকার করেছেন, এবং বুদ্ধের মতে পারমার্থিক স্তরে আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না, যদিও ব্যবহারিক জীবনে চিরন্তন আত্মা আছে কিনা, এ প্রশ্ন অবান্তর। বুদ্ধ যে কর্মবাদ মেনেছেন তার একটা বিশেষ তাৎপর্য

আছে। কর্মবাদ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকেই সূচিত করে। মানুষ যেমন বীজ বপন করবে, তদনুরূপ ফসল সে লাভ করবে। বৌদ্ধ ধর্ম প্রেম এবং মৈত্রীর ধর্ম। এই ধর্মের মূল কথা হল সত্য এবং অহিংসার প্রতি তীব্র অনুরক্তি। মহাযান বৌদ্ধ মতে চরম সত্যকে শূন্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। শূন্য যে আছে তাও বলা যাবে না, শূন্য যে নেই তাও বলা যাবে না, যুগপৎ আছে এবং নেই—তাও বলা যাবে না, আবার শূন্যকে অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্বের অভাব—তাও বলা যাবে না। এইজাতীয় বর্ণনা থেকে একটি সিদ্ধান্তেই আমরা আসতে পারি যে, শূন্য হচ্ছে অনির্বচনীয়। পরবর্তী কালে বৌদ্ধ-সাহিত্যে শূন্যকে ধর্মের সঙ্গে অভিন্ন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। একাদশ শতকে প্রণীত "ধর্ম পূজা নিধান" নামক গ্রন্থের অন্তর্গত একটি প্রার্থনাকে রাধাকৃষ্ণান্ খুব গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রার্থনাটি এইরূপ : 'যার আদি নেই এবং অন্ত নেই, যার রূপ বা অঞ্জন নেই, যার জন্ম এবং মৃত্যু নেই, যা সর্বব্যাপী এবং অসীম, যা অপাপবিদ্ধ এবং অক্ষয়, যাকে কেবল যোগসাধনার বলে উপলব্ধি করা যায়, সেই শূন্য মূর্তি যেন আমাকে চিরকাল পালন করেন।' রাধাকৃষ্ণানের মতে, শূন্য ধর্ম নেতিবাচক নয়। এই ধর্ম ধ্রুব এবং ইতিবাচক। উপনিষৎ যেমন ব্রহ্মলোকে অবস্থিতি এবং মোক্ষের মধ্যে প্রভেদ স্বীকার করেন, বুদ্ধও সেইরকম বলেন যে, ঈশ্বরেরাও তেমনি প্রকাশমান (manifested) জগতের অধিবাসী। অস্তি এবং নাস্তি উভয়ে পরস্পরের সঙ্গে সমযুক্ত। যেখানে অস্তি সেখানে নাস্তি ; যেখানে নাস্তি সেখানে অস্তি। মুক্ত পুরুষ, যাঁকে বুদ্ধ বলা হয়, তাঁর অবস্থিতি ব্রহ্মাণ্ডের উপরে। বুদ্ধ পুরুষের প্রকৃতি অপ্রকাশ, অজ্ঞাত, অদ্ভুত, অস্পষ্ট এবং অবিমিশ্র। উপনিষদে ব্রহ্মের যে বর্ণনা আছে তার সঙ্গে এই বুদ্ধ মুক্ত পুরুষের কোনো পার্থক্য নেই। বুদ্ধ নিজেকে "ব্রহ্মভূত" বলে অভিহিত করেছেন ; ব্রহ্মভূত কথার অর্থ যিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করেছেন। কাজেই দেখা যায় বুদ্ধ চরম সত্য হিসাবে সগুণ ঈশ্বরকে না মানলেও প্রকারান্তরে নির্গুণ ব্রহ্মকে মেনেছেন। উপনিষদের ঋষিদের মতন বুদ্ধও বিশ্বাস করতেন যে, বুদ্ধত্ব অথবা মুক্তি মানুষের উপর বাইরে থেকে চাপানো যায় না ; আসলে, মানুষ তার অন্তরজগতের সাধনার দ্বারা ধীরে-ধীরে পূর্ণত্ব লাভ করে। এই দিক থেকে ঔপনিষদ দর্শন এবং বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে দেহের বিনাশ ঘটে সত্য, কিন্তু অব্যয় ও অক্ষয় অসঙ্গ অহং মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে নষ্ট হয় না ; তার যেমন জন্ম নেই, তেমনি মৃত্যুও নেই। মানুষ যখন উপলব্ধি করে যে দুঃখের কারণ পরিবর্তনশীল চঞ্চল এক সত্তা, তখন দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য সে এক অপরিবর্তন অচঞ্চল ধ্রুব সত্তার সন্ধান করে। এইজাতীয় সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা যে মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ইসলাম ধর্ম

ইসলাম ও খ্রীষ্টধর্মের বিশ্লেষণ করে রাধাকৃষ্ণান্ একই সত্যে উপনীত হয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্ম যেমন এক পারমার্থিক সত্যের নির্দেশ করে, তেমনি ইসলাম-ধর্মও একেশ্বরবাদ প্রচারের মাধ্যমে এক অদ্বয় আধ্যাত্মিক সত্যের সূচনা করে থাকে। ইসলামধর্ম গণতন্ত্র এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের উপর জোর দিয়ে থাকে। বিশ্বভ্রাতৃত্ব কোনো ব্যবহারিক মানদণ্ডের উপর নির্ভর করে না। মানুষে-মানুষে ঐক্য আসলে আত্মিক ঐক্য। এই ঐক্যের মূল দেহ মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতির মধ্যে নিহিত নেই। ইসলামদর্শনে ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাতিগ নন। ইসলামধর্মের প্রবর্তক মুহম্মদ ছিলেন নানা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এক মহাপুরুষ। সাধারণ একজন ব্যবসায়ী কিভাবে পয়গম্বরে পরিণত হলেন, তা এক বিস্ময়কর কাহিনী। পবিত্র কুরানে উল্লিখিত আছে যে সম্যক্ জ্ঞানই স্বর্গের পথ নির্দেশ করে।

বিশিষ্ট আরব দার্শনিকদের মত বিশ্লেষণ করে রাধাকৃষ্ণান্ দেখিয়েছেন যে, তাঁরা কিভাবে নব্য-প্লেটোনিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। উক্ত দার্শনিকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অল্ কিন্ডি, ইবন্‌সিনা, অল ঘজালি, ইবন্ রোস্ত প্রভৃতি। বিশেষ করে অল ঘজালি উপলব্ধি করেছিলেন যে, মরমিয়াবাদীদের পথ হচ্ছে একমাত্র পথ যা আমাদের ঈশ্বরানুভূতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণান্ সুফি মতবাদের উপর তাঁর গভীর বিশ্বাস নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন এবং সুফি দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গির সমতার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের সূত্র আবিষ্কার করেছেন। যাঁরা মরমি সাধক তাঁরা হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান যে কোনো সম্প্রদায়ের হোন না কেন, তাঁদের উপলব্ধির মধ্যে যে সাম্য আবিষ্কার করা যায়, তার মূল্য অপরিসীম।

খ্রীষ্টধর্ম

খ্রীষ্টধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণান্ যুক্তি এবং প্রকাশ (revelation)-এর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। ক্যাথলিক এবং প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদের মধ্যে বিরোধের বীজ কোথায়, প্রটেস্ট্যান্ট মতবাদের বিভিন্ন শাখা-উপশাখার উদ্ভব কিভাবে হল, এ সম্বন্ধেও তাঁর বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। ইউনিটেরিয়ান চার্চের অন্যতম নেতা চ্যানিং-এর উক্তি উদ্ধার করে রাধাকৃষ্ণান্ দেখিয়েছেন যে, হিন্দু-মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদের মধ্যে একই আধ্যাত্মিক সত্য কিভাবে প্রবাহিত হয়েছে। চ্যানিং বলেছেন, 'একটি উচ্চতম ধারণা, যাকে বলা যেতে পারে আত্মার মহিমা, ভাগবত শক্তির প্রকাশ, মানব-আত্মার অন্তর্নিহিত-দেবত্ব, যার লক্ষ্য হল অনির্বচনীয় মর্যাদা এবং অমরত্ব লাভ করা।' এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে মানুষের সঙ্কীর্ণ ভেদবুদ্ধি এবং ধর্মান্ধতা অচিরে দূরীভূত হবে। চ্যানিং আরও বলেছেন যে যাঁরা যিশুখ্রীষ্টের পরম-প্রিয়জন, যাঁরা তাঁর পথ ভক্তিভরে অনুসরণ করেছেন, তাঁরা যে গৃহেরই অধিবাসী হোন, যে পদ্ধতিতেই উপাসনা করুন, ব্যক্তি হিসেবে তাদের যে-কোনো চিহ্নই থাকুক, এবং যে ভাষাই তাঁরা ব্যবহার করুন—এঁদের সমাবেশকেই প্রকৃত চার্চ বলা যেতে পারে। রাধাকৃষ্ণান্ তাঁর মতের সমর্থনে উইলিয়ম জেম্‌স্-এর দার্শনিক সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছেন। উইলিয়ম্ জেম্‌স্ অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, আসল কথা হল "বিশ্বাস"। বিশ্বাস যখন তীব্র হয় তখনই মানুষ অসীমের সঙ্গে সীমিত সত্তার একটা যোগসূত্র আবিষ্কার করে ; এদিক থেকে বেদান্তধর্ম এবং খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। প্রাচীন যুগে খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে যে সঙ্কীর্ণতা ছিল এবং খ্রীষ্টানরা যেভাবে নিজেদের ধর্মকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য বলে মনে করতেন, সেই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি আজ বহু পরিমাণে অপসৃত হয়েছে। হকিং এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে খ্রীষ্টধর্মকে আজ আর সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ফেলে রাখা চলবে না। আজ সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের জন্যে যে জিনিসটার আশু প্রয়োজন সেটা হল খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্টেতর ধর্মের নিরন্তর ভাববিনিময়। এই ভাববিনিময়ের ফলে খ্রীষ্ট-ধর্ম অনেক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ হবে এবং এই ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের ভুল বোঝাবুঝির ধীরে ধীরে অবসান ঘটবে।

ধর্মের ভূমিকা

বিবেকানন্দের মতন রাধাকৃষ্ণানও বলেছেন যে শিক্ষার কেন্দ্রে থাকবে ধর্ম বা রিলিজিয়ন। রিলিজিয়ন বলতে কোনো সম্প্রদায়গত আচার-আচরণ বোঝায় না। রিলিজিয়ন বলতে বোঝায় মানুষের অন্তর্নিহিত পরিপূর্ণতার বিকাশ। সেইজন্য গণতন্ত্র এবং ধর্মের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। যেহেতু সকল ধর্মমতই মানুষের মর্যাদা এবং স্বাধীনতাকে স্বীকার করে, সেইহেতু ধর্মই

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রকৃত ভিত্তিভূমি হতে পারে। আমাদের ভারতের সংবিধান মতে ভারত একটি সেকুলার রাষ্ট্র। "সেকুলার" কথাটির অনুবাদে সাধারণত বলা হয় "ধর্মনিরপেক্ষ"। অনেক সময় ধর্ম-নিরপেক্ষ কথাটি ধর্মহীন বা ধর্মমুক্ত অবস্থায় পর্যবসিত হয়ে থাকে। মানুষের মধ্যে ভাগবত শক্তি সুপ্ত রয়েছে, এবং ধর্মের লক্ষ্য হল সেই সুপ্ত ভাগবত শক্তিকে জাগ্রত করা। আবার আমাদের সংবিধানে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করা এবং ব্যক্তিমানুষের সম্ভ্রম এবং মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখার কথাও বলা হয়েছে। এজাতীয় আকাঙ্ক্ষা ধর্মবোধ থেকেই উদ্ভূত হয়ে থাকে। একথা সত্য যে, ভারত নিজেকে কোনো একটি বিশেষ ধর্মমতের সঙ্গে অভিন্ন বলে ঘোষণা করে নি (যেমন করেছে নেপাল অথবা পাকিস্তান) তবুও ভারত সমাজের ভিত্তিরূপে ধর্মকেই মেনেছে, অধর্মকে নয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে—'সর্বং সত্যে প্রতিষ্ঠিতম্', আবার বলা হয়েছে 'সর্বং ধর্মে প্রতিষ্ঠিতম্'। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ধর্ম এবং সত্য সমার্থক শব্দ। রাধাকৃষ্ণান্ "ধর্ম" কথাটি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। ধর্ম হল মানুষের অন্তর্নিহিত আত্মার জাগরণ। এই আত্মশক্তিতে বলীয়ান হলেই মানুষ সমাজকে রূপান্তরিত করতে পারে; শোষণ এবং বৈষম্য দূর করে সে সামুদায়িক, সমন্বিত, শোষণহীন, উদার সমাজ গঠন করতে পারে। জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রেও রাধাকৃষ্ণান্ একই মন্তব্য করেছেন: ধর্মের ভিত্তি ছাড়া জাতীয় সংহতি লাভ করা সম্ভব নয়। ধর্মই হচ্ছে রাধাকৃষ্ণানের মতে বিশ্বব্যাপী ভাগবত-শক্তির সঙ্গে মানুষের সচেতন যোগ, যে যোগ প্রেমের মাধ্যমেই সম্ভব হয়।

বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্গত ঐক্যের সন্ধান, এবং সেই ঐক্যসূত্রটি কিভাবে আন্তর্জাতিক শান্তি এবং সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে, এই সমস্যার সমাধানে রাধাকৃষ্ণানের দান সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দর্শনে এবং ধর্মে রাধাকৃষ্ণান্ এত গভীরভাবে নিষ্ণাত ছিলেন যে এই ব্যাপারে তাঁর মন্তব্য প্রামাণ্য বলেই গ্রহণ করতে হয়।

জীবনতত্ত্ব

রাধাকৃষ্ণান্ তাঁর নিজের জীবনতত্ত্ব মোটামুটিভাবে দুটি গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। প্রথমটি হল "কনটেম্-পোরারি ইনডিয়ান ফিলসফি"। এই বইটি রাধাকৃষ্ণান্ ও অধ্যাপক মুরহেডের যুগ্ম সম্পাদনায় ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে সেই সময়কার জীবিত ভারতীয় দার্শনিকদের আত্মপরিচয় এবং তাঁদের জীবন-দর্শনের কথা বিধৃত আছে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেখকরা হলেন মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্র-নাথ, স্বামী অভেদানন্দ, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য, এ আর ওয়াডিয়া, মাইশোর হিরিয়ান্না, রাধাকৃষ্ণান্ প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ-যোগ্য : এই সঙ্কলনগ্রন্থে শ্রীঅরবিন্দের আত্মপরিচয় বা জীবনদর্শন কিছুই স্থান পায় নি, যদিও পৃথিবীর পণ্ডিতসমাজ একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে শ্রীঅরবিন্দই একমাত্র ভারতীয় চিন্তানায়ক যিনি মৌলিক, সুসংবদ্ধ, গতিশীল একটি জীবনদর্শন গড়ে তুলেছিলেন। পূর্বোক্ত সঙ্কলনগ্রন্থে রাধাকৃষ্ণানের প্রবন্ধটির নাম "দ্য স্পিরিট ইন্ ম্যান্"। রাধাকৃষ্ণানের জীবনতত্ত্বের মধ্যে এই কথাটি বার-বার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে মানুষের জীবন একটি আধ্যাত্মিক সত্যের মধ্যে বিধৃত। মানুষের বুদ্ধি এই সত্যের নাগাল পায় না। যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞাননিষ্ঠ হয়েও রাধাকৃষ্ণান্ বার-বার ঘোষণা করেছেন যে, আধ্যাত্মিক সত্যই মুখ্য সত্য, আর সব গৌণ। অন্য ভাষায় বলতে গেলে বলা যায় যে, আধ্যাত্মিক সত্যের আলোকে শিক্ষা সমাজ বিজ্ঞান প্রভৃতিকে দেখতে হবে। পরবর্তী কালে তিনি "অ্যান আইডিয়ালিস্ট ভিউ অব লাইফ" গ্রন্থে তাঁর জীবনদর্শনকে আরও বিস্তৃতভাবে প্রকাশ

করেছেন। এই বইটির উপাদান আসলে ১৯২৯ সালে তাঁর প্রদত্ত হিবার্ট লেকচার। সাধারণভাবে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে তত্ত্ববিদ্যায় যাঁরা পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তাঁরা মুখ্যত কার্যকারণ-সম্পর্ক, দেশকাল, ন্যায়ের অবয়ব, বচনের অংশ, প্রমাণপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণকেই দর্শনের একমাত্র উপজীব্য বলে বিবেচনা করেছেন। রাধাকৃষ্ণান্ যুক্তি ও প্রমাণ-পদ্ধতির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ পোষণ করতেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবুও তিনি দর্শন বলতে বুঝেছেন একটি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি যা জীবনে আর জগতে খণ্ড-খণ্ড জিনিসকে এক সমন্বয়ের মধ্যে গ্রথিত করে। তুলনামূলক দর্শনের আলোচনায় এক হিসেবে তিনি পথিকৃৎ। স্বদেশের এবং বিদেশের বিভিন্ন দার্শনিক ঐতিহ্যের ভেতর থেকে একটি সুসংবদ্ধ বিশ্বদর্শন যাতে গড়ে তোলা যায়, এই সাধনায় তিনি চিরকাল আত্মনিয়োগ করেছেন। বোধি বা অপরোক্ষ অনুভূতিকে বাদ দিয়ে কেবল যুক্তিনির্ভর হওয়ার ফলে মানুষের জীবনে নানা বিরোধ আর বৈষম্য দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞান যুক্তিকে কেবল (absolute) বলে স্বীকার করার ফলে বিজ্ঞান যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, তা মানুষের পক্ষে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে যেমন কল্যাণকর, তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্রে মানুষের সভ্যতার মধ্যে সে ধ্বংসের বীজ বপন করেছে। বিজ্ঞান ঘটনার পর ঘটনাকে কোনো একটি নিয়মের মাপকাঠিতে সাজিয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞানে গবেষণার ফলে যে সত্যকে পাচ্ছি তা মানুষের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হবে কিনা সে প্রশ্নের জবাব বিজ্ঞান দিতে পারে না। সেই প্রশ্নের জবাব দেবে ধর্ম এবং দর্শন। এইখানে রাধাকৃষ্ণানের চিন্তার সঙ্গে আইনস্টাইনের চিন্তার সাদৃশ্য দেখা যায়।

"অ্যান্ আইডিয়ালিস্ট ভিউ অব লাইফ" গ্রন্থের উপসংহারে রাধাকৃষ্ণান্ মানবসমাজের পরিপূর্ণতা সম্পর্কে কিছু মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। বিবেকানন্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তিনিও বলেছেন যে, আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মের লক্ষ্য হল মানুষের যে মধ্যে সুপ্ত ভাগবত শক্তি আছে তাকে উদ্বুদ্ধ করা। এই লক্ষ্যে পৌঁছুলে মানুষ সত্যি-সত্যি নিজেকে জানতে পারে, নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। "দি ফিউচার অব সিভিলিজেশন" নামক গ্রন্থে রাধাকৃষ্ণান্ বলতে চেয়েছেন, যে বিজ্ঞান আর কারিগরিবিদ্যার প্রভাবে আমাদের বাইরের জীবন নানাভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে, এবং এই জীবনের জৌলুশ প্রায় চোখধাঁধানো অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। বহির্জীবনে এই ঐশ্বর্যের পাশাপাশি আন্তর জীবন বুভুক্ষু হয়ে পড়ে আছে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আত্মিক বা আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে বহির্জীবন এবং আন্তর জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্য আনতে না পারছি, ততক্ষণ মানুষ হিসেবে আমাদের জীবন অসার্থক। বিবদমান জাতিরা বলে থাকেন, অস্ত্রসম্ভার সঞ্চিত করব, কিন্তু ব্যবহার করব না। কিন্তু এই-জাতীয় প্রতিশ্রুতি আসলে ভাবের ঘরে চুরি করা মাত্র। সেইজন্য রাধাকৃষ্ণান্ বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, জ্ঞান এবং দৈহিক শক্তির আহরণ বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তার উপরে স্থান দিতে হবে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শক্তিকে। এই দুটো শক্তি মানুষকে মানুষের সঙ্গে, জাতিকে জাতির সঙ্গে মিলিত করবার সেতুস্বরূপ। পার্থিব জীবন যদি ভাগবত জীবনের মধ্যে বিধৃত না থাকে, তাহলে সে জীবন অর্থহীন এবং অসার্থক। বর্তমানে চোখের সামনে যে ক্ষয়িষ্ণু সমাজ দেখতে পাচ্ছি, তাকে বাঁচাতে হলে এবং সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তি-মানুষের রূপান্তর ঘটানো। এই রূপান্তর ঘটাতে হলে আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন।

স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা, যে ঈশ্বর তার অন্তর্যামী। এই উপলব্ধির নামই হল পরিপূর্ণতা লাভ করা। রাধাকৃষ্ণান্ আমাদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে মানুষ একক এবং অসঙ্গ অবস্থায় পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না,

কারণ মানুষ কখনো একাকী নয়, সে তার পরিবেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে এই পরিবেশের মধ্যে অন্য মানুষ, ইতর প্রাণী, উদ্ভিদজগৎ এবং জড়জগৎ অবস্থান করছে। কাজে-কাজেই যতক্ষণ পর্যন্ত না পরিবেশের অন্তর্গত অন্য মানুষেরা পরিপূর্ণতা লাভ করছে ততক্ষণ আমি নিজেকে সত্যিকারের মুক্ত বা পরিপূর্ণ বলতে পারি না। আমার পরিপূর্ণতাপ্রাপ্তির সঙ্গে অন্যান্য মানুষের পরিপূর্ণতাপ্রাপ্তির প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। আসল কথা, রাধাকৃষ্ণান্ ব্যক্তিমুক্তিতে বিশ্বাসী নন; তিনি সর্ব-মুক্তিতে বিশ্বাসী। এক অর্থে বলা যেতে পারে যে, মুক্তিপ্রয়াসী বা পরিপূর্ণতা-প্রয়াসী ব্যক্তিমানুষ এবং পরিপূর্ণ শুদ্ধ সুসংহত সমাজ একই সত্যের এপিঠ আর ওপিঠ। রাধাকৃষ্ণান্ সেইজন্য বার বার বলেছেন যে মানুষ যখন নিজের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করে তখন তার অন্যতম কর্তব্য হল তার প্রতিবেশী এবং সমাজের অন্যান্য মানুষেরও মুক্তিকামনা করা। ঈশ্বরের অনন্ত প্রেম একদিন না একদিন সকল মানুষকে পরিপূর্ণতা দেবে, এ বিষয়ে রাধাকৃষ্ণানের কোনো সংশয় নেই। যে ব্যক্তি আত্মবিচ্যুতি অতিক্রম করে পরিপূর্ণতার দিকে ধীরে-ধীরে অগ্রসর হচ্ছে, তার অন্যতম কর্তব্য হল যে মানুষ অন্ধকারে রয়েছে তাকে আলোর সন্ধান দেওয়া, যে পিছিয়ে পড়েছে তার প্রতি হাত বাড়িয়ে তাকে এগিয়ে নেওয়া; অধ্যাত্মসাধনার অন্যতম লক্ষ্য হল পৃথিবী থেকে অসাম্য, শোষণ আর অজ্ঞতাকে চিরদিনের মতো দূর করে দেওয়া। এই লোকসংগ্রহের জন্যই মুক্ত পুরুষেরা জীবনধারণ করেন; তাঁদের বলা হয় 'জীবন্মুক্ত পুরুষ', এঁরা পৃথিবীর মালিন্যে লিপ্ত হন না, ভোগের আকর্ষণে লুব্ধ হন না, বিরোধ আর বঞ্চনার দ্বারা দীর্ণ হন না। এঁরা সুখদুঃখ, লাভক্ষতি, আশা-নিরাশার ঊর্ধ্বে অবস্থান করে নিয়ত জগতের কল্যাণ করে যান। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, রাধাকৃষ্ণান্ মানব-জীবনের যে লক্ষ্যের কথা বলেছেন, সেখানে ঈশ্বরপ্রাপ্তিই মুখ্য নয়, এই প্রাপ্তির সঙ্গে জড়িত রয়েছে মানুষের সঙ্গে মানুষের হার্দ্য মিলন, যেটা সম্ভব হয় এক মানুষের হৃদয়ের ঐশ্বর্য অপরের চিত্তে সঞ্চারিত করার মধ্য দিয়ে। রাধাকৃষ্ণানের সিদ্ধান্ত এইরূপ: 'প্রত্যেক মানুষই অনন্ত ভাগবত জীবন লাভ করবে।' "কমলা বক্তৃতামালা"য় রাধাকৃষ্ণানের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল একটি শোষণমুক্ত গণতান্ত্রিক জনকল্যাণ-কর সমাজের ভিত্তিভূমি আবিষ্কার করা। আধ্যাত্মিক ভাববাদের ভিত্তিতে মুক্ত উদার মানবসমাজ গড়ে উঠতে পারে, এ কথা তিনি বারবার বলেছেন। কিন্তু হেগেলীয় ধারায় ব্যক্তির স্বাধীনতা সমষ্টির যূপকাষ্ঠে বলি দিতে হবে, এ মত তিনি কখনই গ্রহণ করেন নি। ব্যক্তিমানুষ তার স্বাধীনতাকে সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ রেখেই অগ্রসর হবে, একথা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বহুবার করেছেন। মানুষের ব্যবহারিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতায় স্বতঃস্ফূর্ত স্ফুরণ এবং মানুষে-মানুষে প্রীতি এবং সৌহার্দের সেতু রচনা করাই কল্যাণকর রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণান্ মার্কসবাদের তীব্র সমালোচনা করেছেন, যদিও এই সমালোচনার মধ্যে কোনো তিক্ততা প্রকাশ পায় নি। রাধাকৃষ্ণান্ মন্তব্য করেছেন যে মার্কসবাদের যে-সকল প্রত্যয় আধ্যাত্মিক ভাব-বাদী দার্শনিকেরা বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারেন, সেগুলো হল এই: নিপীড়িত, শোষিত জনগণের প্রতি সত্যিকারের দরদ, জনগণের মধ্যে ধনের সুষ্ঠু বণ্টন, সকল স্তরের মানুষকেই সমান মর্যাদা এবং সুযোগ দেওয়া প্রভৃতি। সঙ্গে-সঙ্গে রাধাকৃষ্ণান্ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে মার্কসবাদের এই দিকগুলি গ্রহণযোগ্য হলেও সমগ্রভাবে মার্কসীয় জীবনদর্শন গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। মার্কসবাদের অনিবার্য সিদ্ধান্ত নাস্তিকতা, মানুষের প্রকৃতির যান্ত্রিক ব্যাখ্যা এবং মানুষের প্রতি সম্ভ্রমবোধের অভাব—এইগুলি রাধাকৃষ্ণানের মতে মার্কসবাদের ত্রুটি। যে-সকল বিষয় অবলম্বন করে রাধাকৃষ্ণান্ মার্কসবাদের সমালোচনা করেছেন সেগুলি মোটামুটিভাবে

এইরকম: মার্কসের মতে ইতিহাস হচ্ছে কতকগুলি অর্থনৈতিক রীতির পর্যায়ক্রমে আবির্ভাব যেখানে পরবর্তী রীতি পূর্ববর্তীকে সজোরে উৎখাত করে, যেমন সামন্ততন্ত্র ধনতন্ত্রের দ্বারা উৎখাত হয়েছে; আবার ধনতন্ত্র উৎখাত হয়েছে সমাজতন্ত্রের দ্বারা। রাধাকৃষ্ণান্-মতে ইতিহাসের এইজাতীয় ব্যাখ্যা অতিসরলীকরণ-দোষে দুষ্ট। মানুষ ইতিহাস গড়ে, না ইতিহাসই মানুষকে গড়ে—এই প্রাচীন প্রশ্নের সমাধান এখনও সম্ভব হয় নি। একথা সত্য যে, যুগে-যুগে চিন্তা-নায়কেরা তাঁদের সময়কার পরিবেশের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হয়েছেন, কিন্তু একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তাঁরাই আবার তাঁদের প্রতিভার সাহায্যে সমাজের কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করেছেন। মার্কসীয় দর্শনকে ভিত্তি করে যে-সকল সমাজতান্ত্রিক দেশের উদ্ভব হয়েছে, তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে মানুষ ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারে। 'উৎপাদনশক্তি ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করে'—এই সূত্রের ব্যাপক এবং বিস্তৃত ব্যাখ্যা না করলে আমাদের দৃষ্টির সঙ্কীর্ণতারই পরিচয় পাওয়া যাবে। রাধাকৃষ্ণান্ সেইজন্য বলতে চান যে, উৎপাদনশক্তির মধ্যে যেমন জমির উর্বরতা, পর্যাপ্ত আলো ও জল, শক্তি প্রভৃতির প্রয়োজন আছে, তেমনি মানুষের মনেরও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা এখানে রয়েছে। ইতিহাস থেকে আমরা এই শিক্ষাই গ্রহণ করতে পারি যে, প্রকৃতিতে উৎপাদনশক্তিগুলির অস্তিত্ব বরাবরই ছিল, কিন্তু মানুষ যখন তার বুদ্ধি আর কলাকৌশল প্রয়োগ করে এই প্রাকৃতিক সম্পদকে কার্যকর করে তুলল, তখনই খাদ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস উৎপন্ন হল। মানুষের কল্পনা, মানুষের সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি এবং মানুষের উদ্ভাবনী শক্তি ছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ কখনই মানুষের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্য হিসেবে দেখা দেয় না।

রাধাকৃষ্ণান্ ইতিহাসের গতি এবং প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখিয়েছেন যে ইতিহাসের মধ্যে একটা অর্থপূর্ণ সঙ্গতি, একটা সৃষ্টিশীল প্যাটার্ন-এর অস্তিত্ব দেখা যায়। এই সৃষ্টিশীল প্যাটার্ন উৎপাদনী শক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না; এর ব্যাখ্যা মানুষের সৃষ্টিশীল আবেগের মধ্যে নিহিত আছে।

রাধাকৃষ্ণান্ গভীরভাবে গণতন্ত্রের প্রতি অনুরক্ত। গণতন্ত্র অবশ্য তাঁর কাছে শাসনব্যবস্থার একটি রূপ নয়; গণতন্ত্র একধরনের জীবনদর্শন। ব্যক্তিমানুষ সমাজের কেন্দ্রগত সত্য। মানুষে-মানুষে বিভেদ দূর করা, মানুষকে শোষণমুক্ত করা, এবং মানুষের প্রতি মানুষের সম্ভ্রম জাগানো—এইগুলিই হচ্ছে গণতন্ত্রের লক্ষ্য। মানুষের প্রতি অটুট বিশ্বাসকে অবলম্বন করেই গণতন্ত্র এগিয়ে যায়। মানুষের অধিকার এবং কর্তব্য-কর্ম সম্বন্ধে গণতন্ত্র মানুষকে সচেতন করে তোলে, এবং কোন্ পথ অবলম্বন করলে সে জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করবে, সেই পথের সন্ধান দেয়। মানবাত্মার পবিত্রতা, মানুষের অন্তর্নিহিত স্বাধীনতা এবং মানুষের পূর্ণতা লাভের পথে সকল প্রকার বাধা দূর করে দেওয়াই হল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য। বিদ্যায়, সম্পদে, সামর্থ্যে দুটি মানুষ কখনই সমান হতে পারে না; তবুও একথা সত্য যে প্রত্যেক মানুষই তার পক্ষে উপযোগী পথ অবলম্বন করে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রাধাকৃষ্ণানের মতে, গণতন্ত্রের ভিত্তিভূমিতে তিনটি প্রত্যয় অবশ্যই থাকবে: প্রথমত, প্রত্যেক মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং স্বকীয়তার স্বীকৃতি; দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক মানুষের বুদ্ধিবিচারের শক্তির উপর আস্থা রাখা এবং যে পথের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন মানুষ সত্যের বিভিন্ন দিক উপলব্ধি করছে তার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা; তৃতীয়ত, প্রত্যেক মানুষকে একই ঈশ্বরের সন্তান রূপে ভালোবাসা। যেহেতু ব্যক্তিমানুষকে নিয়েই সমাজ গঠিত, সেইহেতু যাঁরা সমাজের কল্যাণ কামনা করেন তাঁরা তথাকথিত অসুস্থ ও সমাজ-বিরোধী মানুষকে পরিত্যাগ করতে পারেন না। সমাজের একটি অঙ্গ যদি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে থাকে, তাহলে সেই সমাজের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভবপর হয়

না। সেইজন্য গণতন্ত্রপ্রেমী সমাজের লক্ষ্য হবে পিছিয়ে-পড়া, আপাত ভ্রান্ত, দুর্বল, অসুস্থ মানুষকে ভালোবাসা আর সহানুভূতি দিয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেওয়া। গণতান্ত্রিক সমাজের পরিকাঠামো এমন হওয়া উচিত যাতে ওই সমাজের প্রত্যেক মানুষ সর্বপ্রকার স্বাধীনতা লাভ করার সুযোগ পায়। রাধাকৃষ্ণান্ বারবার বলেছেন যে 'স্বাধীনতা' কথাটি নেতিবাচক নয়। স্বাধীনতার অর্থ কেবল সেই শক্তির অপসারণ নয়, যা মানুষকে সকল প্রকারে খর্ব আর সীমাবদ্ধ করে রাখে; স্বাধীনতা একটি ইতিবাচক ধ্রুবসত্য যাকে লাভ করতে গেলে মানুষকে তার দৈহিক, মানসিক এবং আত্মিক শক্তির সম্যক্ সমন্বয় ঘটাতে হবে। প্রত্যেক গণতান্ত্রিক জাতির লক্ষ্য হওয়া উচিত পৃথিবীর প্রত্যেক পরাধীন জাতিকে রাষ্ট্রীয় মুক্তি দেওয়া। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো-কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র অপর দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কায় যে দেশকে অধীনতামুক্ত করা অবশ্য কর্তব্য সেখানে নিশ্চেষ্ট এবং উদাসীন হয়ে থাকে। এইজাতীয় অন্তঃসারশূন্য গণতন্ত্রকে রাধাকৃষ্ণান্ তীব্র নিন্দা করেছেন। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে আমরা অর্থনৈতিক গণতন্ত্রে উপনীত হই, এবং এই দুই প্রকারের গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রে উপনীত হই; আইনের সাহায্যে মানুষের মনে গণতন্ত্রের প্রতি অনুরাগ জাগানো যায় না। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ জাগাতে হলে মানুষকে সত্যিকারের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সে শিক্ষা পুঁথিগত সংবাদ-সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, সে শিক্ষা মানুষের মনে এমন বিচার-বুদ্ধি জাগাবে যাতে সে ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, শ্রেয়-প্রেয়—এই দুই কোটির মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে। একজন গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ বিভিন্ন ধর্মমতের অন্তর্গত বিরোধকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখবেন, এ-সম্বন্ধেও রাধাকৃষ্ণানের মত সুস্পষ্ট।

রাধাকৃষ্ণান্ একথা কখনও অস্বীকার করেন না যে, বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে পার্থক্য আছে, এমনকী বিরোধও আছে। কিন্তু এই বিরোধকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে যে এক মৌলিক আধ্যাত্মিক সত্য বিভিন্ন দেশে, কালে এবং পরিবেশে ভিন্ন-ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে, যেমন ভিন্ন-ভিন্ন আকারের পাত্রে জল ঢাললে জল সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। ধর্মের বিভিন্নতার অর্থ এই যে, বিভিন্ন কালের এবং বিভিন্ন সমাজের দৃষ্টিতে এক অখণ্ড সত্য খণ্ড ও আপেক্ষিক হয়ে দেখা দেয়। আর-একটি প্রশ্ন : রাধাকৃষ্ণান্ কী ধরনের জগতের পরিকল্পনা করছেন যেখানে বিভিন্ন ধর্মের পারস্পরিক বিরোধ সমন্বয়ে পর্যবসিত হবে? বিভিন্ন ধর্মমতগুলিকে রাধাকৃষ্ণান্ এক যৌথ প্রচেষ্টার অন্তর্গত বিশেষ-বিশেষ দান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এই যৌথ প্রচেষ্টার লক্ষ্য ব্যক্তিমুক্তি নয়, এর লক্ষ্য আন্তর্জাতিক সাম্য ও মৈত্রী, এবং প্রত্যেক দেশ বা জাতির স্বরাজপ্রাপ্তি। একটি সৌধনির্মাণ করতে গেলে যেমন অনেক ইটের প্রয়োজন হয়, তেমনি মানবিক ঐক্য নামে যে সৌধ আমরা নির্মাণ করতে চলেছি, তারই এক-একটা ইঁট হল এক-একটা ধর্মমত। পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে প্রাচ্যের প্রজ্ঞার সমন্বয় সাধন করে রাধাকৃষ্ণান্ ভবিষ্যৎ সমাজের একটি ছবি এঁকেছেন। মানুষ যদি সত্যিকারের সুখ আর শান্তি চায়, তাহলে তাকে মানুষের চাইতে মহত্তর এবং বৃহত্তর সত্তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। নিজেকে এই পরম সত্তার মধ্যে হারালেই সে নিজের প্রকৃত সত্তাকে খুঁজে পাবে। এই চরম সত্তাকে রাধাকৃষ্ণান্ আধ্যাত্মিক ঐক্য নামে অভিহিত করেছেন। রাধাকৃষ্ণান্ যখন সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বলেন, তখন তিনি এমন ইঙ্গিত কখনও করেন না যে সকল প্রচলিত ধর্মমতের মধ্য থেকে একটি সর্বজনীন ধর্মের উদ্ভব হোক, যার প্রতি পৃথিবীর সকল মানুষ আনুগত্য প্রকাশ করে জীবনে সার্থকতা লাভ করতে পারবে। ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্য বলতে রাধাকৃষ্ণান্ বুঝেছেন, লক্ষ্যের ঐক্য

অথবা অভীষ্টের ঐক্য, কখনই মতের ঐক্য নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের যে উদার দৃষ্টি আমাদের 'যত মত তত পথ' এই সূত্রটি দিয়েছিল, রাধাকৃষ্ণান্ও সেই পথ অনুসরণ করে বলতে চেয়েছেন যে বিভিন্ন ধর্মমতের বহিরঙ্গ আলাদা হলেও সব ধর্মমতেরই লক্ষ্য এক, সেটা হল মানবজাতির অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স। বিজ্ঞান এবং কারিগরির অত্যাশ্চর্য অগ্রগতির ফলে সমগ্র জগৎ সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছে, একথা একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কিন্তু এর সঙ্গে-সঙ্গে কতকগুলি অনিষ্টের আবির্ভাব হয়েছে। আমাদের রাজনীতিবিদরা এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের শিকার হয়েছেন। প্রত্যেক রাষ্ট্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রের চাইতে দ্রুত এগিয়ে যাবার চেষ্টায় অপরকে ধ্বংস করবার সর্বনাশা খেলায় নেমেছে। ফলে তারা নিজ-নিজ রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে জীবন আর জগতের সকল সমস্যার সমাধানে ব্যাপৃত রয়েছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বদেশকেন্দ্রিক, বৃহত্তর মানবতাকেন্দ্রিক নয়। এই উদার মানবতাকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তনের জন্যই ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা প্রয়োজন। এই ধর্ম অনুভূতিসঞ্জাত, তর্কবেদ্য নয়; আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিকও নয়। এই ধর্মের মূলে রয়েছে মানুষের অন্তর্নিহিত চিৎশক্তি যা দেশকাল-পরিমণ্ডলের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এক সর্বব্যাপী বিশ্ব-চৈতন্য ইতিহাসের প্রতিপদক্ষেপের মধ্যে নীরবে কাজ করে চলেছে। সেই বিশ্বচৈতন্যকে ব্যক্তিচৈতন্যের সঙ্গে সমন্বিত করে বিশ্বের সকল দিকে সঞ্চারিত করতে হবে। এরই ফলে শোষণমুক্ত, উদার মঙ্গলময় মনুষ্য-সমাজের প্রতিষ্ঠা হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মমতের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান তখনই সম্ভব হবে যখন এক ধর্মমত অপরের প্রতি শুধু সহনশীল হবে না, শ্রদ্ধা-শীলতা এবং বিভিন্ন মতগুলির প্রতি যখন মানুষের প্রবল অনুরক্তি আসবে, তখনই ধর্ম হবে সংহতির উৎস, সংঘর্ষের হাতিয়ার নয়।

স্মৃতিচারণ

১৯৩৮ সালে যখন আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে ছাত্র হিসাবে যোগদান করি, তখন আমি রাধাকৃষ্ণান্‌কে আমার শিক্ষাগুরু হিসেবে পাই। তিনি যেদিন প্রথম আমাদের ক্লাসে পড়াতে আসেন, সেদিনের কথা আজও বহুকালের ব্যবধানে আমার স্পষ্ট মনে আছে। পরনে শুভ্র রেশমের গলাবন্ধ লম্বা কোট আর ধুতি, মাথায় শুভ্র পাগড়ি, দুটি উজ্জ্বল সন্ধানী চোখ, অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই মানুষটির সান্নিধ্যে এসে আমরা সকল ছাত্র-ছাত্রী মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। যখন তিনি বক্তৃতা শুরু করলেন তখন আর-এক বিস্ময়! তাঁর হাতে কোনো বই বা নোট নেই, কথার সাথে কথা সাজিয়ে এক অনবদ্য সৃষ্টিশীল ভাষণ পরিবেশন করলেন। তাঁর শব্দচয়নের মুন্সিয়ানা, দুরূহ বিষয়কে সহজভাবে প্রকাশ করা, অনুপ্রাস ও উপমার সাহায্যে ঈশ্বর, জীবন এবং জগতের রহস্য উন্মোচন করা—এ সবই ছিল তাঁর অধ্যাপনার বিশেষত্ব। পাঠনশেষে তিনি যখন ক্লাস ছেড়ে চলে যেতেন তখন আমাদের মনে একটি কথাই বার বার বাজত, 'শেষ হয়ে হইল না শেষ।'

রাধাকৃষ্ণান্ আমাদের তর্কবিদ্যা এবং ভারতীয় দর্শন পড়াতেন। ভারতীয় দর্শনের মধ্যে যে দ্বন্দ্বমূলক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তার প্রতি তিনি আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। উদাহরণ হিসাবে তিনি বোঝাতেন ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলে উপলব্ধি করতে গেলে বিভিন্ন স্তর বা সোপানের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। ধাপে-ধাপে আমরা জড় থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে মন, মন থেকে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান থেকে আনন্দে উপনীত হই। রাধাকৃষ্ণান্ আমাদের বুঝিয়ে দিতেন কেন আমরা জড় থেকে একলাফে আনন্দে পৌঁছতে পারি না। এই প্রসঙ্গে তিনি মার্কসবাদের কথা উল্লেখ করতেন। মার্কস-

দর্শনের প্রয়োগের দিকে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা থাকলেও অমূর্ত তত্ত্বের দিকটা তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেন নি।

সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বিষয় ছিল সেমিনার ক্লাসে তাঁর দুর্লভ মন্তব্যগুলি। প্রতি শুক্রবার এম. এ. ক্লাসের প্রথম আর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি পাঠচক্র বসত, রাধাকৃষ্ণান্ সভাপতিরূপে এই পাঠচক্র পরিচালনা করতেন। এই সেমিনারে রীতি ছিল যে, একজন ছাত্র বা ছাত্রী রাধাকৃষ্ণানের পছন্দমতো কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করবেন। প্রবন্ধপাঠকের দায়িত্ব এই যে তিনি তিনজন সমর্থককে নির্বাচন করবেন এবং তাঁর প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়ে তিনজন বিরোধী বক্তাকে উপস্থাপিত করবেন। রাধাকৃষ্ণান্ প্রবন্ধপাঠকের বক্তব্য এবং তার সমর্থক আর বিরোধীদের বক্তব্য শুনে তাঁর নিজ মন্তব্য পেশ করে আলোচনার সমাপ্তি টানবেন। সেমিনার ক্লাসে রাধাকৃষ্ণানের একটি আচরণ আমাদের মনঃপূত হত না। ওঁর চাপরাসি ওঁর নামে যত ডাক আসত তার সব কিছুই সেমিনার ক্লাসে টেবিলের উপরে রেখে দিত। সেমিনারে যখন প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা চলছে সেই অবসরে রাধাকৃষ্ণান্ তাঁর নামে পাঠানো পত্রিকা ও চিঠিপত্রাদি পড়তেন এবং কোন্‌টার কী জবাব দিতে হবে সেগুলো নোট করতেন।

যেদিন প্রবন্ধপাঠের ব্যাপারে আমার পালা এল, সেদিন তিনি আমাকে যে বিষয়ের উপরে লিখতে দিয়েছিলেন, সেটি হল, "দর্শনে বারট্রান্ড রাসেলের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ"। অনেক পরিশ্রম করে অনেক তথ্য আহরণ করে আমি প্রবন্ধটি লিখেছিলাম। যেদিন প্রবন্ধটি পাঠ করা হবে তার আগের দিন অধ্যাপকের কাছে গিয়ে আমার সংশয়ের কথা জানালাম। আমি ওঁকে বলেছিলাম যে আমার প্রবন্ধপাঠের সময় এবং প্রবন্ধপাঠশেষে আলোচনার সময় উনি যদি ওঁর চিঠিপত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তাহলে প্রবন্ধপাঠ ও তার উপর আলোচনা—কোনো দিকেই তিনি মনঃসংযোগ করতে পারবেন না। রাধাকৃষ্ণান্ ধৈর্যসহকারে সব কথা শুনলেন, কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না। যেদিন আমি আমার প্রবন্ধ সেমিনার ক্লাসে পাঠ করলাম, সেদিনও যথারীতি তাঁর চিঠিপত্র এবং সাময়িক পত্রিকা বই প্রভৃতির মধ্যে ডুবেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, প্রবন্ধপাঠ এবং আলোচনার শেষে উনি নিপুণভাবে আমার প্রবন্ধের প্রত্যেকটি বক্তব্য তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে পরিবেশন করলেন, আমার তিনজন সমর্থকের বক্তব্য এবং তিনজন বিরোধী বক্তার বক্তব্যের সারাংশ পরিবেশন করে নিজের মন্তব্য আমাদের সকলকে শুনিয়ে বিস্মিত করলেন। ক্লাস ছেড়ে যাবার সময় আমার কাঁধে হাত রেখে শুধু বলেছিলেন, 'তুমি কি সন্তুষ্ট হয়েছ?' গভীর লজ্জায় আমি সেদিন অধোমুখে দাঁড়িয়ে ছিলাম, ওঁর প্রশ্নের কোনো জবাব দিতে পারি নি। এই অসামান্য স্মৃতিধর পুরুষ একই সঙ্গে দুই বা ততোধিক জিনিসের প্রতি যুগপৎ মনঃসংযোগ করতে পারতেন। এই ক্ষমতা লোকোত্তর প্রতিভার পরিচায়ক।

মার্কসবাদের তত্ত্বের দিকটা, বিশেষত দ্বান্দ্বিক জড়বাদের প্রতি বিরূপতার কথা আগেই বলেছি। একদিন আশুতোষ বিলডিঙে তেতলায় অধ্যাপকদের বিশ্রামকক্ষে মার্কসবাদ নিয়ে তুমুল তর্ক হচ্ছিল। এই আলোচনায় একদিকে ছিলেন বটকৃষ্ণ ঘোষ আর হুমায়ুন কবির—এঁরা দুজনেই মার্কসবাদের বিরোধিতা করে বক্তব্য পেশ করছিলেন। অপরদিকে মার্কসবাদকে সমর্থন করে যুক্তিতর্কের প্রয়োগ করছিলেন আবু সয়ীদ আইয়ুব আর সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। রাধাকৃষ্ণান্ একটি ক্লাস শেষ করে অধ্যাপকদের বিশ্রামকক্ষের ভেতর দিয়ে তাঁর নিজের বসার ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। সহসা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তিনি এই চারজন অধ্যাপকের মার্কসবাদ সম্বন্ধে উত্তপ্ত আলোচনা শুনলেন এবং ধীরে-ধীরে এগিয়ে গিয়ে হুমায়ুন কবিরের কাঁধে একটি হাত রেখে তাঁকে বললেন: 'মৃত ঘোড়াকে চাবুক মেরে আর কী হবে?'

১৯৫০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনডিয়ান ফিলসফিকাল কংগ্রেসের রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনের মূল সভাপতি ছিলেন রাধাকৃষ্ণান্। সেই সময় তিনি মস্কোতে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। আমরা যখন তাঁকে কলকাতা বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা করে আনতে যাই তখন তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে, ফিলসফিকাল কংগ্রেসের অধিবেশন কোথায় হবে। আমরা যখন জানালাম যে সেনেট হাউসে এই অধিবেশনের ব্যবস্থা হয়েছে, তখন তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, দর্শনশাস্ত্রের দুরূহতত্ত্ব শুনতে কত আর লোক আসবে? প্রকৃতপক্ষে শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা এত বেশি ছিল যে সেনেট হাউসে স্থানসঙ্কুলান হয় নি। সেনেট হাউসের বাইরের অলিন্দে আর প্রাঙ্গণে লাউডস্পীকার লাগিয়ে বহু লোকের শোনবার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। এই রজতজয়ন্তী অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, বিদেশের বহু দার্শনিক এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। ইংল্যানড, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেন ইউইং, নরথ্‌প, কংগের, শিল্‌প্‌, রেগামি চার্লস্ মূর প্রমুখ। রাধাকৃষ্ণান্ মূল সভাপতির ভাষণে প্রচলিত দার্শনিক মতগুলির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। অস্তিদর্শন (Existentialism) এবং তর্কনিষ্ঠ ধ্রুববাদ (Logical Positivism) এই দুই মতের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি দর্শনানুরাগী ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন, যে চরম তত্ত্বকে জানা এবং বস্তুবিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা মানুষের চিরন্তন আকূতি। বিশ্বরহস্যের এবং জীবনরহস্যের সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত মানুষের অনুসন্ধানের বিরাম নেই। বাক্যের প্রকৃতি-প্রত্যয়গত বিশ্লেষণ অথবা মানুষের অস্তিত্বকে অবলম্বন করে নানা জিজ্ঞাসার জাল বোনা, এর কোনোটাই তত্ত্ববিদ্যার (metaphysics) বিকল্প হতে পারে না। রাধাকৃষ্ণান্ আরও বলেছিলেন যে দর্শনের ইতিহাস কয়েকজন বিশিষ্ট চিন্তানায়কের মত এবং বিশ্বাসের সঙ্কলনমাত্র নয়। দর্শনের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে মানবসমাজের বিভিন্ন যুগের গতিপ্রকৃতি প্রতিফলিত হয়। দর্শন আসলে সৃজনশীল রচনা, অপরীক্ষিত এবং অন্ধ বিশ্বাসের বিবরণ নয়।

এই অধিবেশন চলার সময় রাধাকৃষ্ণান্ সেই সময়কার রাজ্যপাল ডা. কৈলাসনাথ কাটজুর অতিথি হিসেবে রাজভবনে থাকতেন। এই সময়কার একটি ঘটনায় যুবসম্প্রদায়ের প্রতি রাধাকৃষ্ণানের কতটা দরদ ছিল তা বোঝা যাবে। বয়স্ক মানুষ, ছাত্রছাত্রী, তরুণ-তরুণী—সর্বস্তরের লোকেরাই রাধাকৃষ্ণানের অটোগ্রাফ সংগ্রহ করার জন্য প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় ভিড় করতেন। এই অটোগ্রাফ-সংগ্রহকারীর সংখ্যা দিনে-দিনে এত বাড়তে লাগল যে রাধাকৃষ্ণানকে অন্য প্রয়োজনীয় কাজ বন্ধ করে শুধু নিজের নাম সইয়ের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতে হত। ইনডিয়ান ফিলসফিকাল কংগ্রেসের সহকারী সচিব হিসেবে এই প্রবন্ধের লেখককে নোটিশ জারি করতে হয়েছিল যাতে অটোগ্রাফ-সংগ্রহকারীর সংখ্যা সীমিত রাখা যায়। রাধাকৃষ্ণান্ এই ব্যাপারটা জানতে পেরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে লেখককে বলেছিলেন, 'কয়েকটি ছেলেমেয়ে আমার একটা সই পেলে যদি খুশি হয়, তাহলে তুমি সে কাজে বাধা দিচ্ছ কেন? তোমার উচিত এমন কোনো ব্যবস্থা চালু করা, যাতে সকলেই সন্তুষ্ট হয় অথচ আমার কাজের ব্যাঘাত না ঘটে।' রাধাকৃষ্ণান্-এর পরামর্শ অনুসারে লেখক সেনেট হাউসের সংলগ্ন বারান্দায় দুটি বড়ো মাপের চিঠির বাক্স রাখার ব্যবস্থা করেছিলেন, যার একটির মধ্যে প্রার্থীরা অটোগ্রাফের খাতাগুলি ঢুকিয়ে রাখতেন, আবার সময়মত অন্য বাক্সটি থেকে সেগুলি সংগ্রহ করে নিতেন। এই সময়ের মধ্যে রাধাকৃষ্ণান্ নাম সই করার কাজটি অবসরমত করে রাখতেন। কোনো খাতা হারিয়ে গেলে কর্তৃপক্ষের কোনো দায়িত্ব ছিল না।

রাধাকৃষ্ণান্ ছিলেন অত্যন্ত ছাত্রবৎসল। তাঁর

একটি কথায়, অথবা একটি টেলিফোনবার্তায়, অথবা একটা চিঠিতে যদি কোনো ছাত্রের উপকার হবে বুঝতেন, তাহলে তিনি সেই ব্যাপারে উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে যেতেন। আর দরিদ্র শিক্ষকসম্প্রদায়ের জন্যে তাঁর গভীর মর্মবেদনা ছিল। মনে পড়ছে ১৯৬৫ সালের ৫ই সেপটেম্বর তারিখে আমি কার্যোপলক্ষে দিল্লীতে ছিলাম। সেইদিনই ছিল রাধাকৃষ্ণানের জন্মদিন। রাষ্ট্রপতিভবন সেদিন অবারিত দ্বার। আমি আমার এক বন্ধুকে নিয়ে রাধাকৃষ্ণান্‌কে প্রণাম করতে যাই। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু খ্যাত-নামা ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন। রাধাকৃষ্ণানের স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর। আমাদের এক সহপাঠী কৃতী ছাত্র কলেজে অধ্যাপনার সুযোগ না পেয়ে একটি অখ্যাত স্কুলে চাকরি করত। রাধাকৃষ্ণানের এই ঘটনাটি মনে ছিল। ওই ছেলেটি কোনো কলেজে চাকরি পেয়েছে কিনা, সে কথা রাধাকৃষ্ণান্ সেদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আর-একবার রাষ্ট্রপতিপদে থাকার সময় তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনভাষণ দিতে গিয়ে-ছিলেন। কাজ শেষ করে ফেরবার সময় তাঁর হঠাৎ মনে পড়ল, তাঁর এক ছাত্রীর স্বামী কাশীতে কোনো একটা গলির ভেতরে এক বাড়িতে রোগশয্যায় শায়িত। রাষ্ট্রপতি তাঁর কন্‌ভয়ের পরিচালককে নির্দেশ দিলেন সেই বাড়িতে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য। রাষ্ট্রপতির সফরসূচীর মধ্যে এই ব্যাপারটি অন্তর্ভুক্ত ছিল না এবং ওই বাড়ির নম্বর, রাস্তার নাম, কিছুই তিনি বলতে পারেন নি। তবুও সেখানে তাঁকে যেতেই হবে। কন্‌ভয় বাহিনী অনেক কষ্টে সেই বাড়িটি খুঁজে বের করলেন এবং রাধাকৃষ্ণান্‌কে গন্তব্য স্থানে পৌঁছে দিলেন।

যতদূর মনে পড়ে, ১৯৬৭ সালের অগস্ট মাসে আমার মাদ্রাজ যাবার সুযোগ হয়। উপলক্ষ ছিল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের সঙ্গে যুক্ত "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিশন ফর কো-অপারেশন উইথ ইউনেস্কো"-

নামক সংস্থার বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করা। আমি ওই সংস্থার একজন সদস্য হিসাবে তিন বছর কাজ করেছি। রাধাকৃষ্ণান্ তখন রাষ্ট্রপতিপদ থেকে অবসর নিয়ে মায়লাপুরে (মাদ্রাজ) তাঁর নিজ বাড়িতে বাস করছেন। আমার পূর্বোক্ত সংস্থার কাজ শেষ হবার পরে আমি রাধাকৃষ্ণানের প্রাইভেট সেক্রে-টারিকে ফোন করে জানতে চাই কখন দেখা পেতে পারি; আমি শুধু আচার্যকে প্রণাম করেই চলে আসব। তিনি জানালেন, দর্শনপ্রার্থীর অনেক ভিড়। অদ্য একদিন ঠিক করলে সব দিক দিয়ে ভালো হয়। আমি তবুও আবার অনুরোধ করাতে সেইদিনই সাক্ষাতের সময় ঠিক হল। আমি ছিলাম সেদিন সর্বশেষ দর্শনপ্রার্থী। প্রথমে রাধাকৃষ্ণান্ কুশল-বিনিময়ের পরে জানতে চাইলেন কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের পঠন-পাঠন কেমন হচ্ছে; লজিক্যাল পজিটিভিজম্-এর ঢেউ, অ্যানালিটিক্যাল ফিলসফির প্রভাব কতটা বিস্তার লাভ করেছে ইত্যাদি। পরে আমি প্রশ্ন করেছিলাম: রাষ্ট্রপতিপদ থেকে আপনি তো অবসর গ্রহণ করেছেন। আপনার লক্ষ্য ছিল সুদক্ষ, পরিচ্ছন্ন, গণতান্ত্রিক প্রশাসন প্রবর্তন করা। সেদিক দিয়ে আপনি কতটা সফল হয়েছেন মনে করেন? উত্তরে তিনি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হয়ে সমস্ত হৃদয় উজাড় করে যেসব কথা সেদিন বলেছিলেন তা আজও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বিশেষ করে তিনজনের কথা তাঁর আলোচনার মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছিল। এঁরা হলেন—প্রতাপ সিং কায়রোঁ, ভি. কে. কৃষ্ণ মেনন এবং জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরী।

প্রতাপ সিং কায়রোঁ জানুয়ারি ১৯৫৬ থেকে জুন ১৯৬৪ পর্যন্ত পনজাবের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই পুরুষ বলিষ্ঠ পদক্ষেপে দিনের পর দিন অভীষ্টের দিকে এগিয়ে গেছেন। তাঁর আদেশ অমান্য করার সাহস কারও ছিল না। ১৯৫৭ এবং ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিপুল ভোটে

কায়রোঁ জয়ী হয়েছিলেন। তাঁর শক্তির উৎস ছিল জনসাধারণ। অদম্য কর্মশক্তি, নিপীড়িত জনগণের প্রতি গভীর সহানুভূতি, পনজাবকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে সমৃদ্ধ করার তীব্র অভিলাষ—এইসব গুণই তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। সহকর্মী ও অধস্তন কর্মচারী উভয় গোষ্ঠীকেই কায়রোঁ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। এই বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে অনেকেই গোপনে তাঁর বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন। কায়রোঁ এ ব্যাপারে শত্রুপক্ষের গতিবিধির কোনো হদিস পান নি। পরিশেষে তাঁর সহকর্মী, তাঁর ছেলেরা এবং অধস্তন কর্মচারীরা কায়রোঁর নাম ও প্রতিপত্তিকে মূলধন করে নানাপ্রকার অসৎ কাজে লিপ্ত হন এবং দুর্নীতির আশ্রয় নেন। স্বজনপোষণ, ক্ষমতার অপ-ব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগ যখন তুঙ্গে উঠেছিল তখনই কায়রোঁর বিরুদ্ধে তদন্তের প্রস্তাব ওঠে।

রাধাকৃষ্ণান্ এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ সমর্থন করে প্রধানমন্ত্রী নেহরুকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার পরামর্শ দেন। নেহরু কায়রোঁর বিরুদ্ধে তদন্তের প্রস্তাবে সায় না দিয়ে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণান্‌কে স্মরণ করিয়ে দেন যে কায়রোঁ পনজাবের যে সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধান করেছেন তা প্রশংসার যোগ্য এবং তাঁর কৃতিত্বের তুলনায় কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও তা ক্ষমার যোগ্য। প্রশাসনে গতিসঞ্চার করা, বিদ্যালয়ে ছুটি কমিয়ে কাজের দিন বাড়ানো, কৃষিশিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা, হরিজনদের ন্যায্য অধিকার সম্বন্ধে সর্বস্তরে প্রচার, দশ-দফা কর্মসূচী প্রবর্তন, পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার চেষ্টা প্রভৃতি সৎ প্রচেষ্টার ফলে কায়রোঁ ভারত সরকারের কাছে একজন আদর্শ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আদৃত। রাধাকৃষ্ণান্ মনোযোগ দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সব কথা শুনে বলেছিলেন: উনি সুদক্ষ প্রশাসক হতে পারেন, কিন্তু মানুষ হিসাবে অসাধু বলে শোনা যাচ্ছে। কাজেই এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করতেই হবে। প্রধান-মন্ত্রীর সকল সুপারিশ ব্যর্থ হল। কিন্তু মুশকিল হল, যেসব যোগ্য লোককে অনুসন্ধানের ভার দেওয়া হল তাঁরা সকলেই কোনো না কোনো অজুহাতে কাজটি এড়িয়ে গেলেন। অবশেষে এই দায়িত্ব দেওয়া হল সুধীরঞ্জন দাশ মহাশয়কে, যিনি ভারতের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। সুধীরঞ্জনও প্রথমে এই যুক্তি দেখিয়ে আপত্তি জানালেন যে তিনি কিছুকালের জন্য পনজাব হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন এবং কায়রোঁর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। অতএব তাঁর পক্ষে এই অনুসন্ধানের দায়িত্ব না নেওয়াই সঙ্গত। রাধাকৃষ্ণান্ তার জবাবে বলেছিলেন, 'বিচারক হিসাবে তুমি কতটা নিরপেক্ষ থাকতে পার সেটা প্রমাণ করার এই তো সুযোগ।' দাশ কমিশনের রিপোর্টে কায়রোঁ দোষী সাব্যস্ত হন এবং রিপোর্ট প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি পদত্যাগ করেন। ১৯৬৫ সালের ৬ ফেবরুয়ারি তারিখে আততায়ীর গুলিতে কায়রোঁ প্রাণ হারান। এটা অবশ্য খুবই মর্মন্তুদ ঘটনা এবং জঘন্য কাজ। রাধাকৃষ্ণান্ এই নিদারুণ সংবাদ শুনে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। রাধাকৃষ্ণান্ প্রধানমন্ত্রীকে এই কথাই বোঝাতে চেয়ে-ছিলেন যে উচ্চপদে যাঁরা আসীন তাঁদের সম্বন্ধে দুর্নীতির বিন্দুমাত্র আভাস পেলেই সেখানে তদন্তের ব্যবস্থা করতে হবে।

ভি. কে. কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে নেহরুর ঘনিষ্ঠতা ১৯৩০ সাল থেকে—যে বছর মাদ্রাজে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এঁরা দুজনেই সমাজতন্ত্রবাদী এবং ফ্যাসিবিরোধী প্রগতিবাদী। মেনন উগ্র সমাজতন্ত্রবাদী; নেহরু এ ব্যাপারে কিছুটা স্থির এবং বিনম্র। দুজনেই দুজনের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত। মেননের অসাধারণ বাগ্মিতা, প্রশাসনিক দক্ষতা, ভারতের সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে নিজেকে শামিল রাখার ক্ষমতা—এইসকল গুণ নেহরুকে আকৃষ্ট করেছিল। ১৯৬২ সালের ফেবরুয়ারি মাসে নির্বাচনে কৃপালনীকে

বিপুল ভোটে হারিয়ে মেনন ভোটযুদ্ধে জয়লাভ করেন। ওই বছরই সেপটেম্বর-অকটোবর মাসে চীন ভারতকে আক্রমণ করে, ভারত চীনের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। চীনের বিপুল অস্ত্রসম্ভার এবং বিশাল সৈন্যবাহিনীর কাছে ভারতের অস্ত্রসম্ভার আর সৈন্যসংখ্যা ছিল নগণ্য। এই সংগ্রামে ভারতের ব্যর্থতার জন্য প্রতিরক্ষামন্ত্রী মেননকে বরখাস্ত করার সুপারিশ এল কংগ্রেস পার্লামেনটারি পার্টি, কার্যকর সমিতির অধিকাংশ সদস্যদের কাছ থেকে। রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণান্‌ও প্রধানমন্ত্রীর ওপর চাপ দেন যাতে মেনন পদত্যাগ করেন। প্রধানমন্ত্রী রাধাকৃষ্ণান্‌কে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে চীনের আক্রমণের ব্যাপারে আমাদের বিপর্যয়ের জন্য মেনন সম্পূর্ণ দায়ী নন। অথবা তিনি সম্পূর্ণ দায়ী কিনা এ বিষয়ে তদন্তের অবকাশ আছে। তাছাড়া প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে মেননের কৃতিত্বের কথা অনস্বীকার্য। তিনি দেখিয়েছিলেন কিভাবে একটা উন্নতিশীল দেশ অতি আধুনিক অস্ত্রসম্ভার তৈরি করতে পারে। তিনি ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থল, নৌ ও আকাশ বাহিনীর পুনর্বিন্যাস করেছিলেন। তিনি সেনাবাহিনীর মধ্যে স্বাদেশিকতার বোধকে উজ্জীবিত রেখেছিলেন। প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রস্তুতের ব্যাপারে তিনি বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় প্রভূতপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় হয়েছিল। নেহরু একথাও রাধাকৃষ্ণান্‌কে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন যে চীন সরকার লাডাক-এ আকসাই চীন সড়ক তৈরি করে ফেলেছে, এ খবর জানবার সঙ্গে-সঙ্গে মেনন সীমান্তে প্রতিরক্ষার জন্য সুব্যবস্থার সুপারিশ করেন। কিন্তু মন্ত্রিসভা সে প্রস্তাব নাকচ করে কূটনীতিক পর্যায়ে সকল সমস্যার সমাধান করতে প্রয়াসী হন। তা ছাড়া, মেননের অনেক ফলদায়ক প্রস্তাবই অর্থমন্ত্রকের ঔদাসীন্য ও দীর্ঘসূত্রিতার জন্য বানচাল হয়ে যায়। রাধাকৃষ্ণান্‌ এসকল কথা শুনেও তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। মেনন যখন লনডনে ভারতের হাই কমিশনার পদে নিযুক্ত তখন যে জীপ-কেলেঙকারির সঙ্গে তিনি জড়িত হয়ে পড়েছিলেন সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রাধাকৃষ্ণান্‌ নেহরুকে বলেছিলেন, মেনন যেখানেই যান সেখানেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন, তিনি সকল ভব্যতা বিসর্জন দিয়ে উচ্চপদস্থ মানুষের সঙ্গে নির্দয় ব্যবহার করে থাকেন। সামরিক ব্যবস্থার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হয়েও তিনি সৈন্যাধ্যক্ষের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে নিজের খেয়ালখুশিমতো পদস্থ অফিসারদের নিয়োগ ও বদলির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে থাকেন। রাধাকৃষ্ণান্‌ মেনন সম্বন্ধে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে এক চুল নড়েন নি বলেই শেষ পর্যন্ত মেনন ১৯৬২ সালের ৭ নভেমবর তারিখে প্রতিরক্ষামন্ত্রিপদে ইস্তফা দেন। রাধাকৃষ্ণান্‌ বর্তমান লেখককে বলেছিলেন যে নেহরু যখন জানতে পারলেন যে তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধুকে আর বাঁচাবার কোন পথ নেই তখন তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছিল।

উপরাষ্ট্রপতিপদে থাকার সময়ও রাধাকৃষ্ণানের প্রভাব ও ক্ষমতা কিছু কম ছিল না। এম. ও. মাথাই নামে নেহরুর খুব বিশ্বাসভাজন এবং দিল্লীতে খুব প্রভাবশালী একজন অফিসার ছিলেন। তিনি ছিলেন স্পেশ্যাল অ্যাসিসট্যানট টু দ্য প্রাইম মিনিস্টার। ক্যাবিনেট পর্যায়ে মন্ত্রীরাও নেহরুর অনুগ্রহ ভিক্ষার জন্য মাথাইয়ের শরণাপন্ন হতেন। মাথাই তাঁর মায়ের নামে একটি ট্রাস্ট ফানড তৈরি করে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করেন। এজন্য তাঁকে বহু বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় এবং শেষ পর্যন্ত নানা দিক থেকে চাপ আসতে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। সেটা ১৯৫৮ সালের কথা। শেষে ক্যাবিনেট সেক্রেটারির দ্বারা এই ব্যাপারে তদন্তের ফলে মাথাই নির্দোষ বলে রেহাই পান এবং নেহরু তাঁকে আবার পূর্বপদে বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু রাধাকৃষ্ণানের তীব্র বাধাদানের ফলে মাথাইকে পুনর্নিয়োগের ব্যাপারে নেহরু আর অগ্রসর হন নি।

জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরীর সঙ্গে রাধাকৃষ্ণানের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর। রাধাকৃষ্ণান্‌ জেনারেল চৌধুরীর কর্তব্যে নিষ্ঠা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সামরিক ব্যাপারে দূরদৃষ্টি এবং সর্বোপরি গভীর দেশপ্রেমের প্রশংসা করতেন। সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি হলেন স্থল, নৌ ও আকাশবাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক। কিন্তু রাধাকৃষ্ণান্‌ জেনারেল চৌধুরীর ক্ষমতা ও বিচার-বুদ্ধির ওপর এতটা আস্থাবান ছিলেন যে কখনও তাঁর সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করেন নি। ১৯৬৫ সালের ৫ মে পাকিস্তানের অভিসন্ধি স্পষ্ট বোঝা গেল। তারা যে কাশ্মীর আক্রমণ করবে একথা সুনিশ্চিত জেনে জেনারেল চৌধুরী প্রতিরক্ষামন্ত্রী চ্যবন এবং প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে ভারতের দ্বারা পালটা আক্রমণের প্রস্তাব রাখলেন। শাস্ত্রীজি প্রথমে পালটা আক্রমণের প্রস্তাবে রাজি ছিলেন না। গান্ধীজির শিষ্য হিসাবে তিনি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কোনো মীমাংসায় আসা যায় কিনা সে কথা ভাবছিলেন। কিন্তু জেনারেল চৌধুরী যখন মানচিত্রের সাহায্যে যুদ্ধপরিস্থিতি সকলকে বুঝিয়ে দিলেন তখন রাধাকৃষ্ণান্‌ সম্পূর্ণরূপে জেনারেল চৌধুরীকে সমর্থন করে পাকিস্তান আক্রমণের প্রস্তাবে সায় দিলেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে আর অন্য কোনো পথ খোলা রইল না। কচ্ছ সীমান্ত থেকে পাকিস্তান আক্রমণ চালাতে পারে, এইরকম একটা আশঙ্কা দেখা দিলে জেনারেল চৌধুরী আবার সামরিক প্রস্তুতির দিকে মন দেন। এই সময়ে হঠাৎ তিনি তাঁর পিতার কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে সংবাদ পান। পিতার শেষকৃত্য করবার জন্য তিনি কলকাতায় যাবেন কিনা ভাবছেন, এমন সময় প্রতিরক্ষামন্ত্রী চ্যবনের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি দেশের সংকটের মুহূর্তে দিল্লীতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

রাধাকৃষ্ণানের পূর্বে সোভিয়েত দেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। সোভিয়েত বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের সম্পর্ক সে সময়ে খুব প্রীতিপূর্ণ ছিল না। উভয় দেশের মধ্যে এক ধরনের ঔদাসীন্য বড়োই প্রকট হয়ে পড়েছিল। রাষ্ট্রদূতের পদে রাধাকৃষ্ণান্‌ আসবার পরে দুই দেশের সম্পর্ক কিছুটা উন্নতি লাভ করে। তার কারণ এই যে রাধাকৃষ্ণান্‌ কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন না, কাজেই তিনি বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন। তাছাড়া বিশিষ্ট দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ হিসাবে তাঁর খ্যাতি ইতিমধ্যেই বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি কূটনীতিক চাল প্রয়োগের চাইতে সত্যভাষণকে বড়ো স্থান দিতেন, সে সত্য যতই অপ্রিয় হোক না কেন। রাধাকৃষ্ণানের প্রভাবে ধীরে-ধীরে ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত দেশের কূটনীতিক সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং সোভিয়েত দেশের জনসাধারণ রাধাকৃষ্ণানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম প্রকাশ করতে থাকেন। বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত যে ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করেছিল তার পিছনে রাধাকৃষ্ণানের দান কিছু কম নয়, একথা সোভিয়েত দেশের মানুষ ভালো করেই বুঝেছিলেন।

সোভিয়েত দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা রাধাকৃষ্ণানকে কী চোখে দেখতেন সেই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার একটি বক্তৃতা দেবার পরে ছাত্র-ছাত্রীরা রাধাকৃষ্ণানকে ঘিরে ধরে প্রশ্ন করে: তোমাকে এদেশে রাষ্ট্রদূত হিসাবে পাঠিয়ে ভারত সরকার সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছে কি? তুমি তো ঈশ্বরে বিশ্বাসী; আমরা নাস্তিক। তোমার মতে ধর্মই জগতের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে। আমরা ধর্মকে ঘুমপাড়ানি আফিমের মতন মনে করি। রাধাকৃষ্ণান্‌ মৃদু-মৃদু হাস-ছিলেন। তিনি এ প্রশ্নের জবাব দেওয়ার কোনো তাগিদ অনুভব করেন নি। পরিশেষে ছাত্র-ছাত্রীদের তীব্র চাপের কাছে তাঁকে নতি স্বীকার করতে হল। তিনি তিনটি ছাত্রকে পালটা প্রশ্ন করে জানতে পারলেন তারা তিনজনেই নিরন্তর গবেষণা করে

অ্যাকাডেমিসিয়ান হতে চায়। একজন পদার্থবিদ্যার ছাত্র, একজন নন্দনতত্ত্বের এবং অপরজন সমাজ-বিজ্ঞানের। প্রথমজনকে রাধাকৃষ্ণান্ বললেন, তোমার জীবনের লক্ষ্য তো "সত্য"; সত্য লাভের জন্য তুমি প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। দ্বিতীয়জনকে বললেন, তোমার জীবনের লক্ষ্য তো "সুন্দর"। আর তৃতীয় জনকে বললেন, তোমার জীবনের লক্ষ্য কল্যাণ বা "শিব"। আমাদের ঈশ্বর হলেন সত্য, শিব ও সুন্দরের সংহত রূপ। তোমরা সেই অখণ্ড ঐশী শক্তিকে ভাগ-ভাগ করে অর্চনা করছ—এই তফাত। হাসির রোলে সভার সকল উল্লসিত হল এবং সবাই বলে উঠল, 'তুমি যে এত চালাক তা জানতাম না।'

উপসংহার

একথা সকলেই স্বীকার করে থাকেন যে, রাধাকৃষ্ণানের অসামান্য কৃতিত্ব তিনি ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতির মর্মবাণীকে পাশ্চাত্য দর্শনের ভাষায় পশ্চিমের কাছে বোধগম্য করে তুলেছেন। এক কথায় তিনি পূর্ব এবং পশ্চিমের মধ্যে একটি মিলনের সেতু রচনা করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় কৃতিত্ব এই যে তিনি হিন্দু ধর্মকে উদার, প্রগতিশীল এবং সর্বজনীন ধর্মরূপে মানবসমাজের কাছে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তৃতীয়ত, মানুষের সত্তার গভীরে যে আধ্যাত্মিক সত্য বিরাজ করছে তাকে অবলম্বন করেই পৃথিবীর দুর্গতি আর দুর্দশা দূর করা যাবে—এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

হিন্দুধর্মের স্বরূপের তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার উৎস হল, বিবেকানন্দের চিকাগো ধর্মসভায় প্রদত্ত ভাষণ এবং শ্রীঅরবিন্দের রচনাবলী, বিশেষত "বন্দেমাতরম্" পত্রিকার প্রবন্ধাবলী ও তাঁর বিখ্যাত উত্তরপাড়া অভিভাষণ। রাধাকৃষ্ণান্ ছিলেন ভাষার জাদুকর, কাজেই তাঁর রচনার বহু জায়গাতেই ভাবের আতিশয্যে ব্যবহৃত উপাদানগুলি নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। উদাহরণ হিসেবে, "হিন্দু ভিউ অব লাইফ" গ্রন্থের একটি বাক্য ধরা যাক। তিনি বলছেন, 'Hinduism is a name without a content. Hinduism has come to be a tapestry of the most variegated issues and almost endless diversity of hues'। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই বাক্য থেকে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কোনো ধারণা করা সুকঠিন। হিন্দুধর্মের অন্তর্গত গণতান্ত্রিক ভাবকে রাধাকৃষ্ণান্ অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু যতদিন হিন্দুধর্ম জাতিভেদপ্রথাকে আঁকড়ে থাকবে ততদিন কিভাবে হিন্দুধর্ম গণতন্ত্রের পরিপোষক হতে পারে সেটা রাধাকৃষ্ণান্ বুঝিয়ে দেন নি। ইসলামধর্মের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি অত্যন্ত বেশি সুফীবাদের উপর নির্ভর করেছেন। কারণটা বোধহয় এই যে, সুফীবাদ এবং বেদান্তের মধ্যে অনেক ব্যাপারে সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। খ্রীষ্টধর্মের সার সত্য হিসেবে রাধা-কৃষ্ণান্ যিশুর উপদেশাবলীকে জীবনের পাথেয় বলে গণ্য করেছেন। হিন্দুর অবতারবাদ এবং খ্রীষ্টানদের অবতারবাদ যে এক জাতের নয়, একথা রাধাকৃষ্ণান্ বোধহয় বিস্মৃত হয়েছেন। আসল কথা এই যে প্রত্যেক ধর্মের পিছনে একটা তত্ত্ব থাকে, থাকে কিছু পৌরাণিক কাহিনী আর আচার-অনুষ্ঠান। এই তিনটিকে একত্র করে নিলে এবং একটা ধর্মমতাবলম্বী জাতির ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেখলে তবেই আমরা একটা ধর্মমতের সম্পূর্ণ চিত্র পেতে পারি। "আত্মাই ব্রহ্ম"—এ বাক্যের তাৎপর্য একজন হিন্দু যেমন ভাবে গ্রহণ করেছেন, একজন মুসলমান বা একজন খ্রীষ্টান সেভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। ঠিক তেমনই একজন মুসলমানের কাছে "আল্লা দয়ালু" বাক্যটি যেভাবে অর্থবহ হয়ে ধরা দেয়, একজন হিন্দু বা খ্রীষ্টানের কাছে সেভাবে ধরা দেয় না। রাধাকৃষ্ণান্ যেহেতু খ্রীষ্টসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে খ্রীষ্টধর্মের আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব পালন করেন নি, সেইজন্য তিনি খ্রীষ্টধর্মের সামগ্রিক তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সমর্থ হন নি। খ্রীষ্টান সম্প্রদায় এ অভিযোগ করে থাকেন।

তিনি যে সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বলেছেন, খ্রীষ্টান চিন্তানায়কদের মতে সেই দাবির মূলে কোনো দৃঢ় প্রত্যয় নেই। এই প্রসঙ্গে রাধাকৃষ্ণানের পরবর্তী স্পল্‌ডিং অধ্যাপক আর. সি. জেহ্‌নার সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন যে, সকল ধর্মই যে এক লক্ষ্যে পৌঁছায়, একথা প্রমাণ করা খুব শক্ত। হিন্দুর চিন্তা-ধারা ও সেমিটিক চিন্তাধারা, জেহ্‌নারের মতে, পরস্পরবিরুদ্ধ না হলেও পৃথক। মাত্র একটি বিষয়ে এদের মধ্যে মিল আছে, সেটা এই যে, প্রত্যেক মানুষই মুক্তিপ্রয়াসী। তবে সে মুক্তির স্বরূপ কী সে বিষয়ে আবার এদের মধ্যে মতভেদ আছে। সেই-জন্যই জেহ্‌নার বলেন যে, হিন্দুধর্ম বা বৌদ্ধধর্মকে খ্রীষ্টধর্মের প্রত্যয়ের মাধ্যমে বিচার করা যায় না, ঠিক তেমনি নিউ টেসটামেন্টের বাণী এবং বেদান্তের বাণীর মধ্যে সামঞ্জস্য আনবার চেষ্টা করাও ব্যর্থ চেষ্টা।

রাধাকৃষ্ণানের প্রচেষ্টা অনেক ক্ষেত্রে যে ফলপ্রসূ হয়েছে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। শিকাগোর ড পল বিশ্ববিদ্যালয়ের থিয়লজির অধ্যাপক ফাদার রবার্ট ক্যামপবেল ১৯৬৮ সালে কোন এক সভায় বলেছিলেন যে উদারপন্থী খ্রীষ্টান সম্প্রদায় ধীরে ধীরে হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি সহানু-ভূতিশীল হচ্ছে। স্বর্গে যাবার অভিলাষ ত্যাগ করে এখন আমাদের কর্তব্য হবে জগৎসংসারকে কিভাবে উন্নত করা যায় সেই পথের সন্ধান করা। হিন্দুর ধর্ম ও দর্শনের সংস্পর্শে এসে উদারপন্থী খ্রীষ্টানরা বুঝতে চেষ্টা করছেন কী অর্থে প্রত্যেক মানুষই ভাগবত শক্তির অংশ। বর্তমানে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি, বিশেষ করে রাশিয়া ও চীন বিবেকানন্দদর্শনের প্রতি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। এ কথা সকলেরই জানা। রাধাকৃষ্ণান্ এই কথাই বারবার বলেছেন যে বিভিন্ন ধর্মমত মিলেমিশে যাক (fusion), এটা আমাদের কাম্য নয়। বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে সমঝোতা আসুক এটাই আমাদের অভিপ্রেত। গত ১০০ বছর যাবৎ এইজাতীয় ভাববিনিময়ের কাজ নানাভাবে সার্থক হয়েছে।

ব্রাদার লরেন্স যেমন বলেছেন, ঈশ্বরের অবস্থিতির কথা নিরন্তর অভ্যাসের দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, সেইরকম রাধাকৃষ্ণান্‌ও ঈশ্বরোপলব্ধির বিষয়ে নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানের কথা এবং ঐকান্তিক প্রেমের কথা বলেছেন। যদিও তিনি ধর্মকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—এক শ্রেণীর মতে ঈশ্বর বস্তু বা বিষয়, তাকে প্রার্থনার দ্বারা, বিশ্বাসের দ্বারা পাওয়া যায়; আর এক শ্রেণীর মতে ঈশ্বর উপলব্ধির বিষয়—তবুও তাঁর পক্ষপাতিত্ব দ্বিতীয় শ্রেণীর উপরে। তাঁর মতে অপরোক্ষানুভূতির ফলে মন নামক অন্তরিন্দ্রিয় বিলুপ্ত হয় এবং তার সঙ্গে-সঙ্গে অহং-এরও বিনাশ ঘটে। জ্ঞাতা অহং-এর বিনাশ ঘটার অর্থ সেই অবস্থায় জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না। অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞানক্রিয়া এবং জ্ঞেয় বস্তু, এই তিনটিরই বিলুপ্তি ঘটে। শুধু স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্য বিরাজ করে। রাধাকৃষ্ণান্ বিশ্বাস করেন যে, সকল মানুষই ঐকান্তিক সাধনার ফলে এই অবস্থায় পৌঁছুতে পারে। এই অবস্থায় পৌঁছুতে হলে কতগুলি সোপানের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এদের মধ্যে একটি সোপানের উপর রাধাকৃষ্ণান্ খুব বেশি জোর দিয়েছেন; সেটি হল নান্দনিক উপলব্ধি। যদিও একথা স্বীকার করতেই হবে যে হিন্দুধর্ম, বিশেষত বেদান্ত ধর্ম উপলব্ধিকেন্দ্রিক আর সেমেটিক ধর্মে ঈশ্বর বিশ্বাসের বস্তু, তবুও রাধাকৃষ্ণান্ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে কোনো দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইউনেস্কোর কার্যকরী সমিতির সভাপতি হিসেবে যখনই তাঁকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বোঝাপড়ার প্রস্তাব পরীক্ষা করতে হয়েছে তখনই তিনি বিশ্বচেতনার পক্ষে রায় দিয়েছেন। তাঁর মতে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে চিরকালের ব্যবধান স্বীকার করার মানেই মানুষের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা। তত্ত্বের দিক থেকে যেমন রাধাকৃষ্ণান্ আজীবন মানবজীবনের আধ্যাত্মিক

ভিত্তিভূমির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তেমনি আধ্যাত্মিক সত্যের জীবনে প্রয়োগের কথা ভেবে ইউনেস্কো এবং ওইজাতীয় অন্যান্য সংস্থাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ইউনেস্কো কমিটির বহু অধিবেশনের রিপোর্টে দেখা যায় যে রাধাকৃষ্ণান্ খুব জোর দিয়ে এই কথাই বলছেন, যে পুরপশ্চিমকে এবং পশ্চিম পুবকে তখনই সঠিক বুঝতে পারবে যখন তারা সকল মানুষের অন্তর্নিহিত চৈতন্যের অস্তিত্ব উপলব্ধি করবে। মানুষ যাতে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে বিশ্বচেতনার দিক থেকে সকলমানবিক মূল্যকে বিচার করতে শেখে, তারই জন্য রাধাকৃষ্ণানের সকল প্রচেষ্টা, সকল অধ্যবসায়।

যে দর্শন মননের উপর, বুদ্ধিবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, তার সাহায্যে আমরা বড় জোর আমাদের লক্ষ্যের দরজায় পৌঁছতে পারি, কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করতে পারি না; ভেতরে প্রবেশ করতে হলে অপরোক্ষানুভূতির প্রয়োজন, যে অনুভূতি নিজেই নিজের প্রমাণ, যা স্বয়ংপ্রকাশ, এবং যুক্তিনিরপেক্ষ। রাধাকৃষ্ণানের নিজের ভাষায়: Philosophy carries us to the gates of the promised land, but cannot let us in; for that, insight or realisation is needed.

আমার বন্ধুর বাড়ি

সুধেন্দু মল্লিক

আমার বন্ধুর বাড়ি হয়তো এখন স্তব্ধ। হয়তো সব
দরজাই বন্ধ—সব জানালা। হয়তো বা সবই খোলা। অবাধ আকাশে
কয়েকটি বন্দী নক্ষত্র।
জানি আজো তারা হাসে, কথা বলে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে
গড়িয়ে যায় তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার আহার। ব্যথিত স্নায়ুতে
ঘনায় রাত্রি। কিন্তু কোনো শব্দ নেই। আমার বন্ধুর বাড়ি
সুদূর তারার চেয়েও দূরে।

আমি জানি ডাকলে সে সাড়া দেবে ঠিক, কিন্তু আমি
শুনতে পাব না। আমাকে দেখলে সে জড়িয়ে ধরবে
স্পর্শহীন আলিঙ্গনে। আমার বন্ধুর বাড়ি আজ ঝরা
পাতায় স্তব্ধ তার হৃদয়েরই মতো। কয়েকজন ছায়ামানুষ
পরস্পরের দিকে অপলক চেয়ে থাকে। একজনের
অনুচ্চারিত উপস্থিতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার অনুপস্থিতিতে।
দেয়ালে যেন কার রেখার আশ্চর্য অবয়ব। ওই করাঘাত
যেন বড়ো চেনা। নিঃশব্দে উঠে আসে নীচের সিঁড়ি।
আমার বন্ধু তার আত্মজ্ঞানের শিখায় বিষণ্ণ রহস্যময়
হেসে বলে—না না, সে আসতে পারে না
অগ্নিস্রোতে ভেসে গেছে সে কুসুম।

আমার বন্ধুর বাড়ি। এখন গভীর রাত। ছায়াগুলি স্থির।
যেন কত যুগ পর একটি ফুঁকড়ে-যাওয়া ছায়া বাতাসের স্বরে
ডাকে—বাবা, তুমি ঘুমোও নি? আরেকটি ছায়া
বিচ্ছিন্ন শাখার মতো দুলে ওঠে, কয়েকটি বৃষ্টির ফোঁটা
ঝরে যায়—মা, তুমি ঘুমোও নি আজো।
তখনি পিতার দুটি চোখ ক্লান্ত পিষ্ট শূন্য দুটি চোখ
হয়ে যায় কানায় কানায় পূর্ণ নিবিড়
বনের সরোবর। আর সেই নয়নসরসীনীরে একটি শুভ্র
শতদলকন্যা তার ঝড়ের হাওয়ায় যেন ত্রস্ত হয়ে
দোলে কাঁপে নতমুখে।

আমার বন্ধুর বাড়ি। খুব দূরে। হয়তো আমি কখনো
যাব না। কেননা সেখানে আজ কবি নয় কবির আত্মাই
যেতে পারে। সে-ই শুধু জানে আমার বন্ধুর বাড়িতে

এখন একজন অনন্ত আকাশ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন জলে
ভাসমান ওই বিদীর্ণ কমলিনী আর তাঁর
দীর্ঘ হাতের সাবধানে সরিয়ে দিচ্ছেন যত
ঝড়ের নিঃশ্বাস।

প্রকৃতিমানুষ

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

কাঠচাঁপার পাশেই ইউক্যালিপটাস,
একজন ঝামরে ওঠা সোহাগি শরীর
যেন আচমকা উচ্ছ্বাসে উঠে
ফুলে ফেটে থমকে গিয়েছে!
ক্যালিপটাস টান টান ঊর্ধ্বের দিশারি
আকাশের গুরুজন পাড়ার তারারা নেমে
তার কাঁধেই হাত রাখবে প্রথম!

শান্তিনিকেতনে এলেই এই দুই বন্ধু গাছের কাছের
অতিথিশালার বিশ্রামে চলে যাই
কাছে গিয়ে বলি 'আমি ভালো নেই—তোমরা কেমন?'
উত্তরে দুজনেরই ডাল ভিন্নপ্রথায় নড়ে।
দু-একটা পাখিও শুনি করে ওঠে চাপা টুঁই টুঁই!
জানি না বিহঙ্গধ্বনি গাছের ভাষারই কোনো অনুবাদ কিনা!

রাত্রেও মনে হয় কাঠচাঁপা ইউক্যালিপটাস কথা বলে
আমার বিষয়ে! আজ প্রায় পনেরো বছর
তারা এই ক্ষণপান্থ আমাকে দেখছে,
দেখছে চুলের মতো ভাষার শিরোপা যার
খসে যাচ্ছে দ্রুত, দেখছে সবুজ ছায়া
বদলে যাচ্ছে পদচ্যুত নিষ্ফল হলুদে!
আমার বসন্ত আজ দিগন্তেরও পরের ধূ ধূ-তে গেছে
অগস্ত্যপ্রস্থানে, সে আর ফিরবে না না
যদি কোনো অলৌকিক ভাষা এসেও পায়ে ধরে সাধে!
তাই ফাল্গুনে যখন গাছে গাছে নতুন উন্মাদ
সবুজ উল্লাসে ফেরে, আমি ঈর্ষায় অন্ধ হয়ে যাই,
গাছ দুটি সম্ভবত এই নিয়ে আলোচনাও করে
জোনাকিইঙ্গিত হয় আদানপ্রদান।
আমি বাগানের দিকের জানালা বন্ধ করে
বিছানার অন্ধকারে ফিরে এসে মৃত্যু অভ্যাস করি।

এমন অনীহা দেখে কাঠচাঁপা ক্যালিপটাসে
জেগে ওঠে হাহাকারের মর্মর।

কথা থাকতে পারে

মতি মুখোপাধ্যায়

নীরবে ঝরেছে কিছু শিশির বকুল
তার চোখে মুখে
এই ভোরে উজ্জ্বল অসিতে
ছিন্ন-দেহ অন্ধকার, তবু
তারও কিছু কথা থাকতে পারে।

কোনোদিন অভিমান হিমশৈল হয়ে
ছিল নাকি তার বুকে নীল শান্ত ঘুমে
আশা কি ছিল না তার
প্রিয় নাম ধরে
কেউ তাকে ডেকে নেবে বুকের ভিতরে?

ঢের কথা হয়ে গেছে আলোর বিষয়ে
মধ্যদিনে আকস্মিক
মনে হয় নাকি
অন্ধকারেরও কিছু কথা থাকতে পারে?

নারীকণ্ঠ

মল্লিকা সেনগুপ্ত

'তোদের দাম্পত্য ভেঙে যাবে'—অন্ধগুহামুখ থেকে
নারীকণ্ঠে এই শব্দ ভেসে এসেছিল।

ট্রয়ের শ্মশান থেকে উঠে আসা কাসান্দ্রার গলা!
কে ওকে বিশ্বাস করে? বয়ে গেছে ওর অভিশাপে।

গুহার সামনে গিয়ে মনে হল শব্দ নয়, যেন
মারমুখী জনরব ঢিল ছুঁড়ে মারতে চাইছে

কেন! জনরব কেন উষাকালে আমার বিপক্ষে?
আমি তো ওদের ঢিল মারতে চাই নি। অন্য কিছু!

কোনো গ্রীক নারী নয়, মারমুখী জনরব নয়
অপার্থিব ওই কণ্ঠ আমার নিজেরই প্রতিধ্বনি।

পেরেস্ত্রৈকা-গ্লাসনস্তের পরিপ্রেক্ষিতে

নিকোলাই বুখারিন প্রসঙ্গ

সুনীল সেন

এক

লেনিনোত্তর যুগের মার্কসবাদী বিপ্লবীদের মধ্যে গ্রামসি এবং বুখারিনের (১৮৮৮-১৯৩৮) নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে। সমসাময়িক এই দুই বুদ্ধিজীবী ফ্যাসিস্টতন্ত্রের স্বরূপ বুঝে এক ব্যাপক মোরচা গঠনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠিত এবং সুরক্ষিত করার জন্য কৃষিসমস্যা এবং শ্রমিক-কৃষকমৈত্রী তাঁদের লেখায় গুরুত্ব পেয়েছে। মাত্র দুই দশক আগে গ্রামসি মার্কসবাদীদের আলোচনার কেন্দ্র হয়েছেন, কিন্তু বুখারিন এখনো প্রায় অজ্ঞাত। সম্প্রতি গ্লাসনস্তের কল্যাণে বুখারিনের পুনর্বাসন হয়েছে। তিনি এখন স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। যত দূর জানি, এদেশে মানবেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায় বুখারিন স্থান পেয়েছেন। চীনে মানবেন্দ্রনাথের অনুসৃত নীতির সমর্থক ছিলেন বুখারিন। জারমান ফ্যাসিস্টতন্ত্রের বিপদ সম্পর্কে বুখারিনের মতো মানবেন্দ্রনাথও ত্রিশের দশকে সজাগ ছিলেন; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফ্যাসিস্ট-বিরোধী চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো সংশয় ছিল না।

মসকোর এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮৮৮ সালে বুখারিনের জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন স্কুলের শিক্ষক এবং গণিতজ্ঞ। বাবার কাছে তিনি পান বিশ্বসাহিত্যে গভীর আগ্রহ; তাঁর ছাত্রজীবনের বন্ধু এরেনবুর্গ। স্কুলে অধ্যয়নরত এই প্রতিভাবান ছাত্র সেকালের অনেক বুদ্ধিজীবীর মতো গুপ্ত মার্কসবাদী সমিতিতে যোগ দেন, এবং স্কুল থেকে বিতাড়িত হন। ১৯০৬ সাল থেকে পেশাদার বিপ্লবী হলেও তিনি মসকো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতি হন; তাঁর বিষয় ছিল অর্থনীতি। স্টলিপিন পর্বের ভয়ঙ্কর দমননীতির মুখে ১৯১০ সালে তিনি দেশ ত্যাগ করে বিদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন; লেনিন এবং ট্রটস্কির মতো ফেবরুয়ারি বিপ্লবের পরে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই পর্বেই "সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্ব-অর্থনীতি"র পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়; লেনিনের "সাম্রাজ্যবাদ" প্রকাশিত হবার কয়েক মাস আগে তাঁর এই বই প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর লেখায় হিলফার্ডিঙ-এর প্রভাব প্রতিভাত। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের গুরুত্ব তাঁর চোখে পড়েছিল। দেশে ফেরবার সঙ্গে-সঙ্গে মার্কসবাদী পণ্ডিত হিসাবে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৮ সালে তিনি "প্রাভদা"-র সম্পাদক নিযুক্ত হন; বারো বছর তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৯-এ প্রতিভাবান তরুণ মার্কসবাদী প্রিওব্রেঝেন্‌স্কির সঙ্গে তিনি লেখেন "কমিউনিজমের এ. বি. সি"; দু বছর পরে "ঐতিহাসিক বস্তুবাদ"। তাত্ত্বিক হিসাবে লেনিনের পরেই তাঁর স্থান তখন দেশেবিদেশে প্রতিষ্ঠিত। ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেসে (১৯১৭) তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। লেনিন ট্রটস্কি, জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, স্তালিন প্রমুখ নেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তরুণ বয়সে এই অসাধারণ সাফল্যের মূলে ছিল তাঁর পাণ্ডিত্য, সৌজন্য, উদারতা; পুরনো নেতাদের অটল গাম্ভীর্যের পাশাপাশি তাঁর সদাহাস্যময় মুখ তরুণদের আকৃষ্ট করেছিল।

অনেক বুদ্ধিজীবীর মতো (যার দৃষ্টান্ত গ্রামসি) বুখারিন রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্বে ছিলেন উগ্র বামপন্থী। বিশ্ববিপ্লবের স্বপ্নে বিভোর, ব্রেস্ত লিতভস্ক চুক্তির বিরোধী। বিপ্লবী যুদ্ধের প্রবক্তা বুখারিন বার-বার লেনিনের বিরোধিতা করেন। পরে তিনি ভুল স্বীকার করে বলেছিলেন, ব্রেস্ত চুক্তির ফলেই সোভিয়েত রাশিয়া লাল ফৌজ গঠনের সময় পেয়েছিল। ১৯২০-এ "ওয়র কমিউনিজম" সম্বন্ধে মোহমুক্ত বুখারিন "নেপ" (নিউ ইকনমিক পলিসি)-এর সমর্থক হন। তখন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি লেনিনবাদকে আঁকড়ে থাকেন। তিনি নিজেই বলেছেন, লেনিনের কাছে মার্কসবাদে আমার শিক্ষা। ট্রটস্কি লিখেছেন, এই ব্যক্তি লেনিনের বিরোধিতা করলেও তাঁর কাছে নতজানু হয়ে থাকেন, শিশু যেমন থাকে মায়ের কাছে। লেনিন অবশ্য তাঁকে "মোমের মতো নরম" বলে মনে করতেন। পার্টিতে "সবচেয়ে প্রিয়" এবং "শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক" হলেও বুখারিন "ডায়ালেকটিক" ঠিক বুঝতে পারেন নি বলে লেনিন-এর ধারণা ছিল; বুখারিনের লেখায় পাণ্ডিত্যের প্রকাশ লেনিনের পছন্দ হয় নি। গ্রামসিও লিখেছেন, বুখারিন "ডায়ালেকটিক" বুঝতেন না।

অনেক লেখকের মতে, লেনিনের মৃত্যুর পর শুরু হয় উত্তরাধিকারের সংগ্রাম; প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী তিন নেতা—ট্রটস্কি, কামেনেভ, জিনোভিয়েভ। এঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে উজ্জ্বলতম ট্রটস্কি; একাধারে মার্কসবাদে পণ্ডিত, বক্তা, লালফৌজের নির্মাতা, গৃহযুদ্ধের বিজয়ী বীর। শেষ পর্যন্ত এই তিন নেতা একই মঞ্চে মিলিত হন। এই পর্বে দেখা গেল, স্তালিন-বুখারিন মৈত্রী। চরিত্রে সামান্যতম মিল না থাকলেও স্তালিন আর বুখারিনের জোট অক্ষুণ্ণ ছিল ১৯২৮ পর্যন্ত। তুমুল রাজনৈতিক বিতর্কে বিরোধী নেতাদের বক্তব্য খণ্ডন করতেন বুখারিন; স্বভাবতই তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য তিনি। চতুর্দশ পার্টি কংগ্রেসে (১৯২৫) স্তালিন বলেছিলেন, 'আপনারা বুখারিনের রক্ত চান। সে রক্ত আমরা দেব না।' ই. এইচ. কার লিখেছেন, স্তালিনের জীবনে উচ্ছ্বাসের প্রকাশ এই একবারই দেখা দিয়েছিল। স্তালিনের "এক দেশে সমাজতন্ত্র" প্রতিষ্ঠার নীতি বুখারিন সমর্থন করেন।

১৯২৪-২৮ পর্বে বুখারিন সাফল্যের শীর্ষে অধিষ্ঠিত —কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সাধারণ সম্পাদক। "প্রাভদা"র সম্পাদক, "লাল অধ্যাপকদের" বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতা, পলিট ব্যুরোর সদস্য। জনপ্রিয়তায় তাঁর ধারেকাছেও কেউ তখন আসতে পারেন না। এই পর্বেই বামপন্থীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও গ্রামসি ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন; কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকে বুখারিনের বিশিষ্ট বন্ধু তোগলিয়াত্তি, মানবেন্দ্রনাথ। তাঁর সমর্থক

রুশ প্রধানমন্ত্রী রায়কভ এবং ট্রেড ইউনিয়নের প্রধান টমস্কি। "প্রাভদা"র সম্পাদকীয় বিভাগে তাঁর সহকারী ছিলেন লেনিনের বোন মারিয়া উলিয়ানোভা। বুখারিনের অবিচল সমর্থক উলিয়ানোভা তাঁর পতনের পরে পদচ্যুত হন, আর প্রধানমন্ত্রী রায়কভ তাঁর সঙ্গে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন (১৯৩৮)।

দুই

সোভিয়েত রাশিয়ায় পুরনো নেতৃত্বের ধ্বংস এবং স্তালিন-পর্বে ব্যক্তিতন্ত্রের উদ্ভব বর্ণনাপ্রসঙ্গে অনেক লেখক কমিউনিস্ট পার্টির কাঠামোকে দায়ী করেছেন। এই কাঠামোর মধ্যে কি ব্যক্তির প্রাধান্য অনিবার্য? ব্যক্তিতন্ত্রের উদ্ভব কি দৈবাৎ ঘটনা? "গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা" শুধু কি ছবি?

রুশ বিপ্লবের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ লেখক ই. এইচ. কারের মতামত উল্লেখ্য। বহু বছর জারতন্ত্রের অবিরাম দমননীতির মুখে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে উঠেছিল; গণতান্ত্রিক পরিবেশ দেশে আদৌ ছিল না। পার্টির মধ্যে প্রাধান্য পেল কঠোর নিয়মানুবর্তিতা এবং গুপ্ত কার্যকলাপ। কিন্তু বলশেভিক বিপ্লবের পরে পার্টির মধ্যে যে স্বাধীন আলোচনা এবং মুক্ত চিন্তা দেখা গেল, তা রাজনৈতিক দলে বিরল। বিরুদ্ধ মত প্রকাশের অবাধ অবাধ স্বাধীনতা নেতাদের ছিল; পার্টি পত্রিকায় বিরুদ্ধ মত প্রকাশিত হত। পার্টির সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হত; গোপন ভোটে নেতারা নির্বাচিত হতেন; প্রায় দু মাস অন্তর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসত। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির "হস্তক্ষেপের যুদ্ধ" এবং "ক্রনস্টাড মিউটিনি"র মুখে লেনিন স্বয়ং ভীত হয়ে "পার্টি সংকট" শিরোনামে পুস্তিকা লেখেন। দশম পার্টি কংগ্রেসে (১৯২২) তিনি স্বয়ং "পার্টির মধ্যে ঐক্য"-র প্রস্তাব রচনা করেন। প্রস্তাবে গুরুত্ব পেল নিয়মানুবর্তিতা, গোষ্ঠীর বাধ্যতামূলক অবসান, গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নামে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাধান্য; দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যকে বহিষ্কার করার নিয়ম হল। পার্টি কংগ্রেসের ক্ষমতা অনিবার্য ভাবে হ্রাস পেল। সম্পাদকমণ্ডলীর কর্মচারীদের সংখ্যা ১৯২১-এ দারুণ স্ফীত হয়ে দাঁড়াল ৬০২; সেই সঙ্গে পার্টি-সভ্যের সংখ্যা হল প্রায় ছয় লক্ষ। পুরনো সভ্যদের (এদের বেশির ভাগ বুদ্ধিজীবী) চব্বিশ শতাংশ বহিষ্কৃত হল। অধ্যাপক কারের মতে, পার্টি সংগঠনে স্তালিনের হাত ক্রমশ দৃশ্যমান হচ্ছিল। ১৯২২-এর গ্রীষ্মকালে সাধারণ সম্পাদকের নতুন পদ সৃষ্টি হল, এই পদে নিযুক্ত হলেন স্তালিন। দু মাস পরে লেনিনের প্রথম হৃদ্‌যন্ত্রের আক্রমণ হল। পার্টির দ্বাদশ কংগ্রেসে (১৯২৩) লেনিন উপস্থিত হতে পারেন নি; গুরুতর অসুস্থ লেনিনের শেষ ইচ্ছা (লেনিন "টেস্টামেনট") কংগ্রেসে পঠিত হল। সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে স্তালিনের অপসরণ এবং অধিকতর বিনয়ী, কমরেডদের প্রতি অধিকতর সহনশীল ব্যক্তিকে সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করার সুপারিশ লেনিন করেছিলেন, তা গ্রাহ্য হয় নি; স্তালিনই সাধারণ সম্পাদক রইলেন। দ্বাদশ কংগ্রেসে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে তাঁর অনুগামীরা সংখ্যায় ছিল বিপুল। তখন দেশে স্তালিনের নক্ষত্র উদীয়মান, পার্টির মধ্যে তাঁর প্রভাব ক্রমবর্ধমান। অবশেষে আমলাতন্ত্র ছাড়পত্র পেল; সম্পাদকীয় বিভাগ ছিল আমলাতন্ত্রের দুর্গ।

সত্যি, দশম পার্টি কংগ্রেস রুশ পার্টিতে দিক-পরিবর্তনের সূচনা করে। লেনিনের মৃত্যুর পরে শুরু হল পুরনো নেতাদের মধ্যে তীব্র বিরোধ, আর এই বিরোধের পর্বে লেনিনের রচিত ঐক্য-প্রস্তাব পার্টির মধ্যে বিরোধী মত এবং বিরোধী মতের প্রবক্তাদের ধ্বংস করতে ব্যবহৃত হল। ট্রটস্কি-জিনোভিয়েভ-কামেনেভ গোষ্ঠীর পতনের পরে এল বুখারিনের পালা; ১৯৩০ সাল থেকে তাঁর পতনের হল শুরু। জিনোভিয়েভ-কামেনেভের বিচার আর মৃত্যুদণ্ড হল ১৯৩৬-এ; পরের বছরই বুখারিন ও রায়কভ গ্রেফতার

হলেন।

তখনো সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাণশক্তি লুপ্ত হয় নি। ১৯২৯-৩৮ পর্বের ঘটনা সম্পর্কে একপেশে আলোচনা বর্তমান লেখকের কাছে অগ্রাহ্য। সেই পর্বের আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় রাশিয়ার শ্রমিক-কৃষক-বুদ্ধিজীবী ছিল পশ্চাৎপদ। তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা তেমন বিকশিত হয় নি। এই সামাজিক পটভূমিকায় সেদিন অসংখ্য পার্টি সদস্য এবং পুরনো নেতৃত্বের একটি অংশ যে সাহস এবং নিষ্ঠার প্রমাণ দিয়েছিলেন, তা অনন্য, অবিস্মরণীয়। কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। লেনিনের বোন উলিয়ানোভা প্রকাশ্যে বুখারিনকে সমর্থন করেছিলেন। গ্রামদেশে রক্তপাত বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়ে স্তালিনের দ্বিতীয় স্ত্রী পুরনো পার্টি কর্মী আল্লিলুয়েভা আত্মহত্যা করেন। মস্কো পার্টি সংগঠনের শ্রেষ্ঠ নেতা রিউতিন স্তালিন-নীতির বিরুদ্ধে অভিযান সংগঠিত করেন; স্তালিন তাঁর মৃত্যুদণ্ড দাবি করেন, কিন্তু পলিটব্যুরোর বৈঠকে তাঁর এই হিংস্র প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। রিউতিন পার্টি থেকে বহিষ্কৃত এবং মস্কো থেকে নির্বাসিত হন। কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় নমনীয় নীতির পক্ষে অবিচল ছিলেন কিরভ, ওর্দোনিকিদজে, কুইবিসেভ এবং কখনো-কখনো কৃষকের ঘরের ছেলে কালিনিন। ১৯৩৪-এর শেষে লেনিনগ্রাদে তাঁর নিজ দপ্তরের আঙিনায় লেনিনগ্রাদ পার্টির প্রধান নেতা কিরভ নিহত হলেন। কিরভ-হত্যার পরে পার্টিজীবনে এল দ্রুত পরিবর্তন। অসংখ্য পুরনো কর্মী বন্দী হন। ওর্দোনিকিদজে হয় নিহত হন, কিংবা আত্মহত্যা করেন। রুশ মহাফেজ-খানা উন্মুক্ত হলে এই পর্ব সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যাবে। যেটুকু জানা গিয়েছে তা হল ১৯৩৪-৩৮ পর্বে পুরনো নেতৃত্ব প্রায় অবলুপ্ত হয়; ১৯৩৪-এর কেন্দ্রীয় কমিটির ১৩৯ জন সভ্যের মধ্যে ১১০ জন হয় নিহত হন, কিংবা আত্মহত্যা করেন। একদল নতুন নেতা পুরোভাগে আসেন। যেমন কাগানভিচ, মালেনকভ, বেরিয়া, বুলগানিন, ক্রুশ্চভ। অনেকের হয়তো ফরাসি বিপ্লবের "থার্মিডোর" মনে পড়বে।

১৯৩৭-এ বুখারিন গ্রেপ্তার হলেন। তাঁর জীবনী-লেখক স্টিফেন কোহেন বলেছেন, বুখারিন বুঝেছিলেন তাঁর শেষ দিন আসন্ন; তাই তিনি তাঁর বিদুষী সুন্দরী স্ত্রী লারিনাকে শেষ চিঠি স্মৃতিতে গেঁথে রাখতে বলেন। এই চিঠির একটি অংশ এইরকম: "বন্ধু, যে লাল পতাকা ধরে তোমরা এগিয়ে চলেছ এবং যাবে, মনে রেখো তার মধ্যে আছে আমারও একফোঁটা রক্ত।" ক্রুশ্চভ-পর্বে ১৯৬১ সালে লারিনা এই চিঠি প্রকাশ করেন; প্রায় বিশ বছর তিনি এবং তাঁর ছেলে বন্দী জীবন যাপন করেছিলেন।

আদালতে বুখারিনের স্বীকারোক্তি সম্বন্ধে আইন-গত ব্যাখ্যা অর্থহীন মনে হয়। কোহেনের ব্যাখ্যা সত্যের অনেক কাছাকাছি। কোহেনের বক্তব্যের সারমর্ম দেওয়া হল। তেরো মাস বুখারিন বন্দীশালায় নিরন্তর জেরার মুখে ছিলেন। স্ত্রী (৪৫ বছর বয়সে বুখারিন দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন লারিনাকে) এবং পুত্রের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তিনি দারুণ উদ্বিগ্ন ছিলেন। তেরো মাস অনেক মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করে তিনি এক বিবৃতি তৈরি করেন। আদালতে তিনি সরাসরি কয়েকটি অভিযোগ অস্বীকার করেন। 'হোয়াইট গার্ড এবং জারমান ফাসিস্টদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে আমি লিপ্ত হই নি। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ আমি অস্বীকার করি। কোনো অবস্থাতেই আমি সার্দলভ, স্তালিন এবং লেনিনের হত্যার কথা ভাবি নি। কিরভ, কুইবিসেভ, গর্কি এবং পেসকভের হত্যার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ আমি সরাসরি অস্বীকার করি' (কোহেন, পৃ ৩৭৭-৭৮)। বুখারিন বুঝেছিলেন, স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও তাঁকে মরতে হবে। জিনোভিয়েভ এবং কামেনেভের ভাগ্যে যেমন ঘটেছিল। তাই তিনি "নেপ" পর্ব থেকে অনুসৃত তাঁর নীতির শেষ ব্যাখ্যা করেন। শ্রমিক-কৃষক ঐক্যের স্বার্থে ধনী কৃষককে

সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে: যৌথ খামার গঠনের গতি হবে মন্থর; খোলা বাজারে ক্ষুদ্র মালিকদের উদ্বৃত্ত বিক্রির অবাধ স্বাধীনতা থাকবে। ধনী কৃষককে নির্মূল করার নীতি মানবিকতার আদর্শের পরিপন্থী। তিনি অবশ্য বলেন এটা ভ্রান্ত নীতি, কেননা এর ফলে গ্রামে ধনতন্ত্র বিকশিত হবার সুযোগ পাবে। অর্থাৎ তাঁর প্রধান অপরাধ গ্রামদেশে ধনতন্ত্রের বিকাশে সাহায্য করা। ১৯২৪-২৯ পর্বে এই কৃষি-নীতি ভ্রান্ত ছিল কি না, তার বিচারের ভার রইল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর।

আর্থার কোয়েসলায়ের শক্তিশালী সুখপাঠ্য উপন্যাস "ডার্কনেস অ্যাট নুন" পড়ে সোভিয়েত বুদ্ধিজীবী সম্বন্ধে পাঠকের ঘৃণা হয়। কোহেনের অভিনব বিবরণ পড়লে সোভিয়েত সমাজ সম্বন্ধে হতাশায় আচ্ছন্ন হবার কারণ থাকে না। পঞ্চাশ বছর পরে বুখারিনের পুনর্বাসন সোভিয়েত দেশেই হয়েছে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির স্রষ্টি ক্রুশ্চভ এবং গোরবাচেভ।

তিন

১৯২৯ সালে তাঁর পতন যখন আসন্ন, বুখারিন তখন লেনিনের স্মৃতিসভায় সমাজতন্ত্র গঠনের এক বিকল্প নীতি প্রকাশ করেন। লেনিনের শেষ লেখা তাঁর বক্তব্যের ভিত্তি। লেনিনের লেখার প্রতিধ্বনি বার-বার তাঁর লেখায় এসেছে। শিল্পায়নের লক্ষ্য সামনে রেখে লেনিন কৃষক-সমর্থন সংগ্রহের জন্য উন্মুখ। দেশব্যাপী অশিক্ষা এবং পার্টির মধ্যে আমলাতন্ত্রের প্রসারে তিনি উদ্বিগ্ন। তিনি চেয়েছিলেন সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং সেই সঙ্গে কৃষি-সমবায়। তিনি বলেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা হল সুসভ্য সমবায় কর্মীদের সংগঠন। মনে হয় "নেপ"-পর্বে অনুসৃত নীতি হঠাৎ বর্জনের তিনি বিরোধী। জর্জিয়া প্রজাতন্ত্রে যেভাবে বিরোধী মত স্তব্ধ করা হয়েছিল, তিনি তাকে জাতিদম্ভ (গ্রেট রাশিয়ান শভিনিজম) বলে নিন্দা করেছেন। লেনিনের লেখায় আশাভঙ্গের সুর কানে বাজে ; সোভিয়েত দেশে যেন শুরু হয়েছে এক বিষণ্ণ যুগ (M. Lewin, *Lenin's Last Struggle*, 1976)।

সমাজতান্ত্রিক দেশে মূলধন সঞ্চয়ের পথ কী? লেনিনের মৃত্যুর পরে ১৯২৪ সালে প্রতিভাবান অর্থনীতিবিদ প্রিওব্রেঝেন্‌স্কি এই প্রসঙ্গে তাঁর প্রসিদ্ধ তত্ত্ব পেশ করেন। ধনতান্ত্রিক বিকাশের পর্বে মূলধন সঞ্চয় হয়েছিল উপনিবেশ লুণ্ঠন করে। সমাজতান্ত্রিক দেশে সেই পথ অগ্রাহ্য। মূলধন-সঞ্চয়ের প্রধান উপায় গ্রাম-দেশ থেকে উদ্‌বৃত্ত সংগ্রহ। রাশিয়া কৃষকের দেশ। সমাজতান্ত্রিক সমাজে কৃষকের অবস্থার উন্নতি হবে। কিন্তু শিল্পায়নের জন্য কৃষকের উদ্‌বৃত্ত সংগ্রহ অপরিহার্য। গ্রামদেশের উদ্‌বৃত্তের কিছু অংশ রাষ্ট্রের হাতে আনতে হবে। কৃষককে স্পর্শ না করে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র গঠনের চেষ্টা অবাস্তব ; শিল্পায়নের স্বার্থে ক্ষুদ্র উৎপাদকের আয়ের উপর হাত পড়বে। উন্নত দেশের মতো শিল্প থেকে উদ্‌বৃত্ত সংগ্রহের সম্ভাবনা রাশিয়ায় অনুপস্থিত।

তরুণ বন্ধু প্রিওব্রেঝেন্‌স্কির বক্তব্য বুখারিন স্বয়ং খণ্ডন করেন। কৃষকের সঙ্গে মৈত্রীর নীতি থেকে সরে আসা চলবে না; শ্রমিকের স্বার্থে কৃষকের উপর অধিকতর চাপ সৃষ্টির নীতি লেনিনের শিক্ষার বিরোধী। সেদিন পার্টিতে বুখারিন বীরের ভূমিকায় অবতীর্ণ; স্তালিন তাঁর সমর্থক। পুরনো "নেপ" মোটামুটি অপরিবর্তিত রইল। ইতিমধ্যে কুলাক (ধনী কৃষক) গ্রামে শক্তিশালী হচ্ছিল; অনেক সময় কুলাক কৃষি-শ্রমিক নিয়োগ করত। সমাজতান্ত্রিক দেশে কৃষি-শ্রমিকের শোষণ অনেকেরই পছন্দ ছিল না। বুখারিন কুলাকতোষণনীতিতে তখনো অবিচল। ১৯২৮ থেকে তথাকথিত "দক্ষিণ পন্থা"র বিরুদ্ধে স্তালিনের আক্রমণ-এর শুরু। দ্রুত শিল্পায়নের সঙ্গে-সঙ্গে কৃষির যৌথকরণ হল স্তালিনের নীতি। রাশিয়ায় শুরু হল "কমানড ইকনমি"র যুগ, যে যুগের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যমাত্রা পুরণের জন্য বলপ্রয়োগের উপর নির্ভর করা এবং শেষে কুলাক-শ্রেণীকেই নির্মূল করা।

এই পটভূমিকায় বুখারিন লেনিনের "পলিটিক্যাল টেস্টামেণ্ট" শিরোনামে তাঁর লেখা উপস্থিত করেন। এদেশে এই লেখা তেমন প্রচারিত হয় নি ; সম্প্রতি সোভিয়েত দেশে লেখাটি পুনর্‌মুদ্রিত হয়েছে। এই শেষ তাত্ত্বিক লেখায় বুখারিনের অর্থনৈতিক চিন্তা প্রকাশিত। "নেপ" পর্ব থেকে বুখারিন তাঁর কৃষি-নীতিতে অবিচল ছিলেন; এই নীতির মূল কথা শ্রমিক-কৃষক ঐক্য।

উপর থেকে চাপানো বিপ্লব এবং কৃষকের উপর বলপ্রয়োগের বিরোধী বুখারিন। সমাজতান্ত্রিক উত্তরণের জন্য কৃষকদের উপর করের বোঝা না চাপিয়ে শ্রমের উৎপাদিকা শক্তি বাড়াতে হবে। কৃষির উন্নতি রাষ্ট্রের আয়ের উৎস উন্মুক্ত করবে। উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীন সরকারি ব্যয় হ্রাস করতে হবে। এই পথেই মূলধন সঞ্চয় হবে ; শিল্পায়নের ভিত্তি সবল হবে। দুর্বল কৃষি-অর্থনীতি শিল্পায়নের ভিত্তিকেই ভঙ্গুর করতে পারে। উন্নত কৃষি শিল্পায়নের সহায়ক।

লেনিনের উক্তি উদ্ধৃত করে বুখারিন বলেছেন, সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে চিন্তাধারার পরিবর্তন হয়েছে। ইতিপূর্বে ক্ষমতা-দখল ছিল মূল লক্ষ্য; এখন শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক, সাংস্কৃতিক কাজ গুরুত্ব পাবে। শ্রেণী-সংগ্রামের এটাই নতুন রূপ। "তৃতীয় বিপ্লবে"র নামে যেন শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী ভেঙে ফেলা না হয়।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিগত যুগে অগ্রগতি সত্ত্বেও সোভিয়েত, ইউরোপ এবং আমেরিকার তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে আছে। শ্রমের উৎপাদিকা শক্তির মান দারুণ নীচু। সোভিয়েতকে ঘিরে রয়েছে ধনতান্ত্রিক জগতের অবরোধ। এই অবস্থায় ক্ষুদ্র জমির মালিক কৃষকদের উপর শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে যেন ফাটল না ধরে। সাবধানতা এবং সতর্কতা অনুসরণ সাফল্যের পূর্ব শর্ত।

শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হওয়া লেনিনের নির্দেশ। এই পথ ধরে চলবার সময় আর-একটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হল সমবায়। কৃষি-সমবায় হবে কৃষকদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান ; সমবায়ের মাধ্যমে তার চেতনার স্তর হবে উন্নীত। শিল্পায়ন এবং সমবায় হাত-ধরাধরি করে অগ্রসর হবে। কৃষি-সমবায়ের স্তর পার হয়ে কৃষক পৌঁছুবে যৌথ খামারের স্তরে। অবশ্য যৌথ খামার এবং রাষ্ট্রীয় খামার গঠনের প্রক্রিয়া বন্ধ হবে না; কিন্তু অধিকতর দৃষ্টি পড়বে সমবায় গঠনের উপর। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কাছে যেন 'প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র কৃষক যোগদান করতে পারে।' যে পথ কৃষক বোঝে, সেই পথ ধরে এগুতে হবে। সমবায় সেই পথ ; "সমবায়মূলক বাণিজ্য" সেই পথ। কৃষকের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের এই পথ।

মার্কস থেকে লেনিন পর্যন্ত সব সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রমিক-কৃষকমৈত্রীর অশেষ গুরুত্বের কথা বলেছেন। লেনিন স্বয়ং বলেছেন, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি এই দুই শ্রেণীর সহযোগিতা ; সোভিয়েত পার্টি দেখবে যাতে কখনো এই দুই শ্রেণীর ঐক্যে ফাটল না ধরে। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে শ্রমিকের পাশে কৃষকের অবস্থানের উপর। "নেপ"-পর্বের সৃষ্টিতে বুর্জোয়া যেন দুই শ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান তৈরি করতে না পারে।

তাঁর শেষ লেখায় রাশিয়ার শিক্ষা-সংস্কৃতির মান উন্নত করাকে লেনিন অসাধারণ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সাংস্কৃতিক বিপ্লব ছিল তাঁর স্বপ্ন। রাষ্ট্রের উচিত শিক্ষাখাতে ব্যয় বৃদ্ধি করা; অন্যান্য ব্যয় সঙ্কোচন করে এই কাজে অগ্রসর হতে হবে। এই মুহূর্তের এটাই বৈপ্লবিক কর্মসূচী। এই কর্মসূচী রূপায়নের পথে বাধা পুরনো অভ্যাস, সংস্কার, আমলাতান্ত্রিক কার্যকলাপ। লেনিন বলেছিলেন, গ্রাম্য জেলাগুলির সার্বিক উন্নতি খাতে সরকারি বরাদ্দ সীমিত। শহর ও গ্রামের উন্নতি যেন সমান গুরুত্ব পায়। শ্রমিক গ্রামে যাবেন কৃষকের মানসিকতা পরিবর্তিত করবার জন্য ; অবশ্য গ্রামদেশে সাম্যবাদ প্রোথিত করার

সময় এখনো আসে নি।

চার

বুখারিনের অর্থনৈতিক চিন্তা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তাঁর ভাবনা মনে হয় অবিচ্ছেদ্য। সমাজতান্ত্রিক বিবর্তন হবে রক্তপাতহীন, কৃষকের শোষণ আর নির্যাতন তার ভিত্তি হবে না। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে রক্ষা করার জন্য স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে হবে।

মার্কসবাদীদের মধ্যে একমাত্র গ্রামসি সেই বিশের দশকে ইতালির ফ্যাসিবাদের স্বরূপ বুঝেছিলেন; তাঁর সহকর্মীদের ধারণা ছিল বিপ্লবের ঝড়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ ফাসিস্টতন্ত্র চুরচুর করে ভেঙে পড়বে। হায়, সেই রঙিন আশা পূর্ণ হয় নি। ত্রিশের দশকে বিশ্ব মন্দার ধাক্কায় জার্মানিতে নাৎসি দলের উত্থান হল। কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেসের (১৯২৮) চরম সংকীর্ণতাবাদী নীতির কল্যাণে ১৯৩০-৩২ সালেও জারমানির অশেষ শক্তিশালী কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রী দল এক মঞ্চে মিলিত হতে পারে নি (১৯৩২-র নির্বাচনে জার্মান আইনসভায় নাৎসি দলের আসন সংখ্যা ২৩০ থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯০ হয়েছিল। যখন কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক দলের মিলিত আসন-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল)। ১৯৩৩-এ হিটলারের "শান্তিপূর্ণ" ক্ষমতা দখলের পরে কমিনটার্নে নতুন চিন্তাভাবনা দেখা গেল, যার প্রবক্তা গ্রামসির বন্ধু তোগলিয়াত্তি (তখন তাঁর ছদ্মনাম এর্কলি) এবং বুলগারিয়ার সাহসী সাম্যবাদী নেতা, হিটলারের কারাগার থেকে মুক্ত ডিমিট্রভ। এই পর্বে বুখারিন "জার্মান স্বৈরতন্ত্রে"র বিরুদ্ধে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। কমিনটার্নের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বুখারিনের প্রভাব বিলীয়মান হলেও বিলুপ্ত হয় নি। তাঁর বন্ধু তোগলিয়াত্তি। অবশেষে সপ্তম কংগ্রেসে (১৯৩৫) গৃহীত হল ফাসিস্টতন্ত্রের বিরুদ্ধে "যুক্ত মোরচা"র নীতি। স্পেনের গৃহযুদ্ধে (১৯৩৬) যোগ দেন তোগলিয়াত্তি। ওই বছর ইউরোপ সফর করে বুখারিন দেশে ফিরে হিটলারের আক্রমণমুখী মনোভাব সম্বন্ধে বন্ধুদের সাবধান করেন। তিনি বুঝেছিলেন, যুদ্ধ আসন্ন।

আকাশে যখন যুদ্ধের মেঘ জমছে (১৯৩৩-৩৮), তখন স্তালিন এবং তাঁর ভক্তদের রাজনৈতিক অবস্থান কী ছিল? বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনা এখনো অসম্পূর্ণ, তবু ই. এইচ. কার এবং এ. জে. পি. টেলরের গবেষণা থেকে অনেক তথ্য জানা যায়। ১৯৩৪-এ সোভিয়েত রাশিয়া জাতিসঙ্ঘের সভ্য হবার পর থেকে লেনিনের সহকর্মী লিতভিনভ রুশ প্রতিনিধি হিসাবে ইউরোপের গণতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ফাসিস্ট-বিরোধী মোরচা গঠনে ব্রতী ছিলেন; তাঁর "যৌথ নিরাপত্তার" নীতি সুবিদিত।

মলোটভের একটি উক্তি থেকে জানা যায়, স্তালিন রুশ-জারমান সম্পর্ক উন্নত করতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি দুটি ঘটনার উল্লেখ করতেন—রাপাল্লো চুক্তি (১৯২২) এবং মুসোলিনির ইতালির সঙ্গে রাশিয়ার বর্ধমান বন্ধুত্ব। "সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অনিবার্য"—লেনিনের এই বক্তব্যে তাঁর বিশ্বাস অটল। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিতে তিনি স্বভাবতই আগ্রহী। এই রাজনৈতিক অবস্থানের পরিণতি "যৌথ নিরাপত্তা"র অক্লান্ত প্রবক্তা লিতভিনভের অপসারণ, মলোটভ-রিবেনট্রপের গোপন আলোচনা এবং রুশ-জারমান অনাক্রমণ চুক্তি (অগস্ট, ১৯৩৯)।

ঠাণ্ডা যুদ্ধের ঐতিহাসিকগণ এই চুক্তির জন্য সোভিয়েত রাশিয়াকে দায়ী করেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক টেলর বলেন, এই চুক্তির জন্য অংশত দায়ী গণতান্ত্রিক দেশ ইংল্যানড আর ফ্রান্সের শাসকশ্রেণী। টেলর মন্তব্য করেছেন, মিউনিখ চুক্তির স্বাক্ষরকারীদের মুখে বড়ো কথা সাজে না। সোভিয়েত রাশিয়ার নীতির বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

স্পেনের গৃহযুদ্ধে "পপুলার ফ্রন্ট" সরকারকে নামমাত্র সাহায্য করেন স্তালিন, অপরদিকে ফ্রাঙ্কো বিপুল সামরিক সাহায্য পান হিটলার আর মুসোলিনির কাছ থেকে। "পপুলার ফ্রন্টের" পরাজয় ইউরোপে নাৎসি আন্দোলনের প্রসারে সাহায্য করেছিল। ১৯৩৭-এ গঠিত হল "রোম-বার্লিন-টোকিও অ্যাকসিস"।

কোহেন লিখেছেন, বুখারিনের শেষ জীবনের লেখায় কেন্দ্রবিন্দু ফাসিস্টতন্ত্র। ১৯৩৬-এ "ইজভেস্তিয়া"য় প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি লেখেন, ফ্যাসিবাদ "সর্বোচ্চ নেতা" ছাড়া অন্য সকলকে অমানুষে পরিণত করে; সমাজের বেশির-ভাগ মানুষ যেন নিয়মানুবর্তিতায় বাঁধা যন্ত্র। বিভিন্ন প্রবন্ধে এবং বক্তৃতায় তিনি "সমাজতান্ত্রিক মানবিকতা" (সোশ্যালিস্ট হিউম্যানিজম) প্রচার করেন। মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ সমাজতান্ত্রিক সমাজের লক্ষ্য। স্বৈরতন্ত্র মনুষ্যত্বকে পঙ্গু করে। মানবিকতাবাদ নতুন বিষয় নয়, কিন্তু হিটলারের "হিংস্র ক্ষুধার" পটভূমিকায় এর প্রচার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দু মাস ইউরোপ পরিক্রমা করে তাঁর ধারণা হয়, ফাসিস্ট জারমানির সঙ্গে সোভিয়েতের যুদ্ধ অনিবার্য। কোহেন ইঙ্গিত করেছেন, এই পটভূমিকায় বুখারিনের কুলাক-তোষণ-নীতি অর্থবহ। ইতিমধ্যে স্থানে-স্থানে কৃষক বিদ্রোহ ঘটেছিল, যার পিছনে কুলকের হাত ঠিক অদৃশ্য ছিল না। ১৯৩৫-৩৬ সালে স্তালিনও কুলাক-শ্রেণীকে নির্মূল করার নীতি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখেন। অবশ্য বুখারিনের কুলাক-তোষণ-নীতি হিটলারের কার্যকলাপের দ্বারা সত্যি প্রভাবিত হয়েছিল কিনা, তা সঠিক জানা যায় না। যেটুকু জানা গিয়েছে তা হল এই যে ফাসিস্ট-বিরোধী "যুক্ত মোরচা"-নীতির প্রধান প্রবক্তা ছিলেন ডিমিট্রভ, তোগলিয়াত্তি, বুখারিন, এবং রজনী পাম দত্ত। কমিনটার্নের সপ্তম কংগ্রেসে স্তালিনের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত গৌণ, এবং অনেক ম্লান।

পাঁচ

কোহেন একজন পুরনো বলশেভিককে চিত্রিত করেছেন। স্তালিনের কাছে কয়েকবার আত্মসমর্পণ করলেও (যার মধ্যে প্রতিফলিত বুখারিনের চরিত্রের দুর্বলতা), এই বলশেভিক শেষ পর্যন্ত তার মৌল নীতিতে অবিচল থেকেছেন, যে নীতির ভিত্তি "Smychka" (শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী)। দুর্লভ সাহসের সঙ্গে লেনিনের শেষ লেখা অবলম্বন করে তিনি এক বিকল্প নীতি ঘোষণা করেন। তাঁর নীতি রূপায়িত হয় নি; প্রিওব্রেঝেন্স্কির একদা পরিত্যক্ত নীতি প্রায় অক্ষরে-অক্ষরে অনুসরণ করে স্তালিন দেশকে দ্রুত শিল্পায়নের পথে পরিচালিত করেন। এক অনুন্নত দেশ শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হয়। কিন্তু সোভিয়েত কৃষির তখন কী অবস্থা?

অধুনা সোভিয়েতে বুখারিনের কৃষি-নীতি আলোচিত হচ্ছে, সেই সঙ্গে আর-একজনের লেখা পুরোভাগে আসছে। তিনি সায়ানভ, ভারত-বন্ধু থর্নার (Thorner) যাকে পরিচিত করেছেন বুদ্ধিজীবী মহলে। মনে হয় বুখারিন এবং সায়ানভের কৃষি-নীতি আগামী দিনে পাদপ্রদীপের সামনে আসবে। কৃষি-সমস্যা যে কত জটিল সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা তা নতুন করে উপলব্ধি করেছেন। কেন কৃষি গতিহীনতার যুগে এসেছে? কৃষির পুনর্গঠনের পথ কী? পেরেস্ত্রৈকার অন্যতম বিষয় এই চিন্তা।

ক্রুশ্চভের আমলে সোভিয়েত দেশে যখন বসন্ত এল, তখন বুখারিনের স্ত্রী লারিনা স্বাধীন নাগরিকের জীবন ফিরে পেয়েছিলেন। ইতিমধ্যে অনেক কমিউনিস্ট দেশ (বিশেষ করে হাঙ্গেরি, পোলাণ্ড, পূর্ব জার্মানি) সোভিয়েত মডেল অগ্রাহ্য করে সাধারণভাবে বুখারিনের কৃষি-নীতি সামনে রেখে পরিকল্পনার কাঠামো তৈরি করেছিল। বুখারিনের পুনর্বাসন আদৌ আকস্মিক ঘটনা নয়।

তথ্যনির্দেশ ঃ

1. Stephen F. Cohen, *Bukharin and the Bolshevik Revolution* ; A Political Biography, 1974.
2. E. H. Carr., *The Bolshevik Revolution*, 1917-23, Vol I 1986 ; *Socialism In One Country*, 1924-26, Vol. I, 1970.
3. A. J. P. Taylor, *The Origins of the Second World War*, 1962.
4. M. Lewin, *Lenin's Last Struggle*, 1976.
5. N. Bukharin, *The Political Testament of Lenin*, Pravda, 1929,

একটি বিশেষ ঘোষণা

প্রয়াত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় সম্পর্কে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ (ইউ. এন. ও.) আমেরিকাবাসী ড. সুধীর সেন একটি দীর্ঘ স্মৃতিচারণ করেছেন। এই মনোগ্রাহী স্মৃতিচারণে প্রতিফলিত হয়েছে বাঙালি জীবনচর্যার একটি বিশেষ অধ্যায়ের উজ্জ্বল সমাজ-চিত্র। ড. সুধীর সেনের এই বহু অজানা তথ্যে সমৃদ্ধ সুখপাঠ্য রচনা "চতুরঙ্গ" পত্রিকার আগামী জানুয়ারি ১৯৮৯ সংখ্যা থেকে ধারা-বাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।

বেড়ালের গপ্পো

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়

হরনাথের সঙ্গে আলাপ আরোয়াল-হত্যা-বিরোধী এক মিছিলে। ক্লান্ত বিকেলে ততোধিক ক্লান্ত পায়ে হাজার দেড়েক মানুষ দু-লাইনে চলছিল এঁকেবেঁকে যেহেতু কোনো রাস্তাই সোজা নয়। সেও ভিড়েছিল, কেননা অনেকদিন ধরেই প্রতিবাদের এক যান্ত্রিক বোধে মিছিলে আসা একটা কাজের মধ্যেই পড়ে। তাই এই 'কর্ম-প্রাকটিস' করতে আসা। মিছিলে ছিল অনেক মানুষ। ওঁদের মনে আরোয়াল আলোড়িত হচ্ছিল কিনা, কৃষকহত্যার বিরুদ্ধে ঘৃণা ওঁদের চোখে-মুখে উপচে উঠছিল কিনা, সেটা ওই পাথর-খোদাই মুখগুলো থেকে বুঝে ওঠা খুবই কঠিন। আর এই প্রতিবাদ মিছিলেই সাঙ্গ হবে কিনা 'কর্ম-প্রাকটিস', সেটাও একটা ঘোর সংশয়—এই মিছিলেরই মানুষ-গুলোর মনে। মিছিল যেমন থাকে—কিছু প্ল্যাকার্ড, ব্যানার আর লাল নিশান। নিশানগুলো বোধহয় বহুদিন বাদে অন্ধকার থেকে আলোয় এল। তাই কিছুটা মলিন, ফ্যাকাশেও বলা যায়। বেশ ভারী পায়ে এই মিছিলের চলায় কিছুটা-বা গতানুগতিকতায় ক্লান্ত চোখ ওপরে ওঠে।

ওপরে যেহেতু সীমাহীন শূন্য, তাই চোখের আগল খুলে দেখা। পড়ন্ত বিকেলের সূর্য সারাদিনের ধকলে দীপ্তিহীন। এবারে অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার কথা। যাওয়ার আগে কোনো খেয়ালবশেই হয়তো-বা কিংবা মলিন নিশানের কথা বিবেচনা করেই মুঠোমুঠো খুনখারাবি রঙ ছড়িয়ে পশ্চিম আকাশে যেন আর-এক আরোয়াল প্রান্তর সৃষ্টি করে তোলে। আর সেই খুনের রঙ কিছু-কিছু নিশানের ওপর ফেলে ওদের ইজ্জত ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় যেন মরিয়া হয়ে ওঠে তেজহীন, দীপ্তিহীন শেষ বিকেলের সূর্য।

বর্ষীয়ান সূর্যের মরণপণ লড়াই দেখতে-দেখতে অভ্যেসবশেই চোখ নেমে আসে যথানিয়মে নীচে। মানুষের ভিড়ে। কেউ-কেউ অক্লান্ত চেঁচায়, 'হত্যার জবাব চাই, জবাব দাও।' তেমন সাড়া না পেয়ে আবার যেমন চুপচাপ হাঁটা—আশপাশের দোকান-

ঘর দেখা—মিছিলে চেনামুখের খোঁজ—তেমনভাবেই চলে মিছিল। কে জবাব দেবে? যদি-বা তার খোঁজ মেলে কোনোমতে, তার যে কোন্ দায় পড়েছে শহরের এই মাঝারি-মাপের দেড় হাজার মিছিল-মানুষের কাছে জবাব দেওয়ার।…যদি ধরে নেওয়া যায়, জবাব প্রস্তুত এবং সেটা 'মেরেছি বেশ করেছি, দরকারে আবার মারব' গোছের কিছু একটা হয়, (বস্তুত প্রায়শই এমন জবাবই মেলে), তাহলেই-বা এই মিছিলকারীরা কী চাইবে বা চাইতে পারে? কিংবা কর্ম-প্রাকটিসের ভাষায় বলা যায়, জনগণের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্য, জনগণের সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য কীই-বা তারা করবে—তার কোনো সুস্পষ্ট জবাব এদের কাছে, এই দেড় হাজার মাঝারি মাপের শহরের মানুষের কাছেই আছে কিনা, তা নিয়েও ঘোর সংশয়।

এভাবেই হাঁটার অনভ্যাসে হাঁটতে-হাঁটতে আর মাথায়-বিঁধে-থাকা কিছু ভাবনা নাড়াচাড়া করতে-করতে আনমনেই হয়তো বা কিংবা চোখের কাজ দেখা বলেই চোখ পড়ে সামনের এক মাথায় থোকা-থোকা কালো ডুমুরফলে। বিভ্রম কাটলে বোঝা যায়, দেখতে ডুমুর হলেও ওগুলো কারও মাথার চুল। বেশ একটা চনমনে ভাব, একটা যেন নতুন কিছু এসে পড়ে মিছিলের চলায়। দু-চার পা একটু পা চালিয়ে সামনের ওই ডুমুরগাছকে ধরে ফেলে সে।

—শুনুন, ভারি অদ্ভুত তো আপনার মাথার চুল! পেছন ফিরে দেখে নেয় একবার। আবার সামনে ফিরে নিস্পৃহ উত্তর দেয় ডুমুরগাছ:

—কত অসংখ্যবার যে আমাকে এই একই কথা শুনতে হয়েছে, আরো কতবার যে শুনব……

একঝলকের দেখা চোখ। চোখ কি সত্যিই বাঙ্ময় হয়। চোখে কি সত্যিই যন্ত্রণার রেখা লাল-ছিটে দাগ-গুলোতে ফুটে ওঠে। অনেক দেখা-শোনা, অনেক শোক-ক্রোধ-ঘৃণা-ভালোবাসা একই সঙ্গে চোখের ওই জৈবিক সাদায়-কালোয় কি জন্মে থাকে? থাকতে পারে? বিভ্রমই হয়তো-বা, কিন্তু ওই চোখে কিছু যেন থাকে; অনেক কথা যেন-বা শব্দহীন জমে থাকে ওই চোখে। থাকে নিশ্চয়ই, যা আর-দশটা মাঝারি-মানুষের মরা-মাছের চোখে থাকে না। মিছিলটা যেন ধীরে-ধীরে একটা অর্থ খুঁজে পায়। যেন-বা ওই ডুমুরগাছই তাকে এই অর্থ খুঁজে পেতে সাহায্য করে। সবটাই শূন্য নয়, মরে যাওয়া নয়, ক্লীব-জড়ের প্রতিবাদ নয়। তাই ডুমুরগাছের ওই চোখের মায়ায় জড়িয়ে যায় সে। বলে:

—মিছিলের পর চা খেতে-খেতে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে আছে।

চলতে-চলতেই উত্তর আসে:

—আমি হরনাথ। চা খাওয়াবেন…সে তো বেশ কথা…আলাপ…আচ্ছা, সে-ও হবে।

একটা সময় আসে যখন বস্তুত মিছিলটা শেষ না করে আর উপায় থাকে না। হারা-উদ্দেশ্যে কতদূরই বা আর চলবে মিছিল। তাই ছোট্ট একটা পরিসর খুঁজে নিয়ে শুরু হয় প্রতিবাদ-ভাষণ। অনেক বক্তা, কেননা অনেক গোষ্ঠীর এই মিছিল। সবারই প্রাধান্য চাই, প্রত্যেকেই চায় সাচ্চা কথা বলতে…জনগণের কাছে নিজেকে বা নিজেদের সাচ্চা প্রমাণ করতে। ফলে নিরেট বস্তুর মতো মনে হয় যে জনগণকে আপাতত, তার মধ্যে অন্তত উপহাসের ক্ষীণরেখা ঠোঁটের কোনায় ফুটিয়ে তুলতে চাইলেও, কথা খরচ করতে, কালঘাম ঝরাতে হয় বিস্তর। আর এভাবেই বক্তারা বাগ্মিতার তোড়ে ভেসে যান প্রায়শই; নিজেকেই শ্রোতার আসনে রেখে কথার জাল বুনে-বুনে, কথার মোহিনী শক্তিতে নিজেই বিমুগ্ধচিত্ত হয়ে, অনেকটা ভাবে পড়ার মতো ভাষণ শেষ করে কপালের ঘাম মুছে, কোনো এক গুণমুগ্ধকে জিগ্যেস করে বসেন,—'কী, কেমন হল!'

যেহেতু দেড় হাজার মিছিলকারী (এর মধ্যেই যা অনেক কমে এসেছে) এবং হুজুগে বা নিছক কৌতূহলবশে দাঁড়িয়ে-পড়া কিছু মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত এই ভাষণ এবং যেহেতু প্রগতির পক্ষে এবং প্রতিক্রিয়ার বিপক্ষে এমন চমৎকার সব শব্দরাজি সঞ্চিত আছে, সেহেতু এই সুভাষিতাবলি দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য এবং সেক্ষেত্রে তার ক্লান্ত পা দুটো এবং ভারী মাথাটা দু-দণ্ড কোথাও একটু জিরিয়ে নিতে চায়। আর কাম্য হয়ে ওঠে হরনাথের সান্নিধ্য।

তাই আর কালবিলম্ব না করে, সে হরনাথকে বলে, 'চলুন, কেটে পড়ি।' হরনাথ ওর পিছু নেয়। ফুটপাথের এক নিরিবিলি চা-দোকানে গিয়ে বসে। দু-কাপ চা নেয়। নীরবে চা খেতে থাকলে কেবল চুমুকের শব্দ ওঠে—সড়াত!

—একটা বেড়াল অনেকদিন থেকেই মাথায় ঢুকে আছে। যেন মৌরসিপাট্টা গেড়েছে…কী করে যে মাথা থেকে বেড়ালটাকে তাড়াই…

যেন দুজনের ভেতর এই নিঃশব্দতাকে ভেঙে দিতে হয় বলেই হরনাথের মুখ থেকে আলটপকা কথাগুলো খসে পড়ে। এমন একটি পারম্পর্যহীন উক্তির প্রতিক্রিয়ায় বক্তার মস্তিষ্কের স্বাভাবিকত্ব নিয়ে সন্দিহান হয়ে ওঠা যায় কিংবা এই উক্তির উৎস সন্ধানে কৌতুক-আগ্রহ জেগে উঠতে পারে। সে এই দ্বিতীয় বোধে তাড়িত হয়। হরনাথের মস্তিষ্ককোষে কী ঘটে, বেড়াল কীভাবে সেখানে বাসা বাঁধে আর কেনই-বা, সে বিষয়ে ওয়াকিবহাল হতে সে যেন সরাসরি হরনাথের মাথার ভেতর ঢুকে পড়তে চায়।

হরনাথ বলে, 'হাতে সময় আছে তো!' সে সায় দিলে, হরনাথ যখন প্রলম্বিত সময় ধরে তার মাথার বেড়ালকে ধীরে-ধীরে বাইরে আনে, তখন তার মুখে আর কথা যোগায় না। সেই শান্ত-গম্ভীর-মন্দ্র স্বর, সেই প্রকাশ, যা কেবল মর্মেই বেঁধে।—তাকে নিয়ে যায় হরনাথের সেই জগতে, যেখানে বেড়াল নিছক কোনো প্রাণী বা উপাদান নয়; সেখানে মানুষের বেঁচে থাকার চেষ্টায় বেড়াল হয়ে ওঠে এক আবশ্যিক হাতিয়ার—নচেৎ বাঁচাটাই নিরর্থ হয়ে যায় হরনাথের কাছে। আর এই তন্ময় শোনার পর তার নিজেরও কাছে।

ভারতবর্ষের পঁচাত্তর-আশি কোটি মানুষের মধ্যে কারা গরিব তা বোঝার জন্য একটা মাপকাঠি এই সরকারই চালু করেছে। তাতে বলা আছে যাদের মাসে বিশ টাকার নীচে আয় তারা গরিব। একুশ কিংবা তার দু-এক টাকা বেশি মাসিক আয় হলে, তাদের ঠিক কোন্ গোত্রে ফেলা হবে, তার অবশ্য কোনো উল্লেখ নেই। তবে বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি প্রয়োগে বলা যায়—যেহেতু বিশের নীচে গরিব, সুতরাং একুশ হলেই ধনী। হরনাথ-পিতাকে এই মাপকাঠির ওপরে বা নীচে কোথায় রাখা যায়, সেটা ঠিক করা খুবই দুরূহ। সরকারি মতে, কোনো-কোনো মাসে হরনাথ-পিতাকে ধনী কাগজে-কলমে বলা যেতেই পারে। কিন্তু নিপাট সত্যি হল হরনাথ-পিতা গরিব, খুবই গরিব। আর গরিবদের যা হয়ে থাকে। "লাল ত্রিকোণে"র সঙ্গে কোনো পরিচয় সে আমলে ছিল কিনা বলা মুশকিল। (হরনাথ এখন ত্রিশোর্ধ্ব যুবক এবং চতুর্থ সন্তান।) তবে কৃষিব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে জনবলের নিবিড় যোগাযোগ হরনাথ-পিতার মগজে হাজার-হাজার বছর ধরেই জমে থাকায়, কিংবা এও বলা যায় মনুর বিধান-এর গ্রাম্যরূপের ('ছেলে বিয়োনোর জন্যই তো বউ') বাস্তব প্রয়োগের খাতিরে তার সন্তান উৎপাদনে কখনই ছেদ পড়ে না যতক্ষণ না তার "বছর-বিয়োনি" বউ অধিক উৎপাদনের চাপে একেবারেই অকেজো না হয়ে পড়ে।

এই প্রক্রিয়ায় হরনাথের চতুর্থ স্থান। প্রথম এবং দ্বিতীয়—উভয়ই জন্মলাভ করে বটে, কিন্তু তারপর প্রথমের হয়তো এ পৃথিবীর আলোবাতাস তেমন সহ্য না হওয়াতে আঁতুড়েই বিদেয় নেয়। দ্বিতীয় যদি-বা সে ধকল সামলে ওঠে কিন্তু পালকের ভূমিকায়

হরনাথ-পিতার কোনোরকম আস্থা না থাকায় সে দুধ, অভাবে পিটুলিগোলা জোটাতেও সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে পারে। ফলে দ্বিতীয়ের কলকবজা বিগড়োতে থাকে এবং যথাসময়ে তা স্তব্ধও হয়ে যায়। তৃতীয় এবং চতুর্থ হরনাথ কিভাবে যে টিকে যেতে পারে পাঁচ বছর বয়স অবদি, তার কোনো সঙ্গত কারণ না থাকায়, বলা যায় এ এক ইন্দ্রজাল। এরপর আরো বেশ কিছু ভাইবোন, সংখ্যাতত্ত্বে তা গুটি দশেক হবে, আসে আর যায়। "যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন" মেনে নিয়ে শেষমেশ থেকে যায় হরনাথ সহ জনা ছয়েক।

পাঁচ বছর বয়স গরিবের মগজ পেকে ওঠার পক্ষে যথেষ্ট। হরনাথ ওই বয়সেই বুঝে যায় খাবার চাই, নইলে মরণ। খাবার পেতে চাই পয়সা। বেঁচে থাকাটা ওই অর্থহীন গোল-গোল চাকতির ওপর পরম নির্ভর। সুতরাং হরনাথ ছাইয়ের গাদায় পোড়া-কয়লা টোকায়; এক জায়গায় জড়ো করে ঝুপসি চা-দোকানে দিয়ে কিছু পয়সা পায়। কখনও কাগজ কুড়োয়। কখনও-বা চা-দোকানে পায়ের ওপর পা তুলে বসে সিগারেট-ফোঁকা বাবুর বাড়ির ছেলেদের ফাইফরমাস খাটে। জুটে যায় দু-চার পয়সা। যে সময় জুড়ে ধনী এবং মাঝারি পরিবারের ছেলেমেয়েরা কেবল অবিমিশ্র আদর এবং ভিটামিন খেয়ে-খেয়ে গাবদাগোবদা বা প্যাংলা হতে থাকে, সেই একই সময়ে হরনাথ বেশ স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু পেটে হরনাথের কিছুটা জায়গা ফাঁকাই থেকে যায়। পেট অমন অংশত ফাঁকা থাকায় পেটের ভেতর সব-সময় একটা জ্বলুনিও সে টের পায়। মাথাটা আরো একটু পেকে উঠলে হরনাথ বুঝতে পারে ওটা খিদের জ্বলুনি।

অগত্যা ছয়ে পা দিয়েই হরনাথ বাবু-বাড়ি কাজ নেয়। বাবু জিগ্যেস করেন, 'কী রে, পারবি তো… আর বল্ কত টাকা নিবি?' চটপট জবাব দেয় হরনাথ, 'যে কাজ বলবেন, করব—খাব-দাব আর আমার বয়স ছয়, তাই মাইনে ছ টাকা।' বাবুর হয়তো একটু অবাক-ভাব আসে। কিন্তু শ্রমদানের সঙ্গে মজুরি এবং বয়সের সম্পর্কস্থাপনের এই নীতি হরনাথের নিজস্ব উদ্‌ভাবন। এর ন্যায্যতা নিয়ে হরনাথ-মনে কোনো সংশয় না থাকায় বারো বছর বয়স পর্যন্ত হরনাথ "বয়স, মাইনে সমান সমান"—এই স্লোগানেই রোজগার করে।

ঝোপড়িবাসীরা যেভাবে চালায় তাদের জীবন, যেভাবে বাড়ন্ত হয়ে ওঠে তাদের ছেলেমেয়ে—হরনাথও সে পথেই পা ফেলে। তবে মগজ কিছুটা সাফ থাকায় হরনাথের যখন গোঁফের রেখা ওঠে তখনই হরনাথ সাদা হাফপ্যানট এবং স্যানডো গেঞ্জিকে বেছে নেয় দশজনের সামনে বুকের পাটা প্রদর্শনের জন্য। প্যানটের বেলটের দুপাশে গোঁজা থাকে দুটো ছুরি।

এই নিয়ম মেনেই হরনাথের প্রেমে পড়ার কথা কোনো এক কয়লা-টোকানি মেয়ের সঙ্গে। কিন্তু যেহেতু হরনাথ বম্বে-হিরোর সিনেমা দেখে, উপায় করে সিনেমার টিকিট ব্ল্যাক করে এবং নিজেকেও একজন আসলি হিরো মনে করে থাকে, অতএব হরনাথের কয়লাটোকানি মেয়েতে মন ওঠে না। তার নজর কাড়ে বাবু-বাড়ির এক চাবুক-সুন্দরী।

সুন্দরী যেকালে স্কুলে যায় এবং ফেরে, সেকালে হরনাথের ঠেকে কিংবা সুন্দরী-অপেক্ষায় সিগরেট ফুঁকে কলজে-বেদম-করা বাবুবাড়ির ছেলেদের চা-দোকানের আড্ডায় খুব একটা হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। সুন্দরীর পেছন-পেছন এই পঙ্গপালের ভিড় এবং নানা উৎকট ধ্বনিতে ভাদ্রের সারমেয়কুলের সচিৎকার শোভাযাত্রা মনে পড়েই যেতে পারে। স্বভাব-অহঙ্কারী সুন্দরী গ্রীবা উঁচু করে জিরাফের মতোই চলে যায়—যেন এ-পঙ্গপালের ভিড় তার নজরেই পড়ে না। নিত্যরোজ এই একই বুকভাঙা অভিনয়। হরনাথ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা এবং নারী"—এ প্রবচনের সঙ্গে হরনাথের সম্যক কোনো পরিচিতি থাকার কথা নয়। কিন্তু তার সহজ বুদ্ধিতেই হরনাথ টের পেয়ে যায় কিনা, অথবা বম্বে-হিরোর কর্মকৌশল কতটা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে তা ঠিক-ঠিক আঁচ করা না গেলেও একদিন সুযোগ আসে।

বাবুবাড়ির কোন এক ক্লীব-সাহসী ছেলে সুন্দরীর ওড়না ধরে টান দেয়। বীর-হরনাথ একলাফে সেখানে। ঝলসে ওঠে তার হাতে ছুরি। ছুরির ফলায় প্রতিফলিত সূর্যালোকে চোখে ধাঁধা লেগেই হোক কিংবা প্রাণভয়েই হোক সে ছেলে এক পলকে সেখান থেকে চোঁ-চা দৌড়। মজামারার দলও গতিক সুবিধের নয় দেখে কেটে পড়ে। পড়ে থাকে ওই নির্জনে সুন্দরী এবং ছুরি-হাতে হরনাথ। হিরোর ফাঁদে পা পড়ে যায় যেহেতু, তাই সুন্দরী হরনাথের হাতের ছুরিতে এক ঝলক অনুরাগের দৃষ্টি ফেলে যায়। সুন্দরী এভাবে হরনাথের তাঁবে এসে যাওয়াতে অন্যান্য কিছু বীরের সঙ্গত কারণেই প্রদাহের সৃষ্টি হতে থাকে। এ প্রদাহ-উপশমে হরনাথকে নামতেই হয় বীরত্বের প্রতিযোগিতায়। সে সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পারে একটিই কারণে—তার হাতের ছুরি অন্যান্যদের থেকে দ্রুত চলে এবং অব্যর্থ ঘায়েল করে। কার্যকর এই ছুরি এবং হাতের জোরে প্রকৃত বীরের সম্মান নিয়ে হরনাথ সুন্দরীর সঙ্গে প্রেম (পরিভাষায় "লাইন") করে। কিন্তু অচিরেই সুন্দরী টের পেয়ে যায় বীরত্ব ফলানোতে হরনাথের মুরোদ যত, রোজগারে তার কিছুমাত্র নয়। সুন্দরীর যেহেতু ভবিষ্যৎ-ভাবনা প্রখর, সেহেতু সুন্দরী বোঝে হরনাথ-মায়া তাকে ছাড়তে হবে। আর বাবুবাড়ির মেয়ে হয়ে জন্মানোর সুবাদে কলকাঠি-নাড়া বুদ্ধি সে জন্মসূত্রেই পেয়ে যায়। তাই হরনাথ কিছু বুঝে ওঠার আগেই অজানা অদেখা ছুরি তাকে বিদ্ধ করে। সিনেমাহলে টিকিট ব্ল্যাক করার সময়ে এস আই গমুবাবু তাকে ধরে। তিনদিন খামোকা পুলিশ হেফাজতে বা পিসিতে রেখে সকাল-বিকেল দুবেলা নিয়মিত থার্ড ডিগ্রি বা তৃতীয় মাত্রা চালায়।

পরিণামে হরনাথ যখন বাইরে আসে তখন তাকে ঠিক-ঠিক চিনে নিতে হলে ভালোমতো ঠাহর করতে হয়। কেননা এ-কদিনে হরনাথের শরীর ফুলে প্রায় তিনগুণ। চোখ দুটো ডেলা পাকিয়ে এত বড়ো হয়ে উঠেছে যে মনে হয় এক্ষুনি বুঝি-বা কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে। সুন্দরী-পিতা পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে এই দিন তিনেকের মধ্যেই কোথায় যে পাচার করে, হরনাথের সর্বগ্রাসী অনুসন্ধানেও তার খোঁজ মেলে না; এবং হরনাথ-জীবন থেকে সুন্দরীর চিরতরে অদৃশ্য হওয়ার ঘটনাটি এরকম নেহাতই সাদামাটাভাবে ঘটে যেতে পারে।

'তৃতীয় মাত্রা' প্রয়োগের ফলে হরনাথের বুকের পাটা যে কিছুটা সংকুচিত হয়, হরনাথকে যারা দেখে তারাই সেটা নিখুঁত অনুমান করে নিতে পারে; এবং সে তার বেলটে গোঁজা ছুরি দুটো ত্যাগ করে। রোজ হিসেবে একটা রিকশা নিয়ে নতুন রোজগারের উপায় উদ্‌ভাবন করে। তার এই নবীন চিন্তার পেছনে কার্যকারণসম্পর্ক খুঁজে পাওয়া মুশকিল হলেও সে সম্ভবত 'রিকশাওয়ালা' এই নাম-ডাকের মোহে আকৃষ্ট হয়।

হরনাথের রিকশা-চালনা শুরুর সময়টাতেই আরো কিছু অদ্ভুত সব ব্যাপার শুরু হয়ে যায়, যা অবশ্য হরনাথের জানবার কথা নয়। কিন্তু হরনাথ জানতে পারে। সাতের দশকের তিন-চার বছর আগের ওই সময়টা জুড়ে শহর-শহরতলি এবং আশেপাশের অঞ্চলে এমন একটা অন্য ধরনের নাড়া পড়ে যায়, যেটা সাফ-ঘিলু হরনাথেরও নজর এড়ায় না। বাবুবাড়ির বেশ কিছু ছেলেমেয়ে কেন-যে তার সঙ্গে, মহল্লার কিছু রিকশাওয়ালা আর চা-দোকানের ছেলেছোকরাদের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ জোড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, অনেক মাথা ঘামিয়েও হরনাথ তার থই খুঁজে পায় না। আর যেটা হরনাথের খুবই বিষম লাগে তা হল বাবুবাড়ির ছেলেমেয়েগুলো ওদের আর তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে না, কথা বলে যেন সমানে-সমানে। বরং এক-এক সময়ে হরনাথের তো মনেই হয় ওদের

কথাবার্তায় যেন ভক্তির সুর মিশে থাকে।

যেহেতু তার সাফ-ঘিলু তাই ওদের ঝোঁকটা যেন হরনাথের ওপরই বেশি। নিজেকে বেশ ভারিক্কি মনে হওয়াতে হরনাথ দার্শনিক চিন্তার আলসেমিকে প্রশ্রয় দিতে পারে। ওদের কথাগুলো নিক্তিতে মাপার চেষ্টায় রাতের ঘুম নষ্ট করে জেগে থাকে। 'হ্যাঁ—মানুষে-মানুষে সমান ইজ্জত, সমান হক নিয়ে বাঁচবে—এ তো খাঁটি কথা। কিন্তু মানুষের এই হকটাই যে কিছু লোক তাদের সিন্দুকে পুরে রেখেছে জোর করে, তার কী! ওদের থেকে যদি সিন্দুক না কাড়া যায়, হক আদায় না করা যায়, তবে তো সমানে-সমানে বাঁচা চলে না।' এ-ব্যাপারটা তো হরনাথ সাদাসাপটাই দেখতে পাচ্ছে। যেহেতু সুন্দরী তাকে সমান মনে করে নি, তাই তার ন্যায্য হক কেড়ে নিতে গন্নুবাবু দারোগা "তৃতীয় মাত্রা" চালায় আর জোর করেই তাকে নীচে ফেলে রাখে। 'সঠিক-ভাবে বলতে গেলে ঘটনাটা হচ্ছে এই'—হরনাথ নতুন শেখা বুলি আওড়ায়।

যেহেতু হরনাথের দেখা-জগৎটা তেমন কিছু একটা নয়, তাই হরনাথ সুন্দরী-পরিবার এবং গন্নুবাবু দারোগাকে তার হক-কাড়া দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে। তার চেতনার এই একধাপ বিকাশের ফলেই হরনাথ আর-একবার নতুন করে জীবনের নাড়া বাঁধে। বাবুবাড়ির ছেলেমেয়েদের ঘাড় হেলিয়ে জানায়, সে রাজি। ওদের উল্লাস এবং নাচানাচিতে হরনাথের মনে পড়ে যায়—সে যখন গাজনের সঙ সেজে দলবল নিয়ে ঘুরত, তখনও এমন হুল্লোড় পড়ে যেত: ওকে বাবা ভোলানাথ জ্ঞানে অনেক ডাগর-ডাগর মেয়েরা এসেও ভক্তিভরে প্রণাম করে যেত। সেই দারুণ মজার সময় থেকে এ সময়টার তফাত কেবল এই যে, হরনাথ-এর এক নতুন খেতাব জুটে যায়—হরনাথ বিপ্লবী, শ্রমিকশ্রেণী থেকে উঠে আসা খাঁটি বিপ্লবী।

এই ঘোরে পড়ে হরনাথ কয়েকদিনেই নিজেকে প্রায় আমূল পালটে নিতে পারে। গরিবের নিষ্ঠা নিয়েই কাজে মন দেয়, আর যেহেতু তার দম অনেক বেশি তাই তার কাজের বহর দেখে বাবুবাড়ির ছেলে-মেয়েদের চোখ কপালে উঠতে দেরি লাগে না। এক জায়গাতেই হরনাথ কেমন যেন হাবাগোবা মেরে যায়। ওই যখন ওরা সব মোটা-মোটা বইগুলো থেকে কীসব যেন পড়ে আর তুমুল কিচিমিচি জুড়ে দেয়। বাঙলাতেই যদিও, কিন্তু হরনাথ তার বিন্দু-বিসর্গও ধরতে পারে না। কেবল তার সহজাত বুদ্ধিতেই হরনাথ বুঝতে পারে, ওরা একে অন্যের ওপর খুবই রেগে ওঠে, পারলে টুঁটি ছিঁড়ে ফেলে—এমন দশা ওদের। এই সমস্ত ব্যাপারটাই হরনাথের কাছে এক জমাট রহস্য হয়ে থাকে এবং চিন্তাপ্রয়োগ করে সে স্থির করে, ওই বইগুলোই যত নষ্টের মূল। সুতরাং বেপরোয়া হরনাথ একদিন বইগুলোকে জড়ো করে আগুন লাগায়। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ায় বাবুবাড়ির ছেলেমেয়েরা দু দলে ভাগ হয়ে যায়। একদল তার এই নির্বুদ্ধিতার জন্য তাকে বকে। হরনাথের সাফ উত্তর: তোমাদের বাপু এমনিতে সব ভালো, কিন্তু ওই বইগুলো পড়লেই তোমাদের যেন মাথাখারাপ হয়ে যায়; কাজ কী ঝামেলায়, তাই একদম গোড়া মেরে দিয়েছি। হরনাথের এমন জবাবে আর-একদল উল্লাসে ফেটে পড়ে। 'দেখো, একেই বলে স্বভাববিপ্লবী; মাও-এর উক্তি ওর পড়ারও দরকার হয় নি···কোনো চিন্তা নেই হরনাথ, তুমি ঠিক কাজই করছে···চালিয়ে যাও, তুমিই আমাদের নেতা।'

এমনি এক জটিল ডামাডোলের মধ্যে দিয়ে নেতৃত্বের স্তরে উন্নীত হয়ে যেতে থাকে হরনাথ। আর ঠিক তখনই এমন সব কথাবার্তা-কাজকর্ম শুরু হয়ে যায় হরনাথের দলে, তার ফলে হরনাথ যে খেই হারিয়ে ফেলে সবকিছুর, সেটাও একটা স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই ধরা যেতে পারে। হরনাথ তাল পায় না—শ্রেণীশত্রু কাকে বলে, যেহেতু 'শ্রেণীশত্রুর রক্তে হাত রঞ্জিত না করলে' কমিউনিস্ট থাকা যায় না। দলের লোকেরা যেভাবে শ্রেণীশত্রু বাছে তাতে

হরনাথের মন মোটেই সায় দিতে পারে না। 'মাক্‌কু পার্টির' লোক হলেই যে তাকে "শ্রেণীশত্রু" হতে হবে —এই সহজ সরল সিদ্ধান্তটা কিছুতেই মগজে নিতে পারে না হরনাথ। যদিও সে খুব ভালোই দেখে, মাক্‌কু পার্টিও শ্রেণীশত্রু নাম না করে তাদের কচু-কাটা করতে একটুও পিছ-পা নয়। মাঝেমাঝেই তার মনে হতে থাকে, লড়াইটা যেন নিজেদের ভেতরই চারিয়ে যায় আর শত্রুর দল দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখে। এসব কঠিন ধাঁধার কোনো সমাধান না পেয়ে হরনাথ ঝটিতি মত পালটায়—বই পুড়িয়ে ঠিক কাজ করি নি। সুতরাং হরনাথ কী আছে ছাপার অক্ষরে জানতে চাওয়ায় ব্যগ্রতায় হাতে-পায়ে ধরে ফেলে এক দিগ্‌গজ দাদার। দাদা মোটের ওপর নিমরাজি হওয়াতে হরনাথের চাপা আগ্রহ শ্লেটের ওপর ফুটে উঠতে থাকে অ-আ আঁকড়-টানায়।

এ সময়ে আকস্মিকই ছেদ পড়ে হরনাথের সাময়িক আঁকড়-টানা বর্ণপরিচয়ে। কথা ছিল এক বাবুবাড়ি মিটিঙ হবে (যে বাবু আবার না কি পুলিসের এক বড়কর্তা), যেহেতু বাবুর ছেলে গোপনে তাদের দলে ভিড়েছে। যথারীতি হরনাথ নেতাসুলভ গাম্ভীর্য (যেটা তাকে রপ্ত করতে হয়েছে বেশ মাথা খাটিয়েই) নিয়ে মিটিঙে বসে পড়ে। কিন্তু যথারীতি মিটিঙ-চলার কাজটা হঠাৎই যেন সার্বিক বিমূঢ়তায় স্তব্ধ হয়ে যায়। হরনাথের ভ্যাবলা-মেরে-যাওয়া চোখেও যা বেশ মজাদার মনে হয় তা হল—পুলিশ আসে। পুলিশকে পথ দেখিয়ে মিটিঙের মানুষজনের পরিচয় দিতে থাকে তাদেরই দলের বাবুবাড়ির আর-এক ছেলে। এর পরের ঘটনায় আর নাটকীয় উপাদান তেমন কিছু থাকে না। সদলবলে গ্রেপতার হয়ে ভ্যানে ওঠে ওরা। ভ্যানের ভেতর হরনাথের পাশে বসে থাকা এস-আই তার মাথায় আদরের হাত বুলোতে-বুলোতে কখন যে কালো ডুমুরগুচ্ছ-গুলোকে উপড়ে সাফ করে দিতে পারে সেটাই যা কিছুটা আশ্চর্যের বোধ হয় হরনাথের।

এরপর চলে পুলিশ কাস্টডি আর কোর্ট চত্বরে ঘোরাঘুরির এক ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি। পুলিশ হেফাজতে থার্ড ডিগ্রির নব-নব সৃজনশীল প্রয়োগে হরনাথের শরীর-ভূগোলে যে বেশকিছু মৌলিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে, সে বিষয়েও হরনাথ কেমন যেন নিঃসাড়, হতচেতন থেকে যায়। সরকারি ন্যায়-বিচারের এই ধারাবাহিক এবং ক্রম-উন্নত প্রয়োগের একটা চরম বিন্দুতে হরনাথকে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা আইন বা মিসা প্রয়োগে সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া হয় বহরমপুর সেনট্রাল জেলে।

মাঝরাতে হরনাথদের যখন বাইরের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে চারমানুষ-সমান উঁচু পাঁচিলঘেরা জেল চৌহদ্দির ভেতর নিয়ে আসা হয়, পুলিশ ঘিরে থাকে তাদের ডাণ্ডাবেড়ি দিয়ে। সে সময়ে হরনাথের মনে সজাগ কোনো বোধ কাজ করে না। কেননা পিসি-তে এস-আই তার চুল-ওপড়ানো মুখ আয়নায় দেখায়। নিজের ওই সম্পূর্ণ অজানা এক চেহারা দেখে হরনাথের প্রত্যয়ই জাগে না আয়নার ভেতর ওই প্রায়-ন্যাড়া মানুষটা সে নিজেই। হরনাথ তাই তন্ময় চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়ে—মানুষের মাথার চুল এবং মুখশ্রীর সম্পর্ক কতটা নিবিড়। আর এ-জন্যেই জেলের সাহেব যে তাদের ঘণ্টাখানেক শাসিয়ে যায় তা হরনাথের কানের পরদায় যথারীতি প্রতি-ফলিত হলেও মগজে ঢোকার পথ পায় না।

জেলে সকাল আসে। এ সকালের সঙ্গে কোনো পরিচয় ছিল না হরনাথের। আলো যেহেতু সর্বত্র-গামী তাই আলো এসে পড়ে একফালি, হরনাথের ঘুমক্লান্ত চোখে। এবং এই জেলের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় শুরু হতে থাকলে হরনাথ লক্ষ করে—জেলের ভেতর মাঠ। মাঠ পেরিয়ে রাস্তা। রাস্তার ডানদিকে এক গোলকধাঁধা পেরিয়ে সামনে পড়ে সাবেক আমলের লোহার গেট। মাথা নীচু করিয়ে হরনাথদের নিয়ে আসা হয় ফাইলে—যেটা কি-না একটা বিশাল পুরনো বাড়ি (পরে জেলঘুঘুদের কাছে জেনেছে এটা

নাকি ছিল সিরাজদ্দৌল্লার আস্তাবল অথবা খাজানচিখানা)। বাড়িটার দুপাশ দিয়ে টানা লম্বা বারান্দা, মাঝে ঘর। ঘোড়ার আস্তাবল কিংবা খাজানচিখানা বলেই হোক কিংবা অদূর ভবিষ্যতে জেলখানা হবে বলেই কি-না কে জানে, এ বাড়িতে যাতে এক নিশ্ছিদ্র তমিস্রা বিরাজ করতে পারে সেজন্যে এ বাড়ির নকশাকার যে বিস্তর মাথা ঘামিয়েছিলেন তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

দিনমানেই স্থপতিপরিকল্পিত সেই প্রায়-যামিনীতে হরনাথদের সামনে এসে উদয় হয় 'মেট' সিঙ। সাজাপাওয়া আসামি এই মেটরাই জেল-প্রশাসনের মেরুদণ্ড। জেলর আসলে এদেরই বড়-কর্তা। এরা 'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়'—এই প্রবচনে বিশ্বাসী থাকায় তল্লাশির নামে হরনাথদের ওপর মেট সিঙ যা প্রয়োগ করে তা বিদঘুটে রকমের অশ্লীল। জেলে ঢোকামাত্র ঘাবড়ে দেওয়ার জন্য সে বন্দীদের ওপর আর-যা সাময়িক সফলতার সঙ্গে যোগ করে তা হল বাজখাঁই গলায় অহেতুক হাঁকডাক পাড়া। অনুসন্ধান এবং অনুশাসন-পর্বশেষে হরনাথকে পুরো একটা দিন একটি নির্জন সেলে কাটাতে হয়। এটাই জেল-নিয়ম। মিসার বন্দী বড়ো বিপজ্জনক। ওদের হাড়গোড় পিসিতে ভেঙে দিলেও মনটাকে তো আর সহজে ভাঙা যায় না। তাই জেলে এক সুনিপুণ পরিকল্পনায় এই মন-ভাঙা কাজ চলে যান্ত্রিক নিষ্ঠায়।

ওই আলো-বাতাস-মানুষহীন সেলে একদিনকে এক যুগ মনে করে বসা জলমাটিতে বেড়ে ওঠা হরনাথের পক্ষে সঙ্গত। সময় যেন অনন্ত হয়ে সেলের ওই গাঢ়-অন্ধকারে স্থির সমাহিত হয়ে বসে। সুতরাং পরদিন হরনাথের অনুভবে আসে বহুযুগ কেটে গেছে বুঝি। এবার তাকে দেওয়া হয় সাত নং ফাইলে। যে ফাইলে থাকে তাদেরই দলের বাবুবাড়ির ছেলেরা, কিছু বাবু, কিছু তার নিজেরই মতো মানুষ। হরনাথ আশ্বস্ত হয়, 'যাক, তবু স্বজনের মধ্যে থাকা যাবে, এই বা কি কম কথা!' কিন্তু অল্প কয়দিনেই যেভাবে স্বজনেরা মেলে ধরে নিজেদেরকে কোনোরকম ভনিতা ছাড়াই, তাতে হরনাথের একেই দিশেহারা মগজে কোষগুলো তালগোল পাকিয়ে এক কিম্ভূত আকার নেয়।

'এরাই কি মুক্তির-স্বপ্ন-দেখা সেই মানুষগুলো। এই যারা খাবারের গুণাগুণ নিয়ে চুলচেরা বিচার করে। রাগ করে, মান-অভিমান করে। একটু ভালো খেতে পাবে বলে ঝুটমুট নিজেকে অসুস্থ ঘোষণা করে। কেননা মেডিক্যাল ডায়েটের পরিমাণ বেশি এবং জেলের ওই অখাদ্য লপসির থেকে শতগুণে ভালো। কারো-কারো ইনটারভিউতে আসা মুড়ি-চিঁড়ে-গুড় রাতে চুরি করে খায়। নিজের কম্বলে বেশি পিশু থাকলে, চাম-উকুন থাকলে অন্যের কিছুটা ভালোদশার কম্বল তার অজান্তে সড়াত করে নিজের বিছানায় চালান করে। সবাই যদিও নয়, কিন্তু ঝোঁকটা তো এদিকেই বেশি। সেই এরাই আবার যখন সন্ধেয় টিনের থালা বাজিয়ে হরেক রকম গলায় হরেক রকম সুরে গান ধরে 'খেতের আলে আলে জোতদারের মুণ্ডু দোলে,' তখন হরনাথ সত্যিই মনে করে থাকে এখানে না আসলে কি তার বিশ্বদর্শন পূর্ণতা পেত! মানুষ যে অবিমিশ্র ভালো বা মন্দ হতে পারে না, মিশেল থাকে, এ-বোধ হরনাথের সোজা মগজে ছিল না। তাই এই বাবুবাড়ির মানুষজনকে, যারা তাকে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছে, হরনাথ ভালোবাসত, ভক্তি করত। সাত নং ফাইলে হরনাথ অবশেষে এই চৈতন্যে পৌঁছতে পারে—মানুষে মিশেল থাকেই, পরিবেশ পালটাও, মানুষও পালটায়।

এভাবে হরনাথের এই সমাজছিন্ন জেলজীবনে 'খতম-শ্রেণীশত্রু-গেরিলা যুদ্ধ-সত্তর দশক মুক্তির দশক' ইত্যাকার অগ্নিবর্ষী স্লোগানগুলি যথার্থই তার মগজে ভারী হাতুড়ির আঘাত হানে। এবং তার দেহেমনে নিতান্তই হাঁফ ধরে যায়। এমন ধন্দময় সময়ে একেবারেই পারম্পর্যহীন এক জেল-বৈশিষ্ট্য বাস্তবিকই তাকে কিছুটা প্রমোদের খোরাক জোগায়। সে জিনিসটা বিড়ি। বিড়ি যে সোনার চেয়েও দামি হতে পারে, সরকারি ছাপানোটের বদলে বিড়িই যে জেলের ভেতর মুদ্রার ভূমিকা পালন করে, এটা জেনে হরনাথ মজা পায়। যে বিড়ি দু-টান দিয়ে অবহেলায় ফেলে দেওয়ার কথা, সেই বিড়িই সাত-দশ-পনেরো অসংখ্যজন মিলে টানে। এবং শেষটান (পরিভাষায় চুসকি) দেওয়ার জন্য যেন বা রায়ট বেধে যায়।

কিন্তু এই তাৎক্ষণিক প্রমোদ হরনাথের জেল-জীবনের শূন্যতাকে ভরিয়ে তুলতে পারে না। একা থাকার বোধ হরনাথের মাথায় বুঝি-বা পাহাড় হয়ে চেপে বসে। কমরেড বলে যাদের সে ডাকে (হরনাথের সে-ডাকে কোনো খাদের মিশেল ছিল না) তারা দূরে সরে যেতে-যেতে, দূরদূরান্তে ক্রমেই বিলীন; কোনো ভিনগ্রহের বাসিন্দা বুঝি-বা। তাই হরনাথ কিছু একটা অবলম্বন চায়। নিছক বেঁচে থাকার তাগিদেই হরনাথ মানানসই কিছু একটা জুটিয়ে নিতে হন্যে হয়ে পড়ে।

বহরমপুর জেলে কয়েদি-সেপাই-মেটদের স্থায়ী আবাসে আরো কিছু অন্য প্রাণী জেলের ভেতরই প্রায় অবাধ-স্বাধীন বিচরণে নিঃশঙ্ক। এদের মধ্যে বিশেষ তিনটে বেড়াল—একটা লেজমোটা হুলো (তার সৌন্দর্যের খ্যাতি বেড়াল-সমাজ ছাড়িয়ে কয়েদি-সমাজেও ছড়িয়ে পড়েছে), আর একটার গরমজলে লোমপোড়া, চামড়ায় দগদগে ঘা। তৃতীয়টি এক মেটের পেয়ারের পোষা বেড়াল। আর পোষমানাদের যা হয়ে থাকে—দেমাকে যেন মাটিতে পা-ই পড়ে না। নড়েচড়ে বসতে ছ-মাস। সামনের থাবাটা একবার জিব দিয়ে চেটে নিয়ে আলস্যের হাই তোলে মেয়াঁও। মেটের তোয়াজে এই ছোট্ট সাদা বেড়ালটি যে গায়েগতরে আর আহ্লাদে ফুলে উঠবে, এতে আর আশ্চর্য কী!

সেই মেট-এর জেলজীবনের মেয়াদ নির্ধারিত

সময়ের বেশ আগেই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কেননা বাইরে তার পরিচয় যতই বেপরোয়া হোক না কেন, মেট জেলে বেশ শিষ্ট থাকতে পারে। বিশাল জেলগেটের তালা যেদিন খুলবে, সেদিন মুক্ত আলোবাতাসে মেট-এর শরীর আবার নতুন করে মাটির স্বাদ বুঝে নেবে; তার বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই কীভাবে যে মেট-এর সঙ্গে হরনাথের, এই অসম দুই মানুষের সখ্য ঘটে যেতে পারে, আর কেনই-বা সেটা হয়তো সমাজতত্ত্বের গবেষণার বিষয়। কিন্তু যে-কোনো বিশ্লেষণ-নিরপেক্ষভাবেই মেট-হরনাথে যে মিতালি পাতা হয় তার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে টুসকি। টুসকির রূপের গুমোর আর মেট-এর ওপর তার একচ্ছত্র আধিপত্যে হরনাথের চোখে যেন আবার সবুজের আভা লাগতে পারে। সে ভাবতে পারে বেঁচে থাকাটা সুন্দর।

টুসকির উত্তরাধিকার কাকে দেওয়া যায়, এই দুশ্চিন্তায় উদ্বিগ্ন মেট হরনাথকেই তার এই গভীর সমস্যার কথা খোলসা করে জানায়। মেট-এর বয়ানে বোঝা যায়, জেলের ভেতর বেড়াল-জীবন নিয়ে বেঁচে থাকাটা মানুষের সমাজে অস্তিত্বরক্ষার লড়াইয়ের থেকে কিছু কম নয়। পায়ে-পায়ে বিপদ। দুধ-মাছ-এঁটোকাঁটা জোগাড়ের ঝামেলা এই পাঁচিলঘেরা চৌহদ্দির ভেতর এতই বেশি যে অনেকেই সে মৌলিক চাহিদা মেটাতে অপারগ হয়ে সারাদিন মেঁয়াও রবে জেলের ভেতর যে শব্দমাধুর্য নিয়ে আসে তার তরজমা করলে দাঁড়ায়—জীবনে ঘেন্না ধরে গেল। এর কারণ-নির্দেশে মেট-এর আপাতসরল ব্যাখ্যায় কোনো অভিনবত্ব না থাকলেও হরনাথ তার অভিজ্ঞতার ঝুলি ভরে উঠছে, এমন মনে করতে পারে।

মেট-এর কথা—জেল-সমাজে চাহিদা বেশি, যোগান কম। যতটুকু বা যোগান আসে তার সিংহ-ভাগ ঠিকেদার-জেলর-হেড জমাদার-চৌকির পালোয়ান ইত্যাদির মাকড়সার জালে আটকে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে যায় তার হদিশ পাওয়ার চেষ্টা

বৃথা। সুতরাং যোগান আসে ভয়াবহ রকমের কম। এবং সেক্ষেত্রে জেলসমাজে যে রুটি নিয়ে কামড়া-কামড়ি পড়ে যাবে, সেটা তো খুবই স্বাভাবিক। ফলে বেড়ালের খাদ্য যে জুটবে না বা এঁটোকাঁটা জুটলেও তাতে কয়েদি-সমাজের লোলুপ দৃষ্টি পড়বে, সেটা বুঝতেও খুব একটা কষ্ট করতে হয় না। এবং সেক্ষেত্রে দুর্বল জীব হওয়ার কারণে দিনের পর দিন পেটে খিল দিয়ে মেঁয়াও আর্তনাদে জেলের শূন্যবায়ু ভরিয়ে তোলা ছাড়া তাদের আর কী গত্যন্তর থাকতে পারে।

টুসকিও তাই অভিজ্ঞতার ধাপ পেরোতে-পেরোতে বুঝে যায়, হরনাথই তার ভবিষ্যৎ-নিরাপত্তা। এবং এভাবেই জীবনে অনেক আকস্মিক-তার মতোই হরনাথ আর টুসকির মধ্যে এক ধরনের যোগাযোগ ঘটে যায়, মানবসম্পর্ক হলে যাকে বলা যেত হৃদয়ের যোগ। এ যোগে হরনাথের ছন্ন জেল-জীবনে যেন বা সকালের নরম হলুদ আলো এসে পড়ে। এবং তার টুসকিকে নিয়ে খানিকটা মেতে ওঠায় অসঙ্গতি কিছু থাকে না। টুসকির খাওয়া-দাওয়ার দিকে হরনাথ নজর ফেরায়।

জেল-রীতি অনুযায়ী মাঝে-মাঝে ভালো খাবারের জন্যে অনশন ধর্মঘট করতে হয়। হরনাথরা তাই করে বাড়তি দুধটা-মাছটা আদায় করে। হরনাথ তার ভাগের দুধ-মাছ নিয়মিত অতি যত্নে টুসকিকে খাওয়ায়। বাইরের গাঁয়ে-গঞ্জে কিংবা শহর-বস্তিতে এই তুচ্ছ ব্যাপারটা হয়তো কারো নজরেই পড়ত না। যদি-বা পড়ত, তেমন গা লাগাত না কেউ। কিন্তু বিপ্লবীদের ফাইলে এমন একটি সৃষ্টিছাড়া বিষয়ের গুরুত্বই আলাদা। সদাই "সমালোচনা-আত্মসমালোচনা"য় মগ্ন বিপ্লবীরা বেশ কয়েকজন এহেন ঘটনাকে একটু তেরছা চোখেই দেখতে চায়, এবং ক্রমে তারা যেহেতু সংখ্যায় বেড়ে উঠতে থাকে, তাই দেখতে পায়ও।

'এমন আজব কথা কে কবে শুনেছে—যেখানে ওয়ার্ডের কমরেডরা বাজে খাচ্ছে, কম খাচ্ছে, অপুষ্টিতে ভুগছে সেখানে কিনা বেড়ালকে দুধ-মাছ দেওয়া! নিজে না খাবি তো কমরেডদের দে. সংগঠন জোরদার হবে। কমরেডদের থেকে বেড়াল তোর আপন হল!' এহেন "বিশুদ্ধ বিপ্লবী মতে"র প্রবক্তা মল্লিক হরনাথকে শুধু ধমক দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, সে এ নিয়ে ওয়ার্ডের মধ্যে রীতিমতো প্রচার-আন্দোলনে নামে। হরনাথ-বিরোধী দল ভারী হতে থাকলে সংগঠনের ওয়ার্ড কমিটি সংবিধান অনুযায়ী আর নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না—এই সুকঠিন তাত্ত্বিক সমস্যার মীমাংসায় এখনই আসরে নেমে পড়া সমীচীন মনে করে তারা। জাঁকিয়ে ওয়ার্ড কমিটির মিটিঙ বসে। মিটিঙ যেহেতু তাই সবাই বলার অধিকার ভোগ করে এবং সদস্যরা প্রায় সবাই যখন নেতা কিংবা হাফনেতা, তাই কথাবরচেই সময় লাগে বিস্তর। হরনাথের পালা এলে সে ছোট্ট করে জানায় —'আমি বেড়ালটাকে ভালোবাসি, তাই নিজে না খেয়ে ওকে দিই।'

এমন যুক্তিব্যাখ্যাহীন, টীকাটিপ্পনি-উক্তিহীন জবাব যে সভাস্থলে কোনোমতেই কলকে পেতে পারে না, তা মিটিঙ-অভিজ্ঞদের গোচরেই থাকার কথা। সুতরাং হরনাথের এবম্বিধ কর্ম সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে বিপ্লবী তথা মানবকুলের প্রতি এক অমার্জনীয় অপরাধ-রূপে পরিগণিত হয়, এবং মিটিঙ-রীতি অনুযায়ী হর-নাথকে এক সতর্কীকরণ দেওয়া হয়—'ভবিষ্যতে যেন আর না হয়।' হরনাথ এই আমোঘ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে গেলে খেই হারায়, এবং হরনাথ-বাচনে যেহেতু আঁটোসাটো বাঁধুনি নেই, তাই হরনাথ এই অনড় সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র ফাটল ধরাতে পারে না। কিন্তু এমন-কী সাংগঠনিক শৃঙ্খলাবোধের দোহাই দিয়েও সে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারে না। ফলে বিরোধ বাড়তে থাকে। পরিভাষায় দ্বন্দ্ব। তবে এ দ্বন্দ্বকে বৈরমূলক না অবৈরমূলক কীই-বা বলা যায় তা হরনাথের মগজে ঠিক-ঠিক না ঢুকলেও মল্লিকদের রকমসকম বৈরিতার চূড়ান্ত পর্যায়ে উঠতে থাকে। টুসকি নিয়মিতই রাতে হরনাথের কম্বলের তলায় ঘুম নেয়। সে সময়ে হরনাথ

টুসকি-চিন্তায় বিভোর হয়ে শান্তিতে ঘুমোয় সেসময়ে মল্লিকরা চুপিসাড়ে হরনাথের বিছানার পাশে এসে টুসকিকে ছুঁড়ে ফেলে ওয়ার্ডের বাইরে। এমন একটি 'মানবিক' ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরদিনই হরনাথ-এর একমাত্র সুহৃদ বিকাশ তাকে সতর্ক করে দেয়, 'ওরা তোকে আর তোর টুসকিকে সহজে ছেড়ে দেবে না।'

এমন হাস্যকর অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, বিশেষ করে বিকাশের সতর্কবাণীতে অন্য কেউ হলে হয়তো 'রইল টুসকি মাথায়' বলে গা ঝেড়ে ফেলত। কিন্তু হরনাথ-এর ধূসর কোষগুলোয় নিশ্চয়ই বেশ একটা ওলট-পালট হয়ে যায়। তাই যতই মল্লিক আর তার সাগরেদরা টুসকিকে নির্যাতনের নিত্যনতুন কায়দা বার করে, ততই হরনাথ গেরিলা কৌশলে তা প্রতিহত, পরিভাষায় কম্‌ব্যাট, করে। আকড় শেখা মাথায় ওঠে হরনাথের। বিকাশের সঙ্গে নিভৃতে দু-দণ্ডের ভবিষ্যৎ-ভাবনা—তাও বন্ধ। চান-খাওয়াদাওয়া সবই প্রায় ভুলে গিয়ে হরনাথের মাথা-মন-হাত-পা, গোটা শরীর একমুখেই ধায়—টুসকিকে বাঁচাতেই হবে।

দুপুরের খাওয়ার ঘণ্টা পড়তে না পড়তেই পড়ি কি মরি করে হরনাথ ছোটে চৌকিতে*। মাছটা আর অল্প কিছু ভাত লুকিয়ে ফেলে জামার আড়ালে, ছুট্টে এসে (ওয়ার্ড তখন ফাঁকা) টুসকিকে খাওয়ায় আর উদ্বিগ্নতায় গলা কেঁপে ওঠে, 'নে নে, তাড়াতাড়ি কর টুসকি···কেউ দেখে ফেললে জন্মের খাওয়া খাইয়ে ছাড়বে!' টুসকিও বুঝি পরিবেশের এই সন্ত্রাস টের পেয়ে যায়। তাই নিঃশব্দে সে সেরে নিতে থাকে খাওয়ার পাট। হাবেভাবে মনে হয়, এ পাট যত তাড়াতাড়ি চোকে ততই মঙ্গল।

এই লুকোচুরি খেলায় রোজ-রোজ নতুন-নতুন কৌশল উদ্ভাবন করতে থাকে হরনাথের উর্বর মস্তিষ্ক। এমন একটা ঘোরের মধ্যে সে এ খেলাটা খেলে যায় যেন টুসকির দুধ-মাছের সঙ্গে তার নিজ-সত্তার টিকে থাকা নির্ভর করছে। দুপুর হলেই হরনাথের আনচান ভাব, হঠাৎ ছুটে চৌকি যাওয়া, এসব যখন বেশ কিছুদিনের পুরনো হয়ে যায়, তখন যান্ত্রিক নিয়মেই সেটা নজরে পড়ে মল্লিকদের। আর হরনাথও টের পেয়ে যায় 'চলবে না, এভাবে আর চলবে না···নতুন কায়দা নিতে হবে।' সুতরাং সে কৌশলে সামান্য হেরফের ঘটিয়ে নেয়। দুপুরে আর আগেভাগে ছোটে না হরনাথ। সবার সাথে একসঙ্গেই চৌকিতে যায়। তবে সবার অলক্ষ্যে প্যান্টের পকেটে মাছের টুকরো, ভাতের মণ্ড ভরে নেয়। তারপর ধীরস্থির চলে আসে। সবাই যখন খাওয়ার পর কম্বলে আলস্যে গা-এলিয়ে দিয়ে ঝিম মেরে থাকে, তখন সময় হয় হরনাথের চুপিসাড়ে উঠে আসার। ওয়ার্ডের ভেতর এককোণে যে পায়খানার ড্রামটা রাখা থাকে তার পেছনে পৌঁছে দেয় তার পকেটের জিনিস আর সঙ্গে থাকে নিঃশব্দ সংকেত! এ ভাষা বুঝে নিতে কোনোই অসুবিধা হয় না টুসকির। সেও নিঃশব্দে খেতে থাকে, এমনকী তার প্রিয় চুক-চুক ধ্বনি পর্যন্ত বাদ দিতে পারে। কারণ টুসকিও যেন জেনে যায় এক্ষেত্রে শব্দ ব্রহ্ম নয়, শব্দ তার কালান্তক যম।

কিন্তু শব্দহীন মৃত্যুগন্ধ অহরহ বুকের শ্বাসে জড়িয়ে নিরাপত্তা খুঁজে নেওয়ার এমন মরীয়া প্রয়াসে একদিন ইতি টেনে দেওয়া হয়। ইতি টানা যে হবে তাও যেন কার্যকারণসিদ্ধ নির্ধারণ। এমনকী, টুসকি-হরনাথে সরাসরি যে যোগ, যে যোগে তাদের বোঝাপড়া অনায়াস, তাও আর ঠেকিয়ে রাখতে পারে না মল্লিকদের। বামাল ধরা পড়ে তারা। যেন চুরির দায়। যেন-বা বেড়াল-খাওয়ানোর থেকে নোংরা কাজ আর কিছু হতে পারে না। এমনই ভাবসাব মল্লিকদের। টুসকি গোঁফের ডগায় বিপদ আঁচ করতে পেরে সটকে পড়ে। ঘেরাও হয়ে পড়ে একা হরনাথ। হরনাথের দিকে ঘৃণা যাতে উথলে ওঠে সেজন্যে প্রথমেই শুরু হয় শ্লোগান : 'মানুষ মেরে বেড়াল-খাওয়ানো চলবে না। প্রতিক্রিয়াশীল

* চৌকি—জেলের রসুইখানা এবং খাদ্য-বিতরণকেন্দ্র।

হরনাথের কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও।'…

যে সময়ে ঘৃণাবৃদ্ধির এহেন চমৎকার দাওয়াই নিয়ে মল্লিকরা ব্যস্ত, সে সময়ে হরনাথের মাথায় কিছু আন-চিন্তা ঢোকে—বেড়াল-খাওয়ানো এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা কিভাবেই-বা সংযুক্তি পেতে পারে? আর কালো হাত! একথাটা কোনোদিনই তার মগজে তেমন ঢুকতে পায় নি। এক সময়ে সে জিগ্যেসও করেছিল, 'ইন্দিরার কালো হাত বলা হয় কেন? ওঁর হাত তো যথেষ্ট ফরসা। তবে কি কালো বলতেই খারাপ কিছু, ঘৃণ্য কিছু, অন্যায় কিছুকে বোঝায়? তবে তো পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষই কালো, তাদের হাতও কালো, যেমন তার নিজের। এরা সবাই তবে কি—প্রতিক্রিয়াশীল।'

হরনাথের এমন মগ্ন চিন্তার সময়ে মল্লিকদের উচ্চনাদে ধীরে-ধীরে ঘৃণা বেশ পেকে উঠতে পারে এবং ক্রম-উন্নত এই ঘৃণার আবেগে তাদের একজন শুরুর ঘুঁসিটা হরনাথের মুখে জমিয়ে দিতে পারলে আর কোনো বাধা থাকে না। একের পর এক যেন সাগরের ঢেউ হরনাথের শরীরময় আছড়ে-আছড়ে পড়ে। এককালে বেলটে ছুরি গোঁজা হরনাথ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় রুখে উঠতে চায়। কিন্তু এখানে ছুরি এবং হরনাথের সেই পুরনো ইমেজের অনুপস্থিতি তাকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতেই বাধ্য করে। এই প্রক্রিয়ার একটা পর্যায়ে হরনাথ যখন মৃত্যুর স্পর্শ পেতে থাকে খুব কাছেই, তখন কম্বলের মতোই কী যেন তাকে আপাদমস্তক ঢেকে দেয়। কম্বলের ওমে আরামে মৃত্যু আসবে, এ-আশায় হরনাথ চেতনা হারায়।

এমন পরিসমাপ্তি গল্পের পক্ষেও স্বস্তিব্যঞ্জক। কেননা এতে আর কোনো গোল থাকে না, কোনো দায় থাকে না। কিন্তু কম্বলটি যেহেতু একটি মানুষের শরীর এবং মানুষটি বিকাশ আর যেহেতু তার ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা হরনাথকে বাঁচানো, তাই হরনাথের আর অনায়াস মৃত্যু ঘটে না। হরনাথ বাঁচে, তবে ধুঁকতে-ধুঁকতে। তার শরীরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে 'বিপ্লবী ঘৃণার চিহ্ন'।

যেমন হয় এসব ক্ষেত্রে—হয় ভেঙে খানখান হয়ে পড়ে, নয় থুতনিতে বেশি করে খাঁজ পড়ে। হরনাথের চোয়াল যেন আরো শক্ত হয়ে ওঠে। টুসকির প্রাণ যেন হরনাথের সত্তার সবটুকু অধিকার করে নেয়। এখানে বলাই যায় হরনাথ যখন অচেতনা আর চেতনার সন্ধিস্থলে, সে ক্ষণমুহূর্তে বিকাশের কানে হরনাথের কাতরোক্তিতে অস্ফুটে যে দু-একটি শব্দ ভেসে আসে তার মধ্যে 'টুসকি পালা…মেরে ফেলবে' এসব যেন মিশে থাকে।

মল্লিকরা তাদের এই দৃপ্ত কর্মসূচিতে যেহেতু হরনাথ কিংবা টুসকি কাউকেই তাদের অভিপ্রায়-মতো ঘায়েল করতে পারে না তাই তারা আবার একটি সাধারণ সভা, পরিভাষায় জি বি, ডাকার তাগিদ অনুভব করে। যথাকালে জি বি এক অগ্নিবর্ষী ভাষণ দিয়ে শুরু হলে দেখা যায় বক্তারা প্রত্যেকেই হরনাথের বেড়ালপ্রীতির তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। তাদের জোরালো বক্তব্যে যারা-বা একটু-আধটু দোলায় দুলছিল তারাও হেলে পড়ে, এবং তাদের এই কাত হওয়াটা নিঃসংশয়ে হরনাথের বিরুদ্ধেই যায়। অবশ্য হরনাথকে যে মেরে ফেলার উপক্রম হয়েছিল বক্তারা সে বিষয়ে সঙ্গতভাবেই নীরব থাকে। বিকাশ প্রসঙ্গটি মুহূর্তকণ্ঠে উত্থাপন করতে চাইলে সভাপতি তাকে এই 'অপ্রাসঙ্গিক' বিষয় অবতারণার জন্যে তীক্ষ্ণ এক ধমক লাগায়। এ নিষ্ফল চেষ্টার কোনো ভবিতব্য নেই জেনে বিকাশ বোবা মেরে যায়।

একের পর এক মানসিক অভিঘাতে ধস্ত হরনাথ সভার অনুচ্চারিত সিদ্ধান্ত সবার মুখে-চোখের ভাষায় পড়ে নিতে পারে—টুসকিকে মেরে ফেলা হবে। এবারে হরনাথ তার সাংগঠনিক শৃঙ্খলাবোধ ইত্যাদি অনুষঙ্গগুলিকে আবর্জনার মতো ঝেড়ে ফেলতে পারে। মল্লিকদের প্রতি রাগ আর ঘৃণাকে গলার শিরায় জমিয়ে সে গর্জে ওঠে, 'টুসকির গায়ে কেউ যদি হাত দেয় কাউকে আমি ছেড়ে দেব না।' তার এই তর্জন যেহেতু শুধুমাত্র শরীরী প্রতিবাদ, তাই আর এ নিয়ে কেউ তেমন শোরগোল তোলে না। এতে বরং প্রত্যেকের চোখেমুখে তাদের নিঃশব্দ সিদ্ধান্ত আরো জোর পেয়ে যায়। এতে হরনাথ মনের ভারসাম্য হারায়। ক্রমে নিজেকে আরো বিপদে জড়ায়। উৎক্ষিপ্ত হয়ে সে ঘোষণা করে—সঙ্গীদের আর আমি মানুষই মনে করি না, বিপ্লবী তো দূরের কথা। এভাবে মনের জ্বালা প্রকাশ করে হরনাথ নিজেকে স্থির রাখার যে চেষ্টা চালায় তা নেহাতই অপপ্রয়াস। কারণ হরনাথ আক্ষরিক অর্থেই বেদিশা হয়ে পড়ে। নাওয়া-খাওয়া সব ছেড়ে কম্বলের এককোণে উবু হয়ে বসে থাকে সে চুলের ভেতর আঙুলগুলো শক্ত করে চালিয়ে দিয়ে। রাতেও এক ছবি। আর ঘুমোয় না হরনাথ—ওইভাবেই ঠায় বসে থাকে। তার নজর শুধু মল্লিক আর তার সাগরেদদের ওপর—যে-কোনো মুহূর্তেই তো ওরা টুসকিকে মেরে ফেরতে পারে।

এভাবে টানা দিনের পর দিন অতন্দ্র প্রহরা জৈবিক নিয়মেই হরনাথের শরীর-মন আর বইতে পারে না। একরাতে হরনাথের চোখে ঝিমুনি আসে এবং ধীরে গভীর ঘুমে এলিয়ে পড়ে সে। এহেন ঘুমের গভীরতাও হঠাৎ একসময়ে নিশুত রাতে চটকে যায়। তার ঘুম ভেঙে যায় এক তীক্ষ্ণ আর্তনাদে। এ আর্তনাদ কোনো মানুষের নয়—জন্তুর, তার বেঁচে থাকার প্রবল ইচ্ছার। ঘোর কাটলে হরনাথ টের পেয়ে যায়—বেড়াল…টুসকি…তার টুসকিকে মেরে ফেলা হচ্ছে। এক ঝটকায় উঠে পড়ে সে। কিন্তু কোত্থেকে বিকাশ এসে তাকে কম্বল দিয়ে জাপটে ধরে আবার শুইয়ে দেয়। হাত দিয়ে হরনাথের মুখ চেপে ধরে সে ফিসফিসিয়ে বলে—চিৎকার করিস না, ওরা তাহলে তোকেও মেরে ফেলবে। অসহায় হরনাথ সেই মৃত্যু-যন্ত্রণায় নিজেই কাতরে ওঠে। কখন যে আর্তনাদ মৃদু গোঙানিতে নেমে আসে, কখন যে চরাচর আবার নিশুত রাতের স্তব্ধতায় ফিরে আসে তাও সে আর খেয়াল রাখে না। নিষ্ফল আক্রোশে কেবল নিজের মাথার চুল আবার খোকা-খোকা ছিঁড়তে থাকে।

রাতশেষে আবার সকাল আসে। কিন্তু এ সকালে হরনাথের চোখে লেগে থাকে একরাশ অন্ধকার। এ অন্ধকারে হরনাথ তার বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সংশয়ী হয়ে ওঠে। টুসকি-বিহীন জীবন তার কাছে কেমন যেন ম্যাড়ম্যাড়ে লাগে। তাই হরনাথ ঠিক করে—এবারে জীবনকে বিদায় জানাতে হয়। এমন একটা দ্বন্দ্বহীন ভাবনায় পৌঁছে সে বেশ শান্ত হয়ে যায়। যাওয়ার আগে শেষবারের মতো এ পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-র স্বাদ বুঝে নেওয়ার বাসনায় সে ওয়ার্ড থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়ে। মৃদু গোঙানি শুনে চোখ চলে যায় পাঁচিলের ওপর। সেখানে বসে আছে ওটা কী? অমন বেঢপ এক জন্তু। অনেক নিরীক্ষণে হরনাথ পরিষ্কার হয়—ওটা সেই লেজমোটা হুলোটা। সারা শরীরে চাপ-চাপ রক্ত, একটা কান থেঁতলে গেছে। চোখের ছুপাশে গোল হয়ে ফুলে উঠেছে রক্তরেখা। শরীরটাও ফুলে ঢোল। নিশ্চয়ই ওকে কম্বল ধোলাই দেওয়া হয়েছে।

আঃ! একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে হরনাথের বুক থেকে। হুলোটার এই বীভৎস চেহারায় সে যেন আরাম পায়। বেঁচে গেছে ওটা। মল্লিকরা ভেবেছিল—মরে গেছে, থাক আজ, কাল ওটার মাংস রেঁধে খাওয়া যাবে। কিন্তু হুলোর অদম্য প্রাণশক্তি তাদের সে বাড়াভাতে ছাই দিয়েছে। সে এখন মল্লিকদের নাগাল এড়িয়ে পাঁচিলের ডগায়। কিন্তু তার খুশিতে উপচে ওঠার এর থেকেও বড়ো কারণ—তার টুসকি বেঁচে আছে, মল্লিকরা ওকে ছুঁতেও পারে নি। তার শরীর যেন পাখির মতো হালকা হয়ে ডানা মেলে উড়ে যেতে চায়। ভুলে যায় একটু আগেই সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার কথা ভেবেছিল। টুসকি আছে, তবে তো ওর সঙ্গে দেখা করতে হয়। হরনাথ জেল চত্বরে চিরুনি অভিযান চালাতে থাকে

টুসকির খোঁজে।

দিনকয়েক বাদে সেই লোমপোড়া বেড়ালটাকে মেরে মল্লিকরা বড়াখানার আয়োজন করে। তাদের মজলিশে যেন উল্লাসের হুল্লোড় বয়ে যায়। আর সেই উৎকট আওয়াজ হরনাথের বুকে যেন কামানের গোলা দাগে। টুসকির অমোঘ নিয়তিতে আর কোনো অস্পষ্টতা থাকে না। আজ হোক কাল হোক, টুসকিরও এই গতি হবে। কী করে হরনাথ! কিভাবেই বা এর মোকাবিলা করবে সে। অগত্যা হার মানে। হাল ছেড়ে দেয় একেবারেই। টুসকি যদি নাই বাঁচে আর, কী করতে পারে সে। কিন্তু মাথায় ভোমরার গুনগুনানি চলতেই থাকে তার। কেন যেন সশব্দে হেসে ওঠে। একদিন সে একেবারে উদোম হয়েই নাইতে যায়। হাসাহাসি পড়ে চারদিকে। হরনাথ বিড়বিড় করে—বাঁচব, বাঁচব রে আমরা···। আবার হাসে। বিপরীতে আসে দমকে-দমকে কান্না। কান্নার বেগে এক কাতর প্রার্থনা উঠে আসে—'মল্লিক, তোর পায়ে পড়ি, টুসকিকে ছেড়ে দে···ওকে মারিস না···কী ক্ষতি করেছে ও তোদের বল···মারবি না···কথা দিচ্ছিস···বাঃ কী চমৎকার ছেলে তুই···।' আবার হাসতে থাকে, চিৎকার করে বলে—'শুনছ তোমরা··· মল্লিক আমার টুসকিকে মারবে না···ওকে দুধ-মাছ খেতে দেবে···তোমরা যে বড়ো মল্লিকের নামে আমার কাছে লাগাও···।'

সবাই হরনাথের এ ভবিতব্য মেনে নেয়। বিকাশ শুধু নীরবে হরনাথকে নাওয়ায়, খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়। টুসকি আছে, বিকাশের এই কথায় আশ্বস্ত হরনাথ অঘোরে ঘুমোতে থাকে।

এমন দিনে এক বিকেলে হরনাথের রিলিজ অর্ডার আসে। জেলরের ঘরে ডাক পড়ে হরনাথের। জেলর বলেন, 'যাও, তুমি তো খুব ভাগ্যবান হে। মাত্র তিন বছরেই মিসার বন্দী খালাস···। যাও যাও, নিজের লটবহর বুঝে নিয়ে জলদি ট্রেনে চেপে বসো।' হরনাথ বলে, 'কিন্তু আমি যে এখন যেতে পারব না। জেলে আমার এক মিতা আছে, তাকে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সকালের আগে তো তার সঙ্গে দেখা হবে না।' জেলর ধমকে ওঠেন, 'না, আর কারো খালাস অর্ডার হয় নি, যাও তাড়াতাড়ি করো।'

—'না, না, সে কোনো কয়েদি নয়, টুসকি, আপনি চেনেন না আমার টুসকিকে—একটা বেড়াল। ওকে না নিয়ে আমি তো কিছুতেই যেতে পারব না।'

তাজ্জব চোখে জেলর তাকিয়ে থাকেন হরনাথের দিকে—ছেলেটার কি মাথা খারাপ, তিন বছর ধরে জেলে পচছে আর এখন বলে কি না 'আজ রাতটা থাকতে দিন, কাল সকালে বেড়াল নিয়ে চলে যাব।' প্রকাশ্যে ধমকে ওঠেন, 'ওসব বুজরুগি ছাড়ো। খালাস পেয়েছ চলে যাবে, আমাদের এখানে আর এক সেকেণ্ডও রাখবার নিয়ম নেই। আর কাল সকালে যদি আবার কর্তাদের মত পালটায়···আবার যদি আটক রাখার হুকুম হয়!'

—'হোক না, আমি তো তাহলে টুসকির সঙ্গে থাকতে পারব। এখানে তো আমার কোনো কষ্ট হচ্ছে না।'

জেলর ভাবেন—নাঃ, ছোকরার মাথাটা একেবারেই গেছে। এর সঙ্গে কথা বাড়িয়ে কাজ নেই···। এবার কড়াসুরে বলে ওঠেন, 'যাও, এক্ষুনি ওয়ার্ড থেকে তোমার জিনিসপত্র নিয়ে এসো। সাতটা পর্যন্ত সময় দিলাম।'

হরনাথ ওয়ার্ডে আসে। টুসকিকে খুঁজতে থাকে হন্যে হয়ে। কিন্তু কোথায় টুসকি? সে কি উধাও হল। না, সে বুঝে গেছে হরনাথ মল্লিকদের ভেট দিয়ে যাচ্ছে টুসকিকে তার নিজের বাঁচার জন্য। আর্তস্বর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে—টুসকি আয়, আমার সঙ্গে যাবি। কিন্তু কোথাও কোনো প্রতিশব্দ জাগে না। বুঝি-বা অদৃশ্য টুসকি হরনাথের কীর্তি-কলাপ দেখতে থাকে।

আর সহ্য করেন না জেলর। তাঁর আদেশে হেড জমাদার হরনাথের কলার চেপে হিড়হিড়িয়ে টানতে থাকে। হরনাথ হুমড়ি খেয়ে মাটি আঁকড়ে ধরে—'না, আমি যাব না। তোমরা ছেড়ে দাও আমায়। টুসকিকে না নিয়ে আমি কোথাও যাব না।'

এবার সেপাইরা তাকে ডাণ্ডা মারতে-মারতে জেলগেটের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে সশব্দে গেট বন্ধ করে দেয়।

সেই থেকে হরনাথ তার মগজ থেকে টুসকিকে তাড়াতে চায়, কিন্তু পারে না। টুসকি আজও তার মাথায় তেমনই গেড়ে বসে থাকে। তাই আজও যার সঙ্গেই দেখা হয়, তাকেই হরনাথ ওই একই কথা জিগ্যেস করে, 'কী করে বেড়ালটাকে মাথা থেকে তাড়াই বলুন তো!'

জওয়াহরলাল নেহরু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে "চতুরঙ্গে"র আগামী সংখ্যায় (নভেম্বর ১৯৮৮ সংখ্যা) প্রকাশিত হবে নেহেরু আমলের প্রবাদ-প্রতিম পারলামেনটেরিয়ান অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিবন্ধ: "জওয়াহরলাল নেহরুকে স্মরণ প্রসঙ্গে"

ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক আন্দোলন, ১৮২৪-১৯২০

বিনয় চৌধুরী

৬

সময়ের দিক থেকে পাগল-পন্থী আন্দোলন আগে হলেও আমরা প্রথমে ওহাবি-ফরাজি আন্দোলন আলোচনা করব। এতে পাগল-পন্থী আন্দোলনের সঙ্গে এদের পার্থক্য নির্দেশ করা সহজ হবে।

ওহাবি আর ফরাজি আন্দোলনের ভিন্নতার নানা দিক ঐতিহাসিকেরা বিশ্লেষণ করেছেন। ভারতবর্ষে ওহাবি আন্দোলন বলে যা পরিচিত, তা প্রধানত সরকারবিরোধী আন্দোলন—প্রথমে শিখরাজ, পরে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে। কিন্তু বাঙলায় ১৮৩১ সালের ওহাবি আন্দোলন মূলত জমিদার ও নীলকর বিরোধী কৃষক আন্দোলন। আমরা পরে দেখব, কীভাবে তা রাজবিরোধী রূপ নেয়। এর পর এখানকার কোনো কৃষক-আন্দোলন ওহাবিদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠেনি। কিন্তু ওহাবিদের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে কৃষক-দের সাহায্য নানাভাবে দেখা যায়, বিশেষ করে ১৮৪০-এর দশকে।

ফরাজি আন্দোলন প্রধানত কৃষক-স্বার্থরক্ষার আন্দোলন। এ আন্দোলন মাঝে-মাঝে অনিবার্যভাবে সরকারবিরোধী রূপ নেয়, কারণ ফরাজি কৃষকেরা অহরহ প্রমাণ পেয়েছে, তাদের দুই প্রধান শত্রু, জমিদার আর নীলকর, সরকারি শাসনযন্ত্রের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতা ছাড়া নিজেদের আধিপত্য কায়েম করতে পারত না। কিন্তু এ মানসিকতা ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসে। উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম সিপাহী-বিদ্রোহের সময়কাল; অন্যত্র ব্যাপক ব্রিটিশবিরোধী জনবিক্ষোভ ফরাজিদেরও প্রভাবিত করেছিল।

৬.১

ধর্ম এ দুই ভিন্ন ধারার আন্দোলনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা বোঝানোর জন্য তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শের কয়েকটা বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা প্রয়োজন। দুটি

বর্তমান প্রবন্ধের অংশবিশেষের প্রাথমিক একটি খসড়া পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনে (১৯৮৭) পঠিত হয়েছিল। অনবধানতাবশত এই কথাটি গত সংখ্যায় উল্লেখ করা হয় নি। ত্রুটি মার্জনীয়।—লেখক

আন্দোলনই নূতন ধর্মীয় গোষ্ঠীর (সেক্ট) দ্বারা পরিচালিত। আন্দোলনের দ্রুত বিস্তারের সময় গোষ্ঠী-বহির্ভূত অনেক কৃষক সম্ভবত এতে যোগ দিয়েছে। কিন্তু নেতৃত্ব প্রধানত এ গোষ্ঠীর হাতেই ছিল।

দুই আন্দোলনেরই প্রাথমিক প্রেরণা স্থানীয় পরিবেশ থেকে আসে নি। এর উৎস এ-অঞ্চল-বহির্ভূত এক বৃহত্তর ধর্ম আন্দোলন—যাকে ঐতিহাসিকেরা "ইসলামের পুনরুজ্জীবন" ('ইসলামিক রিভাইভ্যাল') বলেছেন।

য়ুরোপে ধর্মীয় গোষ্ঠীর (সেক্ট) উদ্ভব ভিন্নভাবে হয়েছিল। তা স্থানীয় চার্চের বিধিবিধান, অনুশাসন ও আধিপত্যের বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তা ছাড়া, চিন্তার জগৎ, শিক্ষাব্যবস্থা, ভূমিব্যবস্থা—এসবের উপর চার্চের বিপুল প্রভাবের জন্য যে-কোনো প্রতিবাদী সমাজদর্শন চার্চ-নির্দেশিত-জীবন-চর্যা-বিরোধী আন্দোলনের রূপ নিত। মধ্যযুগের য়ুরোপে বহু আন্দোলনের এই বিশিষ্ট প্রবণতা এঙ্গেলস এভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন।[২৯]

বারবারা মেটকাফ[৩০] "ইসলামের পুনরুজ্জীবন" আন্দোলনের কয়েকটা বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন, যা ওহাবি-ফরাজি আন্দোলনের চরিত্র-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে।

যে দর্শনের উপর "ইসলামিক রিভাইভ্যাল" আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত, তা একটা সামগ্রিক জীবন-দর্শন।[৩১] এখানে সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা, ধর্ম, ব্যক্তির নৈতিক এবং ধর্মীয় জীবন পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়। যদি কোনো আচার-অনুষ্ঠান, বিধিবিধান, শ্রেণী বা গোষ্ঠীর আধিপত্য ইসলাম-অনুগামীদের অর্থ-নৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে, বা অবশ্যম্ভাবিভাবে ইসলামের জীবনাদর্শকেই ক্ষুণ্ণ করে, সেই বিপর্যয় বা সংকট থেকে ইসলামপন্থীদের মুক্তির উপায় সম্পর্কে ধারণাও এই জীবনদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই দর্শন অনুযায়ী ব্যাপক কোনো সংকটের উৎস ব্যক্তির নৈতিক অপকর্ষ, অসামঞ্জস্য আর অসম্পূর্ণতার মধ্যে। এ অসম্পূর্ণতার ফলেই শত্রু প্রবল হয়। তাই ব্যক্তির নৈতিক উৎকর্ষসাধনের মধ্য দিয়েই শত্রুর পরাভব ঘটবে।

ইসলাম-অনুগামীদের নৈতিক অধোগতির কারণ হিসেবে বলা হয়েছে—তারা নবীপ্রবর্তিত ইসলামের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। চরম বিচ্যুতি হল, এক ঈশ্বরের অখণ্ড মহিমা বহু জনের উপর আরোপ। এর ফলে মহম্মদ-নির্দেশিত বিধানের সঙ্গে অসম্পৃক্ত, অসঙ্গতিপূর্ণ বহু বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান তারা গ্রহণ করেছে।[৩২] নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক পুনরুজ্জীবনের জন্য তাই প্রয়োজন ইসলামের আদি, অবিকৃত, সরল জীবনচর্যায় ফিরে যাওয়া। "পুনরুজ্জীবন" আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা নেবেন ইসলামশাস্ত্রবিদ্, আদর্শনিষ্ঠ, শুদ্ধচরিত্র ধর্মগুরু।

বৃহত্তর "ইসলামিক পুনরুজ্জীবন" আন্দোলনের এই বৈশিষ্ট্যগুলি ওহাবি আর ফরাজি আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ভারতবর্ষের বাইরে এ আন্দোলনের সঙ্গে দুই নেতারই ছিল প্রত্যক্ষ পরিচয়। তাদের দীর্ঘকালব্যাপী আধ্যাত্মিক অন্বেষণ থেকে তাদের আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

আগেই বলেছি, সেক্টপ্রচারিত নূতন জীবনাদর্শ এর অনুগামীরা বেশ খানিকটা নিজের মতো করে গ্রহণ করে। এ আন্দোলন দুটিতেই দেখা যায়, ইসলামের আদি আদর্শে ফিরে যাওয়ার আহ্বানে মুসলমান সমাজের সবাই সমানভাবে সাড়া দেয় নি। অন্তত গোড়ার দিকে, বিত্তশালী আর সম্ভ্রান্ত মুসল-মানেরা এর প্রতি আদৌ আকৃষ্ট হয় নি।[৩৩] এ আন্দোলনের মূল শক্তি একেবারে সাধারণ অবস্থার মুসলমানদের আনুগত্য—গরিব চাষি, জোলা, পটুয়া, ঢালিয়া প্রভৃতি। কিন্তু এ নূতন ধর্মমতে ইসলামের আদি আদর্শের সঙ্গে সংগতিহীন যে আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস বর্জনের কথা ছিল, তার অনেকগুলিই শেষ পর্যন্ত বহু জায়গায় টিকে ছিল। ফরাজি-সম্প্রদায় সম্পর্কে রফিউদ্দীন আহমেদের[৩৪] দুটি গুরুত্বপূর্ণ

সিদ্ধান্ত উল্লেখযোগ্য : ফরাজি প্রভাবের দ্রুত প্রসার সম্পর্কে সমসাময়িক ধারণা খানিকটা অতিরঞ্জিত; ফরাজি-অনুগামীদের একটা নগণ্য অংশই মাত্র নূতন জীবনচর্যা সম্যক অনুসরণ করত। তাদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল ফরাজি নেতার সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের বাণী এবং আদর্শ। ফরাজি নেতা শরিয়াতুল্লা ছিলেন সামাজিক বৈষম্যের কঠোর সমালোচক। এ আদর্শ কিন্তু স্থান, - কাল, সামাজিক সম্পর্ক-নিরপেক্ষ কোনো কিছু নয়। অনুগামীদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতায় অসাম্যের যে রূপ অনিবার্যভাবে প্রকট হয়ে উঠেছিল, তাই নেতার প্রচারকে প্রভাবিত করেছিল। যেমন, সামাজিক অমর্যাদার দ্যোতক পারিবারিক পদবী "জোলা"র ব্যবহার তিনি নিষিদ্ধ করেন। জোলা-সম্প্রদায়ভুক্ত শিষ্যদের তিনি কারিগর বলে নিজেদের পরিচয় দিতে বলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে আচার-অনুষ্ঠানে দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত রীতিকে বর্জন করা সহজ ছিল না বটে, কিন্তু অন্তত গোড়ার দিকে, নূতন আদর্শে দীক্ষিত, অনুপ্রাণিত ওহাজি-ফরাজিদের কিছু-কিছু তাদের আন্দোলনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল! যেমন, নেতাদের প্রচার থেকে তাদের ধারণা হয়েছিল, স্বেচ্ছায় যে ধর্মমত তারা গ্রহণ করেছে, তার অনুসরণ এবং প্রচারে অন্য কারো হস্তক্ষেপ অন্যায় এবং অসংগত। এক বিশেষ সামাজিক পরিমণ্ডলে তাদের এ ধারণা আরো দৃঢ় হয়—সেটা হল, জমিদারদের সঙ্গে তাদের প্রজার সম্পর্ক। কৃষক হিসেবে তাদের চেতনার উপর একটা প্রধান প্রভাব পরাক্রান্ত স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক। জমিদারের নানা ধরনের কর্তৃত্ব তারা অবস্থাবিপাকে মেনে নিয়েছে; কিন্তু তারা ভাবতে শিখেছে, তাদের নূতন ধর্মবিশ্বাস এ কর্তৃত্বের এক্তিয়ারে পড়ে না। কিন্তু দীর্ঘদিন যারা নিরঙ্কুশ প্রতাপ খাটিয়ে এসেছে, তাদের কাছে এ ধারণা শুধু যে গ্রহণীয় ছিল না, তা নয়; এটা তাদের মনে হয়েছিল অক্ষমণীয় স্পর্ধা। সংঘর্ষ তাই ক্রমেই অনিবার্য হয়ে উঠল। শুরুতে সংঘাতের এক রূপ; কিন্তু পরে তা ক্রমেই জটিল হয়ে ওঠে। ওহাবি-ফরাজি আন্দোলনে ধর্মবিশ্বাস এভাবে শ্রেণীচেতনার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। ধর্মবিশ্বাসের আদিরূপও তাতে অনেকখানি পালটে যায়।

৬.২

এজন্যই ওহাবি-ফরাজি আন্দোলন শুধুমাত্র কৃষকদের অর্থনৈতিক সংগ্রাম নয়। আবার, এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত প্রজাদের ভিন্নধর্মী জমিদারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ মাঝে-মাঝে ধর্মীয় রূপে আত্মপ্রকাশ করলেও শুধু ওই কারণে তাকে "সাম্প্রদায়িক" আখ্যা দেওয়া যায় না। কৃষকদের ধর্ম এবং রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা বিশ্লেষণে আমরা আলাদাভাবে ওহাবি এবং ফরাজি আন্দোলনের আলোচনা করব।

ব্যাপক সংঘবদ্ধ কৃষক-আন্দোলনের কারণ সম্পর্কে কোনো সর্বজনীন নিয়ম খাটে না। তবে যে কয়েকটা কারণ বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়, তার মধ্যে একটা প্রধান হল, কৃষকদের ঐতিহ্যসম্মত অধিকারের উপর জোরালো কোনো আঘাত, দস্তুরবিরোধী আকস্মিক কোনো দুর্বহ অর্থনৈতিক দাবি প্রতিহত করার জন্য তাদের সম্মিলিত সংকল্প।

ওহাবি আন্দোলনের উদ্ভব এবং প্রসার সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে হয়েছিল। অবশ্য এটা সন্দেহাতীত যে, "দাড়ির জরিমানা"[৩৫] থেকে ওহাবিদের সঙ্গে স্থানীয় পুড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের বিবাদের সূত্রপাত। নানাভাবে এ সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ত হয়। আর চূড়ান্ত সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

কিন্তু এ সংঘর্ষের চরিত্র বোঝার জন্য আমাদের দুটো প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে—জমিদার কেন ওহাবিদের এভাবে জরিমানা করল? আর এ জরিমানা বন্ধ করার জন্য ওহাবিরা ঐক্যবদ্ধ হল কেন?

"দাড়ির জরিমানা" পরাক্রান্ত কৃষ্ণদেব রায়ের এক

বিশেষ ধরনের ফরমান। এর সঙ্গে অবৈধভাবে জমির নিরিখ বাড়ানোর কোনো সম্পর্ক নেই। এটা জমির খাজনা নয়। যারা কৃষক নয়, তাদেরও এ জরিমানা দিতে হবে। কিন্তু তা শুধুমাত্র ওহাবি সম্প্রদায়ের জন্যই। হরেক রকমের আবওয়াবের কোনোটার সঙ্গে এর সাদৃশ্য নেই। জমিদারের নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের খরচ মেটানোর জন্য আবওয়াব আদায় করা হত। "দাড়ির জরিমানা"-র উদ্দেশ্য সম্পর্কে জমিদারের কোনো গোপনীয়তা ছিল না। সে প্রকাশ্যেই বলত, এর একমাত্র উদ্দেশ্য ওহাবি ধর্মমত প্রচারে বাধা দেওয়া।

এ জরিমানার একটা ব্যাখ্যা[৩৬] হল এই নীলচাষ সম্পূর্ণ বন্ধ করার সংকল্প ওহাবিরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। কিন্তু নীলচাষ তখন 'খুব লাভজনক ব্যবসায়'। য়ুরোপীয় নীলকরেরা তো বটে, দেশী জমিদারও এ চাষ বাড়ানোর জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠে। জমিদারেরা কিন্তু 'ইংরেজদের তাঁবেদারি করে নিজেদের ভাগ্য প্রসন্ন করার সুযোগ গ্রহণ করতে চাইল। তাই সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রজ্বলিত বিক্ষোভকে দমন করার জন্য জমিদারগণ নানাভাবে কৃষকদের ওপর অত্যাচার করতে লাগলো।' "দাড়ির জরিমানা" এর একটা রূপ মাত্র।

এ ব্যাখ্যা গ্রহণীয় নয়। ওই সময় নীলচাষ মোটেই লাভজনক ছিল না। আর্থিক মন্দা[৩৭] তখন তীব্র আকার ধারণ করেছে। বিদেশী বাজারে নীলের দাম তখন পড়তির দিকে। নীলচাষে স্থানীয় জমিদারদের তাই কোনো উৎসাহ থাকার কথা নয়। আমাদের জানা এমন কোনো তথ্য নেই যে ওহাবিরা তাদের কোনো নীলকুঠি আক্রমণ করেছে। কোনো-কোনো য়ুরোপীয় নীলকরদের সম্পর্কে তাদের ছিল তীব্র বিদ্বেষ আর আক্রোশ। কারণ কিন্তু নীলচাষ নয়। প্রধান কারণ, এ কয়েকজন নীলকর ওহাবিদের দমনের জন্য জমিদার আর সরকার পক্ষকে নানাভাবে সাহায্য করেছিল।[৩৮] কিন্তু তা ওহাবি প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হবার পরে ঘটেছে। "দাড়ির জরিমানা"-র সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র যোগ নেই।

ওহাবিদের কার্যকলাপ কি জমিদারের এমন কোনো আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যার জন্যে তাদের এ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হয়? কৃষ্ণদেব রায় বা অন্য কেউ সরকারের কাছে এ ধরনের কোনো নালিশ করে নি। ফরাজিরা জমিদারদের কোনো-কোনো আবওয়াবের যৌক্তিকতা মানে নি, এবং এক-জোট হয়ে জমিদারদের সেগুলি দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ওহাবিদের ক্ষেত্রে এরকম কিছু ঘটে নি।

"দাড়ির জরিমানা"-র জন্য জমিদারের কোনো ধর্মীয় মনোভাবও সম্ভবত ছিল না। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেই ওহাবিদের প্রচার সীমাবদ্ধ ছিল। গোড়ার দিকে তারা এমন কিছু করে নি, যাতে হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত লাগতে পারে। গোহত্যা, মন্দিরের শুচিতানাশ ইত্যাদি অনেক পরের ঘটনা। জমিদারদের সম্পর্কে ওহাবিদের তিক্ততা তখন চরমে উঠেছে।

আসলে এ জরিমানা গ্রামীণ সমাজে ওহাবিদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব খর্ব করার জন্য জমিদারের একটা কৌশল মাত্র; কারণ, নূতন ধর্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ, গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে প্রখরভাবে সচেতন, আত্মবিশ্বাসে অনুপ্রাণিত ওহাবিদলের প্রভাব গ্রামে জমিদারের চিরাচরিত আধিপত্যের নৈতিক ভিত্তি শিথিল করে দিচ্ছিল। ক্ষমতামদমত্ত পরাক্রান্ত জমিদারের পক্ষে এ ধরনের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির অস্তিত্ব বরদাস্ত করা সহজ ছিল না।

কী এমন ঘটেছিল, যাতে জমিদার এতখানি বিপন্ন বোধ করছিল? গোড়ার দিকে ওহাবিদের ধর্মপ্রচারে শঙ্কিত হবার মতো কিছু ছিল না। কিন্তু কয়েকটা ঘটনায় জমিদারেরা সতর্ক হল।

ঘটনাগুলির বিস্তারিত বিবরণ মেলে না। নানা জায়গায় এসমস্ত বিক্ষিপ্ত ঘটনার উল্লেখ থেকে এ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করা সম্ভব। ওহাবি মতবাদ প্রচারের সঙ্গে এ ঘটনাগুলি সম্পৃক্ত। প্রধানত

ওহাবি প্রচারকদের সঙ্গে সনাতনপন্থী মুসলমানদের সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই সেগুলি ঘটেছে। ওহাবি বিদ্রোহের কারণ-সংক্রান্ত সরকারি অনুসন্ধানে এ সম্পর্কে কিছু-কিছু ঘটনা জানা গিয়েছিল।

ওহাবি নেতাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, সংঘবদ্ধ প্রচার ছাড়া ইসলামের আদি আদর্শ থেকে বিচ্যুত মুসলমানদের নূতন ধর্মমতে উদ্‌বুদ্ধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এ প্রচার ঐতিহ্যপন্থী সাধারণ মুসলমানের পছন্দসই ছিল না। এর কারণ এ নয় যে নূতন মতের দার্শনিক জটিলতা তাদের কাছে সহজবোধ্য ছিল না। প্রধান কারণ, দীর্ঘদিনের ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান অত দ্রুত বর্জন করা কঠিন ছিল। পরিবর্তনবিরোধিতার এ মানসিকতা ওহাবি প্রচারকদের অসহিষ্ণু করে তোলে। এ নিয়ে স্থানীয় মুসলমানদের সঙ্গে তাই তাদের বচসা, মনোমালিন্য ঘটত। সনাতনপন্থীদের বিশ্বাস, রীতি-নীতি, আচার সম্পর্কে প্রচারকদের প্রকাশ্য সমালোচনা বা কটূক্তি অনিবার্যভাবে তিক্ততার সৃষ্টি করে। ফরিদপুর অঞ্চলে ফরাজিরা নিজেদের ধর্মমত প্রচারের জন্য মাঝে-মাঝে জোর-জুলুমেরও আশ্রয় নিত। এ নিয়ে আদালতে মামলাও হয়েছে। ওহাবিদের সম্পর্কে এ ধরনের অভিযোগ কিন্তু হয় নি। মতবিরোধ, বচসা, এর ফলস্বরূপ তিক্ততা—এই যা ঘটত।

কয়েকটা ক্ষেত্রে এ তিক্ততা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, কেউ-কেউ জমিদারের কাছে নালিশ করে, এবং বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য তাকে হস্তক্ষেপ করতে বলে। গ্রামের নানা বিবাদ-বিসংবাদে জমিদারের এ ধরনের সালিশি একান্তই স্বাভাবিক ঘটনা ছিল। ওহাবিরা জমিদারের এ হস্তক্ষেপ কিভাবে নিয়েছিল, এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায় না। খুব সম্ভবত, তারা ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে জমিদারের এ একতিয়ার স্বীকার করে নি। প্রজাদের নিঃশর্ত আনুগত্য পেতে অভ্যস্ত জমিদার ওহাবিদের এ আচরণে অপমানিত বোধ করল। কোনো-কোনো জমিদার তাই শাস্তি হিসেবে ওহাবিদের জরিমানা করে। অন্যভাবে ওহাবিদের হেনস্তা করার চেষ্টা করে।

বিশেষ কায়দায় দাড়ি রাখা ওহাবিদের ধর্ম-বিশ্বাসের একটা অঙ্গ বলে এ জরিমানাকে তারা তাদের ধর্মের উপর প্রত্যক্ষ আঘাত বলে গণ্য করল। ১৮৩০ সালের অগস্ট পর্যন্ত তারা কিন্তু আদালতের কাছে এ বিষয়ে কোনো নালিশ করে নি। এ মামলাটাও ১৮৩১ সালের জুলাই মাসে খারিজ হয়ে যায়। সম্ভবত এর ফলেই মোটামুটি এ সময় থেকেই অন্যান্য জমিদারেরাও এ জরিমানা আদায়ে উদ্যোগী হয়। উপলক্ষ আগের মতোই—জমিদারের কাছে ওহাবি-বিরোধী মুসলমানদের নালিশ। উল্লেখযোগ্য এই যে, যে জমিদারের দাবি থেকে ওহাবিদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের সূচনা হয় বলা যেতে পারে, তার কাছে এ অজুহাতও ছিল না।[৩২] পুড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় এ ধরনের নালিশের জন্য অপেক্ষাই করল না। সম্ভবত, তার ধারণা ছিল, ওহাবিদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব খর্ব করতে হলে এখনই তাকে হস্তক্ষেপ করতে হবে।

কৃষ্ণদেব ধরেই নিয়েছিল, ওহাবিরা স্বেচ্ছায় এ জরিমানা দেবে না। যখন তার পেয়াদাদের তারা মেরে তাড়িয়ে দিল, তার এ বিষয়ে আর কোনো সংশয় রইল না। দুর্বিনীত প্রজাদের শায়েস্তা করার চিরাচরিত নীতিই সে নিল। লাঠিয়াল বাহিনী পাঠিয়ে জরিমানা আদায়ের চেষ্টা করল। সংঘবদ্ধ ওহাবিদের সঙ্গে সংঘর্ষ তাই অনিবার্য হল। জমিদারের দলবল একটা মসজিদও পুড়িয়ে দিল।

মসজিদ পোড়ানোর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। সম্ভবত জমিদারের ধারণা ছিল, ওহাবিদের জমায়েত আর শলাপরামর্শের একটা প্রধান কেন্দ্র এ মসজিদ পুড়িয়ে দিলে তাদের সংগঠন বেশ কিছুটা দুর্বল হবে।

কয়েকটা ঘটনা না ঘটলে ওহাবিদের সঙ্গে

জমিদারের এ ক্ষমতার লড়াই সম্ভবত তাদের সংগঠিত প্রতিরোধে রূপান্তরিত হত না। প্রথমত, মসজিদ পোড়ানোর প্রতিবাদে স্থানীয় প্রশাসনের কাছে ওহাবিদের আরজিতে কোনো ফল হল না। এ ধরনের সংঘর্ষে জিলার শাসন কর্তৃপক্ষ কী ব্যবস্থার নির্দেশ দেবেন, তা প্রধানত নির্ভর করত থানা-দারোগার মতামতের উপর। ওহাবি-বিরোধীরাই মসজিদ পুড়িয়েছে—জমিদারের এ ভাষ্য দারোগা রামরতন চক্রবর্তী সত্য বলে জানাল; জমিদার পক্ষের কোনো শাস্তি হল না। সরকারি দলিল থেকে বোঝা যায়, আশেপাশে নানা প্রভাবশালী জমিদার কৃষ্ণদেবের পক্ষ নেয়। ওহাবিদের কাছে তা অজানা থাকার কথা নয়। তারা বুঝতে পারে, তাদের প্রতিরোধ শুধুমাত্র কৃষ্ণদেবের বিরুদ্ধে নয়।

মসজিদ পোড়ানোর অভিযোগ থেকে বেকসুর খালাস পেয়ে কৃষ্ণদেব অন্যভাবে ওহাবিদের দমন করতে চেষ্টা করল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আইনে খাজনা উসুল করার ব্যাপারে জমিদারদের বিপুল ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। যেমন, ১৭৯৯ সালের সপ্তম আইনে বাকি খাজনার অজুহাতে জমিদার প্রজাদের বেঁধে এনে তার কাছারির কয়েদখানায় পুরে রাখতে পারত। কিন্তু শুধুমাত্র বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য জমিদার কদাচিৎ আইনের এ বিধান প্রয়োগ করত। 'হপ্তম' (সপ্তম আইন) প্রধানত ছিল 'বেয়াদব' প্রজাদের শাসানোর অস্ত্র, বিশেষ করে যেখানে জোট বেঁধে তারা জমিদারের বিরোধিতা করত। এভাবেই কৃষ্ণদেব এ আইনকে কাজে লাগাল। তবে বেপরোয়া এ জমিদার কোনো বৈধতার ধার ধারে নি। জমিদারি ক্ষমতার অপব্যবহার কতদূর যেতে পারে, কৃষ্ণদেবের কার্যকলাপ তার একটা দৃষ্টান্ত। দুষ্কর্মের জন্য নাটের গুরু এই জমিদার এক শিখণ্ডী খাড়া করল। পরে জানা গিয়েছিল, যে দুজন ওহাবি-শিষ্যকে হেনস্তা করার জন্য এত চক্রান্ত, তারা আসলে কৃষ্ণদেবের প্রজাই নয়; এমন-কী কৃষকই নয়; পুড়া গ্রামের বাসিন্দা ছিল মাত্র। তবুও আটত্রিশ টাকা খাজনা বাকি পড়েছে, এ অজুহাতে তাদের জোর করে ধরে এনে জমিদারের কাছারিতে বেঁধে রেখে নানা ধরনের নির্যাতন করা হল।

এ জমিদারি জুলুম ওহাবি নেতারা মেনে নিল না। স্থানীয় আদালতের রায় পুনর্বিবেচনার জন্য উচ্চতর শাসন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। ওহাবিদের প্রধান নেতাদের অন্যতম গোলাম মাসুদ নিজেই দুই শিষ্যকে নিয়ে কলকাতা গেল (সেপটেম্বরের শেষ সপ্তাহ)। কিন্তু নানা কারণে এতে কোনো সুফল হল না।

খুব সম্ভবত, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের সিদ্ধান্ত কলকাতাতেই নেওয়া হয়। অন্তত সরকারি মহলের এটাই ধারণা। নিঃসন্দেহে প্রস্তুতি তখন থেকেই শুরু হয়েছিল। তেইশে অকটোবর নারকেলবাড়িয়ার এক মাতব্বর রায়ত মৈজউদ্দীন বিশ্বাসের বাড়িতে এক বড়ো জমায়েতে প্রতিরোধের কৌশল এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জমিদার কিছু একটা আঁচ করেছিল। তবে মনে হয়, সংঘর্ষ শুরু করার জন্য ওহাবিদের প্রস্তুতি যে সম্পূর্ণ তা সে বুঝে উঠতে পারে নি। ওহাবিদের ঠেকানোর জন্য উপযুক্ত কোনো ব্যবস্থা তখনও সে করতে পারে নি। ওহাবিরা এ সুযোগ নিল। নভেম্বরের ছ তারিখ সংঘর্ষ শুরু হয়।

৬·৩

মাত্র দু সপ্তাহ (৬-১৯ নভেম্বর, ১৮৩১) বিদ্রোহ স্থায়ী হয়েছিল, এর বিস্তারিত বিবরণ বর্তমান আলোচনায় প্রাসঙ্গিক নয়। বিদ্রোহীদের মানসিকতা বোঝার জন্য এর কয়েকটা বিশেষ দিক উল্লেখ করব মাত্র।

বিদ্রোহ যে সুসংগঠিত, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিদ্রোহীরা ঝোঁকের মাথায় কিছু করে নি।[৩৩] কী তারা করতে যাচ্ছে, তা তারা পরিষ্কার জানত।

গোড়ায় 'লুঠ-তরাজের' ঘটনা বিশেষ ঘটে নি। বিদ্রোহীদের একটা প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ,[৪০] প্রকাশ্য বাজারে তারা গোহত্যা করে; তার রক্ত এক মন্দিরের দেয়ালে ছিটিয়ে দেয়; আর গোরুটাকে চার-টুকরো করে কেটে মন্দিরের চারপাশে ঝুলিয়ে দেয়। পরের দিনও (৭ নভেম্বর) তারা দুটো ষাঁড়কে এ-ভাবে কাটতে যায়। দুজন ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে গ্রাম-বাসীরা বাধা দিতে গেলে ওহাবিদের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়। ব্রাহ্মণদের তারা নির্মমভাবে প্রহার করে। একজন মারা যায়। তার পরের সপ্তাহেও এ ধরনের ঘটনা কয়েকটা ঘটে। সরকারি বিবরণ-মতে, কোনো-কোনো জায়গায় বিদ্রোহীরা হিন্দুদের জোর করে মুসলমান করার চেষ্টা করে। মোটামুটি, নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত তাদের সাফল্য অব্যাহত থাকে।

জমিদার-বিরোধিতাই বিদ্রোহের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল না। রাজবিরোধী লক্ষণ ক্রমেই প্রকট হয়ে ওঠে। গোড়ায় বিদ্রোহীদের প্রধান আক্রোশ ছিল বসির-হাটের দারোগা রামরাম চক্রবর্তীর উপর। কারণ, তাদের বিশ্বাস, কৃষ্ণদেবের দুষ্কর্মের এক প্রধান সহায় ছিল এই দারোগা। অন্যান্য যেসব দারোগা তাদের নানাভাবে হেনস্তা করে, তাদের ধরার জন্যও ওহাবিরা দলবল পাঠায়।

রাজবিরোধিতা শুধু এ দারোগাদের বিনাশের চেষ্টা নয়। বস্তুত বিদ্রোহ শুরু হবার কয়েক দিনের মধ্যেই তিতু ঘোষণা করে, কোমপানির জমানার অবসান ঘটেছে,[৪১] আবার মুসলমানদের হাতে দেশের শাসনক্ষমতা ফিরে আসবে। নারকেলবেড়িয়ায় 'বাঁশের কেল্লায়' ওহাবিদের সার্বভৌমত্বের প্রতীক হিসেবে একটা পতাকাও ওড়ানো হয়েছিল।[৪২] তিতু নিজেকে "বাদশাহ" বলে ঘোষণা করে। প্রচলিত এক কাহিনী[৪৩] অনুযায়ী, মইজুদ্দীনের বাড়িতেই মহাসমারোহে তার অভিষেক হয়। 'কিংখাপমণ্ডিত সিংহাসনে' উপবিষ্ট তিতুর জয়ধ্বনি করে তার অনুগামীরা। ওহাবিরাজ পরিচালনার নানা দায়িত্ব তিতু বিশ্বস্ত এবং নিকট শিষ্যদের হাতে দেয়। সম্ভবত বাদশাহি কর্তৃত্বের অঙ্গ হিসেবে তিতু স্থানীয় নানা জমিদারের কাছে প্রয়োজনীয় রসদ পাঠানোর জন্য পরোয়ানা পাঠায়।[৪৪] ওহাবিদের বিরুদ্ধে বারাসত ও নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটদের ব্যর্থতায় তাদের এ বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয় যে ওহাবি-রাজ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

শুধুমাত্র সাংগঠনিক নৈপুণ্যই ওহাবিদের আত্ম-বিশ্বাসের প্রধান উৎস ছিল না। তাদের উপর অন্যান্য প্রভাবও সক্রিয় ছিল, বিশেষ করে নৈতিক এবং ধর্মীয় প্রভাব।

ওহাবি ধর্মমতের মধ্যেই এ নৈতিক বলের বীজ ছিল। শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আসলে তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের অঙ্গ; এটা তাই তাদের পবিত্র কর্তব্য। কথিত আছে,[৪৫] ব্রিটিশ সৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ 'বাঁশের কেল্লা'য় তিতু তার অনুগামীদের এভাবেই উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করে। তিতুর এক নিকটতম সহযোগী সাজন গাজীর গানেও[৪৬] এ বিশ্বাসের উল্লেখ আছে।

ওহাবি ধর্মমতের সঙ্গে অন্যভাবেও তাদের আত্ম-বিশ্বাসের যোগ ছিল। ওহাবিরা বিশ্বাস করত, সংকট-মুহূর্তে এক পরিত্রাতার আবির্ভাব হবে। আদি ওহাবি-মত অনুযায়ী, তাঁর প্রভাবের প্রধান উৎস তাঁর চারিত্রিক শুচিতা, ইসলাম-শাস্ত্রে তাঁর সুগভীর জ্ঞান, তাঁর সত্যপরায়ণতা, উদ্দেশ্য সাধনে তাঁর অবিচল নিষ্ঠা। এসব গুণেই পরিত্রাতা তাঁর অনুগামীদের অনুপ্রাণিত করবেন। অতিপ্রাকৃত কোনো ক্ষমতা তাঁর ওপর আরোপিত হয় নি।

কিন্তু নেতার অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকার সম্পর্কে বিশ্বাস ক্রমেই ওহাবি সংগঠনকে প্রভাবিত করে। এর জন্ম ১৮৩১ সালের বিদ্রোহের আগেই হয়েছে। শিখ-ওহাবি যুদ্ধে বালাকোটে (মে, ১৮৩১) ওহাবি নেতা সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর ঘটনা তাঁর শিষ্যরা মেনে নেয় নি। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যু ঘটে নি। কারণ তাঁর মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায় নি; তারা বলত, কোনো পরম সংকটের সময় তাঁর পুনরাবির্ভাব ঘটবে; ফলে তাদের জয় সুনিশ্চিত হবে।[৪৭]

১৮৩১-এর আন্দোলনে এ অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকার সম্পর্কে ওহাবিদের ধারণা অনেক ব্যাপক। এ এক ধরনের জাদুশক্তিতে বিশ্বাস। তাদের বিশ্বাস ছিল, ওহাবিদের সব হাতিয়ার মন্ত্রপূত; ওহাবি যোদ্ধাদের এ জাদুময় বর্ম ব্রিটিশের কোনো অস্ত্রশস্ত্র ভেদ করতে পারবে না। ব্রিটিশদের কামান-বন্দুক তাদের তৈরি বাঁশের কেল্লায় প্রতিহত হয়ে ফিরে আসবে; তারা ব্রিটিশদের গোলাগুলি সঙ্গে-সঙ্গে লুফে নিয়ে গিলে নেবে।

এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের বিশ্বাসের কথা ওহাবিরা প্রকাশ্যেই বলত। তিতুমীরের বিদ্রোহের উপর নানা কবিতায় এর উল্লেখ আছে; অবশ্য কোনো-কোনো ক্ষেত্রে কবিতার সুর তীব্র শ্লেষাত্মক।[৪৮] ওহাবিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান যারা চালিয়েছিল, এসব কথা তাদের কানেও আসে। একজনের বিবরণে[৪৯] আছে, ওহাবিরা যুদ্ধের সাধারণ সতর্কতামূলক কৌশলের ধার ধারত না। নিশ্চিত বিনাশ জেনেও যেভাবে তারা ব্রিটিশ সৈন্যের একেবারে কাছে বেপরোয়াভাবে এগিয়ে আসছিল, তা তাকে বিস্মিত করেছিল। নদীয়া বিভাগের কমিশনার জানতে পারেন, কী ভাবে ওহাবিদের বিরুদ্ধে আলেকজাণ্ডারের ব্যর্থতার পর তিতুমীর ও অন্যান্য ফকিররা তাদের অপরাজেয়তার কথা সবাইকে বোঝাচ্ছিল।[৫০] 'আগ্নেয়াস্ত্র তাদের কখনও কোনো ক্ষতি করতে পারবে না; সিপাহীদের ছোঁড়া গোলা তারা গিলে খেয়ে নিয়েছে।' নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট স্মিথ লিখছেন: 'তাদের পরিচালনায় ছিল দু-তিনজন ফকির। আক্রমণকারীরা শক্তসমর্থ, ধর্মান্ধ যুবা; স্পষ্টত তাদের ধারণা ছিল, তারা মন্ত্রশক্তিতে সুরক্ষিত; কী নির্ভীক, দৃঢ়সংকল্প চিত্তে তারা আমাদের গোলাবারুদের আওতার মধ্যে এগিয়ে আসছিল; দু-একজনের মৃত্যুতেও তারা পেছিয়ে যায় নি···লম্বা লাঠি আর কিছু তলোয়ার ছাড়া তাদের আর কী অস্ত্রশস্ত্র ছিল আমি বলতে পারি না; সম্ভবত আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদল থেকে তারা কয়েকটা গাদা-বন্দুক ছিনিয়ে নিতে পেরেছিল; আর তাদের ছিল এক ধরনের দিশী হাতিয়ার, যেগুলি ডাকাতরা সচরাচর ব্যবহার করে।'[৫১]

মনে হয়, তিতুমীর নিজে এ শক্তির অধিকারী বলে দাবি করত না। তার অনুগামীদের মধ্যে কয়েক-জন সিদ্ধ ফকির নাকি ছিল যেমন ফকির মিস্কান। তারাই সম্ভবত এ ধারণা প্রচার করে যে, ওহাবিরা অপরাজেয় জাদু শক্তির অধিকারী।

৬'৪

আন্দোলনের যে দুটি বিশিষ্ট প্রবণতার কথা উল্লেখ করেছি—জমিদার-বিরোধী কোনো-কোনো হিংসার ধর্মীয় রূপ, এবং ক্রমবর্ধমান রাজবিরোধিতা—সে সম্পর্কে দুটি প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক হবে। প্রথম প্রশ্ন ধর্মীয় প্রভাবের গুরুত্ব এবং তাৎপর্য এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন রাজ-বিরোধিতার পটভূমিকা সম্পর্কে।

কোনো-কোনো ঐতিহাসিক[৫২] মনে করেন, বিদ্রোহীদের ধর্মচেতনা অবশ্যই স্বীকার্য; কিন্তু এ ধর্ম-বোধ সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাবোধে রূপান্তরিত হয় নি, এর ফলে নিম্নবর্গের হিন্দু কোথাও নিম্নবর্গের মুসলমানদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় নি; বা এ আন্দোলনের ফলে নিম্নবর্গের মুসলমানরা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে শুধুমাত্র গোষ্ঠীগত বা সাম্প্রদায়িক সংহতি রক্ষায় ব্রতী হয় নি; কৃষক হিসেবে ওহাবিদের শ্রেণীচেতনাই আন্দোলনের মূল গতিপ্রকৃতিকে নির্ধারিত করেছে।

এ মতের সমালোচনায় কোনো-কোনো ঐতিহাসিক বলেন, এ আন্দোলনে ওহাবি কৃষকদের শ্রেণীচেতনা একান্তই গৌণ; সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বা গোষ্ঠীচেতনা অন্য সব-কিছুকে আচ্ছন্ন করেছে; কৃষকশ্রেণীর সামগ্রিক স্বার্থরক্ষায় ওহাবিদের কোনো উদ্যোগ ছিল

না; নেতারা এক ক্ষুদ্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর কথা সব সময় ভেবেছে; ভিন্ন ধর্মমতের কৃষকদের সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র সহিষ্ণুতা ছিল না; নানা জোরজুলুমের আশ্রয় নিয়ে নিজেদের দল ভারী করার জন্য ওহাবি-দের চেষ্টা বরং হিন্দু এবং মুসলমান, দুই ধর্মের কৃষক-দের আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে।[৫৩]

আসল সত্য কী? ওহাবি-জমিদার সংঘর্ষের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা ধর্মের ভূমিকা আগেই আলোচনা করেছি। এখানে আলোচ্য, ওই বিশেষ ধরনের ধর্মীয় চেতনা কি কৃষক হিসেবে ওহাবিদের চেতনার সঙ্গে সংগতিহীন?

শ্রেণীচেতনার অভাব বোঝাতে বলা হয়েছে, সমগ্র কৃষকশ্রেণীর কথা ভাবা হয় নি; এমনকী, ওহাবিদের নানা কার্যকলাপ অনেক কৃষককে আন্দোলন থেকে সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু আঞ্চলিক সমগ্র কৃষক-গোষ্ঠীর স্বার্থ সম্পর্কে সচেতনতা কৃষকদের শ্রেণী-চেতনার একটিমাত্র লক্ষণ নয়। এ চেতনার একটা মূল লক্ষণ ক্ষমতাসীন জমিদারগোষ্ঠীর সঙ্গে বিরোধ সম্পর্কিত চেতনা। নির্দিষ্ট কোনো অর্থনৈতিক প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সে বিরোধ না-ও ঘটতে পারে। প্রধানত তা জমিদারের প্রবল ক্ষমতা-প্রয়োগের সঙ্গে সমপৃক্ত। এ ক্ষমতা শুধুমাত্র প্রজাদের থেকে খাজনা আদায়ের জন্য আইনসিদ্ধ ক্ষমতা নয়। খাজনা আদায় দিয়ে তার শুরু; কিন্তু বহু বিচিত্র রূপে তার বিস্তার এবং প্রকাশ।[৫৪] এর অজস্র দৃষ্টান্তের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে কৃষকদের শ্রেণীচেতনা গড়ে ওঠে। কোনো বিশেষ অবস্থায় সে চেতনা ক্ষুদ্র কৃষক-গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে; ধর্মীয় বা অন্য কোনো কারণে তার প্রসার ব্যাহত হতে পারে। কিন্তু তাই বলে তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।

ওহাবি আন্দোলনে এ চেতনা কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? আমরা আগে দেখেছি, ওহাবিদের ধর্ম-বিশ্বাস কী ভাবে জমিদারের সঙ্গে তাদের বিরোধ সৃষ্টি করেছে। যে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের ধর্মমতপ্রচারে বাধা দিয়েছে, তাদের সঙ্গে ওহাবিদের সম্পর্ক জমিদার-প্রজার; তারা কেউ সামাজিক শ্রেণী-বিন্যাস-বহির্ভূত নয়। তা ছাড়া, শুধুমাত্র খেয়ালের বশে বা উগ্র হিঁদুয়ানির জন্য তারা ওহাবি-প্রভাব বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয় নি। এর আসল কারণ, ওহাবিদের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি তাদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। ওহাবি-প্রভাব খর্ব করার জন্য জমিদারের উপায়গুলিও শ্রেণী হিসেবে তাদের প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত। প্রথমে আবওয়াব বসিয়ে তারা চেষ্টা করল, যাতে মুসলমান প্রজারা তিতুর দলে যোগ না দেয়। এ আবওয়াব দিতে অস্বীকার করায় ক্রুদ্ধ জমিদার অবাধ্য প্রজাদের শায়েস্তা করার জন্য লাঠিয়াল পাঠাল। এও প্রজাপীড়নের এক জমিদারি কায়দা। ওহাবিরা তাতেও বশে এল না দেখে জমিদার 'হুপ্তম' আইনের যথেচ্ছ অপব্যবহার করতে থাকে। তবুও বিশেষ ফল হল না বলে জমিদার পাশাপাশি অঞ্চলের জমিদার, থানার পুলিশ-দারোগা, এবং পরাক্রান্ত নীলকরদের ওহাবি-দমনের কৌশলের সঙ্গে যুক্ত করতে চাইল।[৫৫]

ধর্মগোষ্ঠী হিসেবে ওহাবিদের স্বাতন্ত্র্যবোধ এভাবে তাদের শ্রেণীচেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। গোড়ার দিকে ওহাবিদের ধারণা ছিল, তাদের ধর্মমত প্রচারের সঙ্গে জমিদারি কর্তৃত্বের কোন বিরোধ নেই।[৫৬] তিতুর বিদ্রোহের ওপর সমসাময়িক কোন কোন কবিতায়[৫৭] তাদের এ মনোভাবের পরিচয় মেলে। কিন্তু আস্তে-আস্তে জমিদারের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

জমিদারবিরোধী হিংসার ধর্মীয় রূপের ব্যাখ্যা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে, কারণ ওহাবিদের বিরুদ্ধে শ্রেণীচেতনার সঙ্গে সম্পর্কহীন সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা-বোধের যে অভিযোগ, তার প্রধান ভিত্তি এ ধরনের হিংসার ঘটনা।

আসলে এ ধরনের ঘটনা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য দুর্লভ। এ অভিযোগের সপক্ষে সচরাচর যেসব ঘটনার[৫৮] উল্লেখ করা হয় তাদের সত্তাব্যতা বিচার

বর্তমান আলোচনায় সম্ভব নয়। তবে কোনো-কোনো কাহিনীকার বা ইতিহাসকারের সিদ্ধান্ত সম্ভবত ভ্রান্ত।[৫৯] বর্তমান আলোচনা তাই কয়েকটা গ্রহণ-যোগ্য তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ: যেমন কয়েকটা গোহত্যার ঘটনা, অন্তত একটি মন্দিরের শুচিতানাশ এবং কয়েকজন ব্রাহ্মণহত্যা। যদি অন্যস্থানের ঘটনার যথার্থতা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়, তাহলে বর্তমান আলোচনার সিদ্ধান্তও পরিবর্তন করতে হবে।

আমরা ধরে নিচ্ছি, ওহাবিদের হিংসা প্রধানত জমিদার, এবং তাদের প্রজা-পীড়ন-ব্যবস্থার সঙ্গে সমপৃক্ত নানা জনের বিরুদ্ধে। বহু কৃষকের ব্যাপক বিদ্রোহের সময় হিংসার এ মূল রূপের হেরফের হতেই পারে। এ প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণদেব বা অন্যান্য ওহাবি-বিরোধী জমিদারেরা হিন্দুধর্মের প্রচার বা প্রসারের জন্য সম্প্রতিকালে কোনো উদ্যোগ নেয় নি; তাদের সামাজিক প্রতিপত্তি বা প্রাধান্য-বৃদ্ধির জন্য তারা অন্য কোনো কাজও করে নি, যেমন মন্দির-বানানো। যদি তাই হত, তাহলে (জমিদারের এসব উদ্যোগ ও কাজকে সচেতনভাবে বাধাদানের মধ্য দিয়ে) কৃষকদের জমিদার-বিরোধী মানসিকতার একটা সম্ভাব্য প্রকাশ ঘটত। যেমন, নূতন বানানো মন্দির জমিদারের নূতন কর্তৃত্বের প্রতীক; তাই প্রতিবাদী কৃষকদের আক্রোশ মন্দিরের ক্ষতিসাধনের নানা চেষ্টার মধ্যে হয়তো আত্মপ্রকাশ করত।[৬০]

ওহাবিদের হিংসার ধর্মীয় রূপ তাই এভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে না। এক বিশেষ ধর্মভুক্ত জমিদার শ্রেণীর প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ভিন্নধর্মী কৃষকগোষ্ঠীর আক্রোশ জমিদারের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সমপৃক্ত নানা প্রতিষ্ঠান বা বস্তুর বিরুদ্ধে প্রকাশ পেতে পারে। ওহাবিদের ক্ষেত্রে একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হল এই: জমিদার-বিরোধিতার ধর্মীয় রূপ জমিদারের ওহাবি-বিরোধী কার্যকলাপের আদলেই গড়ে উঠেছে। বলাই বাহুল্য, এ দুই ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণসম্পর্কের কোনো অনড় যান্ত্রিক নিয়ম খোঁজার চেষ্টা অর্থহীন। জমিদারের ওহাবি-পীড়নের একটা রূপ তাদের ধর্মের ওপর সরাসরি আঘাত—যেমন, 'দাড়ির জরিমানা', মসজিদ পোড়ানো ইত্যাদি। কথিত আছে, কৃষ্ণদেব প্রকাশ্যে গোহত্যাও নিষিদ্ধ করেছিল। অনেক হিন্দু জমিদারিতে এ নিয়ম চালু ছিল; তবে কৃষ্ণদেব বা অন্যান্য জমিদার এরকম কোনো ব্যবস্থা নিয়েছিল কিনা, তা সরকারি দলিল থেকে জানা যায় না।

জমিদারি-প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ওহাবি প্রতিরোধের একটা রূপ তাই জমিদারের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত। যদি গোহত্যা সম্পর্কিত কৃষ্ণদেবের সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞা সত্য ঘটনা হয়, তাহলে পুড়া বাজারে ওহাবিদের গোহত্যা তাদের প্রতিবাদের একটা অঙ্গ বলে গণ্য করা যায়। যদি এ নিষেধাজ্ঞা সত্য ঘটনা নাও হয়, তাহলেও প্রকাশ্যে গোহত্যা এ প্রতিবাদের একটা সম্ভাব্য রূপ, কারণ হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে গোরুর একটা বিশেষ স্থান আছে; মন্দিরের শুচিতা-নাশ সম্ভবত মসজিদ পোড়ানোর প্রতিহিংসা। রাম-রাম চক্রবর্তীর ওপর নির্যাতন ব্রাহ্মণ হিসেবে নয়, জমিদারের কুকর্মের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত দারোগা হিসেবে।

তবে ঘটনা যেভাবে শুরু হয়, তার চরিত্র পরবর্তী পর্যায়ে সমান নাও থাকতে পারে। পরে হয়তো ওহাবিরা এমন কিছু করেছিল, যার মধ্যে সংকীর্ণ ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রভাব ছিল। প্রাথমিক প্রেরণা থেকে এ বিচ্যুতিও ঐতিহাসিককে ব্যাখ্যা করতে হবে। আগেই বলেছি, এসব ঘটনার প্রচলিত অনেক বিবরণ স্পষ্টত পক্ষপাতদুষ্ট।

তা ছাড়া, হিংসার ধর্মীয় রূপ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা যেন না ভুলে যাই, তার আরো নানা রূপ ছিল। যেখানে ধর্ম শত্রুর ক্ষমতার ভিত্তি বা রূপের সঙ্গে সমপৃক্ত নয়, সেখানে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ওহাবিদের সংঘবদ্ধ প্রয়াস একান্তভাবে নগ্ন ক্ষমতার লড়াই। জয়ের জন্য সেখানে প্রয়োজন ঐক্য এবং সংহতি, সামরিক ক্ষমতা (বস্তুত

অতি সাধারণ ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র; বহুক্ষেত্রে ক্ষিপ্র গতিতে লাঠিচালনার ক্ষমতা), প্রতিরোধের নিপুণ কৌশল, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব। ধর্মীয় রূপে হিংসার ভূমিকা এখানে ক্রমেই গৌণ হয়ে আসে।

ওহাবি আন্দোলনে রাজবিরোধিতা কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? কেউ-কেউ[৬১] মনে করেন, এ রাজবিরোধিতার মূল প্রেরণা শত্রুর বিরুদ্ধে 'জেহাদের' মনোভাব: বলা হয়েছে, এটা ওহাবি মতবাদের একটা প্রধান অঙ্গ। অন্য একটা মতানুযায়ী[৬২], 'জেহাদি' মানসিকতার কোনো ভূমিকাই ছিল না; ব্রিটিশদের সামরিক পরাক্রম সম্পর্কে তিতু সম্পূর্ণ সচেতন ছিল; তাই হাজার কয়েক অনুগামী নিয়ে সে ব্রিটিশরাজকে উচ্ছেদ করার কথা ভেবেছিল, তা ভাবাই যায় না; তা ছাড়া, যে ওহাবি-গোষ্ঠীর সঙ্গে তিতুর যোগ, তাদের প্রধান সংঘর্ষ শিখদের বিরুদ্ধে; ইংরেজ-বিরোধী কোনো ফতোয়া তারা জারি করে নি।

এ দুই ব্যাখ্যার বিচার প্রসঙ্গে আমাদের একটা কথা মনে রাখা দরকার: এ বিষয়ে কোনো অনিশ্চয়তা নেই যে তিতু কোম্পানি-রাজের অবসান ও নিজেকে বাদশা বলে ঘোষণা করেছিল। আমাদের বিচার্য প্রশ্ন: রাজবিরোধিতার সিদ্ধান্ত তিতু কোন্ সময়ে, এবং কেন নিয়েছিল?

জেহাদের মানসিকতায় উদ্‌বুদ্ধ না হলে রাজ-বিরোধিতা সম্ভব নয়, এটা ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত। আবার ব্রিটিশ শক্তি সম্পর্কে সচেতনতা রাজ-বিরোধিতার পথ থেকে ওহাবিদের অনিবার্যভাবে নিবৃত্ত করবে, এটাও সঠিক সিদ্ধান্ত নয়।

ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারের জন্য তিতুর প্রাথমিক কর্মসূচীতে রাজশক্তি উচ্ছেদের কোনো ধারণাই ছিল না। তার মূল লক্ষ্যের কথা আগেই আলোচনা করেছি। বলা হয়েছে, নানা ব্রিটিশ নীতির ফলস্বরূপ মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ তিতুকে গভীর-ভাবে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু এ অসন্তোষ সম্পর্কে তিতুর সচেতনতা থাকলে তা তার মূল লক্ষ্যে প্রতি-ফলিত হয় নি। এ অসন্তোষ দূর করার উপায় হিসেবে সে ব্রিটিশ-রাজের অবসানের কথা ভেবেছিল, এমন কোনো তথ্য জানা নেই। তিতু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত সংগ্রামের কথা ভেবেছিল, এটা বানানো গল্প বলেই মনে হয়।[৬৩]

তিতুর বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি আগেই আলোচনা করেছি। গোড়ার দিকে সম্পূর্ণ আক্রোশ ছিল জমিদারের বিরুদ্ধে। তিতুর এ ধারণা ক্রমেই দৃঢ় হয় যে, স্থানীয় প্রশাসন জমিদারের স্বেচ্ছাচার বন্ধ করার জন্য কিছুই করবে না। একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তার বিশ্বাস ছিল, হয়তো কিছু প্রতিবিধান মিলবে। বিদ্রোহ শুরু হবার পর সে কোমপানি জমানার অবসান ঘোষণা করে; কিন্তু কয়েকজন কুখ্যাত দারোগাদের নির্যাতন করা ছাড়া বিদ্রোহীরা গোড়ায় বিশেষ কিছু করে নি। বস্তুত আন্দোলন দমানোর জন্য প্রশাসনের নানা ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া হিসেবেই ওহাবিরা ক্রমে ব্রিটিশ-বিরোধী সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। তখন ওহাবি-বিরোধী জোট যেমনভাবে গড়ে উঠেছে, তাদের পক্ষে এ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভব ছিল না। তখন কৃষকদেরই শুধুমাত্র প্রতিপক্ষ নয়; প্রতিবেশী নানা জমিদার তার পক্ষ নিয়েছে; তার সঙ্গে আর যোগ দিয়েছে জঁাদরেল কয়েকজন নীলকর। তারাই সম্ভবত সরকার পক্ষকে ওহাবিদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছে; ওহাবিদের হিংসার কাজকে অতিরঞ্জিত করে বলেছে।

স্পষ্টত সরকার পক্ষ প্রথম থেকেই ওহাবিদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করত। নদীয়া বিভাগের কমিশনারের মতে,[৬৪]—বিদ্রোহ 'ধর্মোন্মাদ' এক দলের কাণ্ড; তিতু 'সর্দার ডাকাত'। বিদ্রোহ যে ছড়াতে পেরেছে, তার একটা প্রধান কারণ, পাশাপাশি অঞ্চলে অনেক কুখ্যাত ডাকাত এদের দলে ভিড়ে গেছে।[৬৫] নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট এক ঢালাও হুকুম জারি করে বলে, ওহাবিদের দেখলেই যেন ধরা হয়। এ আদেশ স্পষ্টত এত অযৌক্তিক যে এ পরোয়ানা তুলে নেবার জন্য বড়লাট ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্দেশ দেয়।[৬৬]

নদীয়া এবং বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটদের সামরিক অভিযান শুরু হবার পর তিতুর কোনো সংশয় থাকল না, তার প্রধান লড়াই এখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। এদের বিরুদ্ধে তিতুর সাফল্য তার দলকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করে। আগেই বলেছি, তাদের মধ্যে তখন এ বিশ্বাস জন্মায়, তাদের শরীর মন্ত্রশক্তিতে সুরক্ষিত।

তাই ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করার সিদ্ধান্ত যে আনুষঙ্গিক সব দিকের চুলচেরা বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন কোনো কথা নেই। ব্রিটিশশক্তির প্রবলতা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা থাকলে তাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা মূঢ়তা মাত্র—এটা আমাদের বিচার নয়। সমসাময়িক কালের অনেক তিতু-বিরোধী পক্ষও তিতুর অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকার সম্পর্কে কথাবার্তাকে 'বুজরুগী' বলে ব্যঙ্গ করত।[৬৭] কিন্তু বিদ্রোহী কৃষকদের ধ্যানধারণা সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে গড়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিকের কাজ—এ ধারণাগুলিকে চিহ্নিত করা; ভিন্ন জনের যুক্তির আলোকে তাদের বিচার করা নয়।

৬·৫

ফরাজিদের উৎপত্তিও এক প্রতিবাদী ধর্মীয় গোষ্ঠী হিসেবে। এর প্রতিষ্ঠাতা হাজী শারিয়াতুল্লা আকস্মিক-ভাবে এ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয় নি। তার জীবনের প্রায় কুড়ি বছর কেটেছে খোদ মক্কায়; দ্বিতীয়-বার মক্কা সফরের পর হাজী দেশে ফেরে ১৮২০ সালে। বৃহত্তর 'ইসলাম পুনরুজ্জীবন' আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে তার ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠেছে। পূর্ববাংলার ওহাবি আন্দোলনের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের প্রমাণ আছে। ওহাবিদের মতো তার প্রচারেরও মূল কথা—স্থানীয় মুসলমানদের ইসলামের আদি শুদ্ধ সরল জীবনযাত্রায় ফিরে যেতে হবে; নূতন ধর্মবোধ শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির নৈতিক উৎকর্ষসাধনের প্রশ্ন নয়; তা নূতন সমাজ-সৃষ্টির অপরিহার্য উপকরণ। ফরাজি আন্দোলন বুঝতে গেলে নূতন ধর্মীয় বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত এ গোষ্ঠীর সাম্প্রতিক উদ্ভবের কথা বিশেষ-ভাবে মনে রাখতে হবে। পরে পরে এ মূল বিশ্বাসের উদ্দীপনা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসে।

ওহাবিদের ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও মূলত এক প্রতিবাদী ধর্ম-আন্দোলন অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে।

জমিদার, নীলকর ইত্যাদি শক্তিগোষ্ঠীর সঙ্গে ফরাজিদের সংঘর্ষের কারণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ফরাজিদের মূল লক্ষ্য ছিল জমিদারি শোষণ-ব্যবস্থা ও নীলচাষপ্রথার সম্পূর্ণ অবসান ঘটানো। এ সিদ্ধান্তের সমর্থনে শরীয়াতুল্লার পুত্র দুদু মিঞার একটা উক্তির উল্লেখ করা হয়। দুদু বলত,[৬৮] জমি ভগবানের দান; এতে জমিদারের ব্যক্তিগত মালিকানা ভগবৎ-বিধান-বিরোধী; তাই অসংগত। সমসাময়িক এক সরকারি প্রতিবেদনেও ফরাজিদের এ 'বিশেষ প্রিয় বিশ্বাসের' উল্লেখ আছে। এজন্যই নাকি তারা কোনো ধরনের খাজনা দেওয়াকে অপছন্দ করত এবং সে সুদিনের কথা বলত, যখন কোনোরকম খাজনা দেওয়ার দায় থাকবে না।

এ ধরনের ধারণা সম্ভবত ফরাজিদের অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু জমিদার আর নীলকরদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের যেসব ঘটনা আমাদের জানা আছে, সেগুলি এ ধারণা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। জমিদারিপ্রথা ও নীলচাষপ্রথার অবলোপ ফরাজিদের লক্ষ্য ছিল না। তাদের লক্ষ্য একান্তই সীমিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংঘর্ষ ক্রমেই অনিবার্য হয়ে পড়ে।

ওহাবিদের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল, এখানেও মূলত তা-ই ঘটেছে। ফরাজিদের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে এ সংঘর্ষের প্রত্যক্ষ যোগ। আমাদের জানা তথ্যের ভিত্তিতে এ যোগকে পরিষ্কারভাবে বোঝানো যায়।

মুসলমান সমাজের কোনো-কোনো গোষ্ঠীর প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সাধারণ অবস্থার মুসলমান কৃষক, ভূমিহীন চাষি, দুঃস্থ জোলা ইত্যাদির মধ্যে ফরাজি

মতবাদ যে ক্রমেই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জমিদারের প্রতিপত্তি এতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে খর্ব হয়।

এর একটা কারণ আগেই উল্লেখ করেছি। দীর্ঘদিনের সংস্কার, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠানকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা সাধারণ মুসলমানদের কাছে অত সহজ ছিল না। অথচ ফরাজি নেতাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এগুলো বাদ না দিলে খাঁটি মুসলমান হওয়া অসম্ভব। কারণ, তাদের মতে, এগুলি 'গর্হিত' (sinful); আদি ইসলামের নীতির সঙ্গে সংগতিহীন। অসহিষ্ণু নেতারা তাই মাঝে-মাঝে এ ধরনের আচার-অনুষ্ঠানকে প্রকাশ্যে নিন্দা করত; তাদের মতবাদ প্রচারের জন্য জোর-জুলুমেরও আশ্রয় নিত; সনাতনপন্থী কোনো-কোনো মুসলমানের বাড়িঘরও নাকি জ্বালিয়ে দিত। ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে [ঢাকা জিলা নিবাসী] শরীয়াতুল্লার দুই সাগরেদকে এ ধরনের অভিযোগে কঠোর সাজাও দেওয়া হয়।[৬২] মাঝে-মধ্যেই এ ধরনের ঘটনা ঘটত। ব্যাপক এক সংঘর্ষ ঘটে ১৮৩৯ সালে। সরকারি বিবরণ-মতে, শরীয়াতুল্লার মৃত্যুর পর ফরাজিগোষ্ঠীর নূতন সর্ববাদিসম্মত নেতা তার পুত্র দুদু মিঞা জোর-জার করে দলভারী করার চেষ্টা করে। নূতন নেতার মনোনয়ন উপলক্ষে ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশাল ও যশোর থেকে আসা বহু ফরাজির উপস্থিতি সম্ভবত দুদুকে এ কাজে উৎসাহিত করে।[৬৩]

জমিদারেরা কদাচিৎ প্রজাদের ধর্মবিশ্বাস নিয়ন্ত্রণের কথা ভেবেছে। কিন্তু সংঘবদ্ধ এবং প্রভাবশালী বাইরের কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠী তাদের নিজ এলাকার প্রজাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠানে জোর করে বাধা দেবে, এটা তারা সহজে মেনে নেয় নি। বিক্ষুব্ধ প্রজারা নালিশ করলে তাই তারা ফরাজিদের এ ধরনের কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করে। ফরাজিরা প্রতিবাদ করে বলে, বিধর্মী জমিদারের এ হস্তক্ষেপ অসঙ্গত। ওহাবিদের ক্ষেত্রে দেখেছি এভাবেই জমিদারের সঙ্গে তাদের বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল।

জমিদারের সঙ্গে ফরাজিদের বিরোধের আরো কারণ ছিল। একটা প্রধান কারণ, চিরাচরিত নানা আবওয়াব আদায়ে তারা সম্মিলিতভাবে বাধা দেয়। তার কারণ এ নয় যে আবওয়াবগুলির বোঝা তাদের পক্ষে দুর্বহ ছিল। কারণ, এগুলি তাদের মূল ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংগতিহীন। ওহাবিদের মতো, ফরাজিদের ধর্মবোধেরও মূল ভিত্তি ভগবানের একত্বে বিশ্বাস। তাই তাদের নেতার নির্দেশ, এ বিশ্বাসে পরিপন্থী কোনো আচার বা প্রথা তারা মেনে নেবে না। অথচ হিন্দু জমিদারেরা হামেশাই মূর্তিপূজা-সংশ্লিষ্ট নানা পার্লে-পার্বণে মুসলমান প্রজাদের থেকে আবওয়াব আদায় করত। ফরাজিরা বলল, মূর্তিপূজা এবং ভগবানের অখণ্ডতায় তাদের বিশ্বাস পরস্পর-বিরোধী, মূর্তিপূজার সঙ্গে কোনো ধরনের সংস্রব তাদের ধর্মমতে নিষিদ্ধ, মুসলমানদের পক্ষে এ ধরনের আবওয়াব দেবার অর্থ, তারা মূর্তিপূজার মতো গর্হিত কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে।

ফরাজিদের এ প্রতিবাদের তাৎপর্য শুধুমাত্র জমিদারের আর্থিক ক্ষতি নয়; এটা আসলে জমিদারি এলাকায় তাদের দীর্ঘদিনের নিরঙ্কুশ আধিপত্যের ওপর আঘাত। তাই তারা এটা সহজে মেনে নেয় নি। লক্ষণীয়, জমিদার 'দুর্বিনীত' ওহাবিদের যেভাবে শায়েস্তা করতে চেয়েছিল, ফরাজিদের ক্ষেত্রেও তাই করল। তবে 'দাড়ির জরিমানার' মধ্য দিয়েই কাজ হাসিল হয় নি। শারীরিক নির্যাতনের নানা কৌশল তারা বাতলাল।[৬১] তা ছাড়া আদালতে মিথ্যা মামলা রুজু করে ফরাজিদের হেনস্তা করতে চাইল।

কিন্তু ফরাজিপ্রভাববৃদ্ধি রোধ করা গেল না। দুদু মিঞা 'দাড়ির জরিমানা'-কে সম্পূর্ণ অবৈধ ঘোষণা করে বলল,[৬২] যে-কোনো জরিমানা করার অধিকার আছে একমাত্র সরকারের; জমিদারের ক্ষেত্রে এ ধরনের ক্ষমতা স্বীকার করা ভগবৎ-বিধান-বিরোধী।

ফরাজিরা কিন্তু সামগ্রিক জমিদারি ব্যবস্থার বৈধতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তোলেনি। পূজা-পার্বণের উপলক্ষ ছাড়াও জমিদারেরা কত বিচিত্র ধরনের আবওয়াব আদায় করত। এ সম্পর্কে ফরাজিরা কোনো প্রতিবাদ করে নি। তাছাড়া খাজনার হার বৃদ্ধি, নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া, নানা কৌশলে গ্রামের পতিত জমি দখলে আনার চেষ্টা—এসবের বিরুদ্ধেও। এ সময় ফরাজিরা কোনো আন্দোলন গড়ে তোলে নি। এমনকী, নেতারা এ সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশও ফরাজি কৃষকদের দেয় নি। তদানীন্তন পুলিশ সুপারিনটেনডেনটের প্রতিবেদন থেকে[৬৩] ফরাজি মানসিকতার অন্য একটা দিক জানতে পারি। খাজনা আদায় নিয়ে এক মুসলমান জমিদারের সঙ্গে ফরাজিদের দীর্ঘদিন বিরোধ চলছিল। জোরজুলুম করে খাজনা আদায়ের চেষ্টা করলে ফরাজিরা তার বিরুদ্ধে পঞ্চাশটা মামলা রুজু করে। উপায়ান্তর না দেখে জমিদার সদরে যায়। তাকে বলা হয়, যদি সে ফরাজি ধর্মমত গ্রহণ করে, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গেই ফরাজিদের সঙ্গে তার বিবাদ মিটে যাবে। জমিদার রাজি হওয়াতে তার বিরুদ্ধে আন্দোলন তুলে নেওয়া হয়।

প্রথাসম্মত আবওয়াব আদায়ে ফরাজিদের বাধা-দান জমিদারকে অনিবার্যভাবে শঙ্কিত করেছিল। কিন্তু নিজের প্রতিপত্তির স্থায়িত্ব সম্পর্কে তার আশঙ্কার আরো বড়ো কারণ, ফরাজি-সংগঠনের ক্রমবর্ধমান ব্যাপ্তি এবং নৈপুণ্য। জমিদার দেখল, এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ফরাজিরা তাদের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে—এটা যেন জমিদারি শাসন-ব্যবস্থার এক অব্যর্থ বিকল্প।

প্রধানত তিনভাবে ফরাজি সংগঠন[৬৪] গড়ে উঠে। এ ধারাগুলি কিন্তু কালানুক্রমিক নয়। নিজেদের নূতন ধর্মমতের প্রসারের জন্য ফরাজিরা সংঘবদ্ধ প্রচারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এক ধরনের সংগঠন ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না। ফরাজি-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নানা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিরূপ সমালোচনা ও প্রচারের জন্যও সংগঠন ক্রমেই অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এ সংগঠন বিকাশের তৃতীয় পর্যায় জমিদার, নীলকর ইত্যাদি প্রবল শক্তি-গোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান প্রতিবদ্ধকতা প্রতিহত করার চেষ্টার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ সংঘর্ষ ছাড়া সংগঠনের রূপ সম্ভবত সম্পূর্ণ ভিন্ন হত।

তৃতীয় পর্যায়ের সংগঠনের দুটি প্রধান লক্ষ্য ছিল: শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা, অর্থাৎ হিংসা দিয়ে হিংসাকে ঠেকানো; দ্বিতীয়ত, দলের সংহতি রক্ষার জন্য নানা ব্যবস্থা নেওয়া।

প্রথম লক্ষ্য সম্পর্কে শরীয়াতুল্লা নিজেই ক্রমেই সচেতন হয়ে ওঠে। কথিত আছে,[৬৫] ফরিদপুরের জালালউদ্দীন মোল্লাকে এক শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলার ভার দেওয়া হয়। তবে দুদুর আমলেই প্রতিরোধের এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়।

সংকটের সময় দলীয় সংহতি রক্ষার জন্য দরকার ছিল কঠোর শৃঙ্খলা। এর একটা প্রধান ভিত্তি, নেতার উপর নিঃশর্ত অবিচল আস্থা ও আত্মগত্য। গোড়ায় শরীয়াতুল্লা চাইত, শিষ্যদের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে প্রভুত্বের কোনো ছোঁয়াচ যাতে না থাকে, কারণ প্রভুত্ববোধের অবিচ্ছেদ্য অংশ অনুগামীদের অধীনতা-বোধ। গুরু-শিষ্য-সম্পর্কের প্রচলিত নাম পীর-মুরিদ তার পছন্দ ছিল না। নূতন নাম দেওয়া হল—ওস্তাদ-কারিগর[৬৬]। সংগঠনের নূতন পর্যায়ে এ সম্পর্কের মূল ধারণা সম্ভবত পালটে যায়। নেতাকে পরেও 'ওস্তাদ' বলা হত। কিন্তু তার কাছে অনুগামীদের নির্বিচার আনুগত্যের শপথের মধ্য দিয়ে গুরু-শিষ্য সম্পর্কে পুরনো সমতার ধারণা অনেকখানি পরিবর্তিত হয়ে যায়। হয়তো, সংকটের মুহূর্তে এ পরিবর্তন অপরিহার্য ছিল। ফরাজি-অধ্যুষিত অঞ্চলকে নানা এলাকায় ভাগ করে ওস্তাদ আলাদাভাবে তাদের

দায়িত্ব বিশ্বস্ত অনুচরদের (খলিফা) হাতে দেয়। ওস্তাদের নির্দেশ তারা অনুসরণ করবে ; এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার ছিল শুধুমাত্র ওস্তাদের।

ফরাজিদের সংহতিবোধের একটা প্রধান উৎস ছিল তাদের কোনো-কোনো ধর্মীয় ও নৈতিক বিশ্বাস। গোড়াকার ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে এ নৈতিক বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ কোন যোগ নেই। এ ধর্মীয় বিশ্বাসের দেশ-কাল-নিরপেক্ষ এক সার্বজনীনতা ছিল। নৈতিক বোধে প্রভাবিত বিশ্বাসগুলি বিশেষ সংকটমুহূর্তের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এ সংকট থেকে মুক্তির উপায় হিসেবে নেতারা অনুগামীদের এ নীতিবোধে উদ্‌বুদ্ধ করতে চেয়েছিল।

এ বোধের প্রাণকেন্দ্রে সক্রিয় যে বিশ্বাস তা হল এই যে,—ফরাজি বিশ্বাসে দীক্ষিত মুসলমানেরা এক নিগূঢ় আত্মিক যোগে বদ্ধ ; একজনের শুভাশুভ অন্যজনের শুভাশুভের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত,[৭৭] দরিদ্রতম ফরাজির স্বার্থ এবং সমগ্র ফরাজি গোষ্ঠীর স্বার্থ অভিন্ন ; কোন ফরাজির স্বার্থ বিপন্ন হতে পারে, এমন কোন কাজ অন্য ফরাজিরা করবে না ; আদালতে অভিযুক্ত ফরাজিদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না ; তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ যাতে না টিকতে পারে, সেজন্য দরকার হলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে ; দলের স্বার্থরক্ষার জন্য সবাই সাধ্যমত আর্থিক সাহায্য দেবে,[৭৮] দলের প্রয়োজনে কোনো কাজই গর্হিত নয়, এমনকী গুপ্তহত্যা পর্যন্ত। মারার পর শত্রুর মৃতদেহ তারা এমনভাবে লুকিয়ে ফেলত যে পুলিশের পক্ষে তার উদ্ধার সম্ভব ছিল না। এদের সম্পর্কে পরে ফরাজি সমাজে একটা কথা চালু হয়েছিল—তাদের 'আল্লার চিল' নিয়ে গেছে।

তাই, ফরাজিদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নাশের জন্য জমিদারেরা যে মরিয়া হয়ে উঠবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। [ক্রমশ

সূত্র-নির্দেশ ও টীকা

২৯. F. Engels, *The Peasant War in Germany*, (Progress Publishers, Moscow, Fourth Printing, 1974).

এঙ্গেলসের মন্তব্য : 'This domination of theology over the entire realm of intellectual activity was at the same an inevitable consequence of the fact that the Church was the all embracing synthesis and the most general sanction of the existing feudal domination. It is clear that under the circumtances all the generally voiced attack against the Church, and all revolutionary social and political doctrines had mostly and simultaneously to be theological heresies. The existing social relations had to be stripped of their halo of sanctity before they could be attacked.' পৃ ৪২

৩০. Barbara Daly Metcalf, *Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900*, (Princeton University Press, 1982).

৩১. 'Islam is a religion that takes all of life in its purview.' পৃ ৫

৩২. যেমন, একেশ্বরবাদ বর্জন করে ভগবানের মহিমা অন্য জনের ওপর আরোপ করা ; পীরবাদ ; পীরের কবরে প্রার্থনা ; মৃত মহাত্মার কবরে নানা ধরনের অনুষ্ঠান ; মৃতজনের উদ্দেশে প্রার্থনা ; মৃতজনের আত্মার সদ্গতির জন্য আয়োজন ; বিবাহ, মৃত্যু, মহরম ইত্যাদি উপলক্ষে নানা জাকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান।

৩৩. Colvin (যিনি বারাসত বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন) তিতুমীরের গুরু সৈয়দ আহম্মদের সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে ভিন্ন এক সিদ্ধান্তে এসেছেন : 'It is notorious that in Calcutta and its neighbourhood Syed Ahmed has for his disciples nearly all the most respectable of the Mohammedan inhabitants." (Bengal Judicial Criminal Progs ; 3 April, 1832 ; No. 5 ; Colvin-এর রিপোর্টের (তারিখ ৮ মার্চ, ১৮৩২) Para 7. তিতুর

নূতন মতে দীক্ষিত শিষ্যরা প্রধানত সমাজের দরিদ্র এবং দুঃস্থ অংশ থেকে এসেছে। কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই ছিল। যেমন নারকেলবেড়ের মৈজুদ্দীন বিশ্বাস, যার বাড়িতে সম্ভবত বিদ্রোহের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যাট বিঘা লাখেরাজ জমির মালিক ছিল।

৩৪. R. Ahmad, *The Bengal Muslims ; 1817-1906 : A Quest for Identity*, (O. U. P., 1981).

৩৫. 'Tax on beard', বারাসত বিদ্রোহের সমসাময়িক অনেক বিবরণে এর উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। তিতুমীরের সহযোদ্ধা সাজন গাজী রচিত (বা সংকলিত 'তিতুমীরের গান' নামক পুঁথি থেকে গিরীন্দ্রনাথ দাস কয়েকটা গান উদ্‌ধৃত করেছেন। তার থেকে এটা সুস্পষ্ট। একজন সাধারণ নাগরিকের উক্তি :

'নামাজ পড়ে দিবারাতি
কি তোমার করিল খেতি
কেন কল্লে দাড়ির জরিপানা'

কৃষ্ণদেব রায়ের সমর্থক জমিদার কালীপ্রসন্নও নাকি এভাবে বিদ্রোহের পটভূমিকা ব্যাখ্যা করেন :

"নামাজ রোজা শেখাইত রাখতে বলত দাড়ি
দিনের তারিখ শেখায়ে ফেরে বাড়ি বাড়ি।
পাপগোনা বদকাম তাও করে মানা
বাংলায় জারী করে আরবের কারখানা।
না বুঝে যে কেষ্টদের করিল বাহানা
ফি দাড়ি আড়াই টাকা জরিপানা হয়
সেজন্য সরাঅবলা বড় থাপা হয়।

[গিরীন্দ্রনাথ দাস, বাংলা পীরসাহিত্যের কথা, বারাসত, চব্বিশ পরগনা, ১৯৭৬], পৃ ১৮৮-১৮৯

৩৬. গিরীন্দ্রনাথ দাস, পূর্বোল্লেখিত, ১৭৭-১৭৮

৩৭. আর্থিক মন্দা মোটামুটিভাবে ১৮২৯ থেকে ১৮৩৪ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। লনডনের বাজারে তখন নীলের দাম পড়ে যায়। উল্লেখযোগ্য, অন্যান্য পণ্যের তুলনায় নীলের রপ্তানি তখনও অত কমেনি। ক্ষতি স্বীকার করেও নীলকরেরা নীল রপ্তানি করে যাচ্ছিল। কারণ নীলের বাজার খুব ভালো ছিল বলে ১৮২৩ থেকে ১৮২৬ পর্যন্ত বিশালপরিমাণ মূলধন নীল-উৎপাদনে খাটানো হয়েছিল।

৩৮. বর্তমান প্রবন্ধে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয় নি। নীলকরদের সঙ্গে ওহাবিদের সংঘর্ষের নানা ঘটনার বিবরণ আছে Abhijit Dutta-র (পূর্বোল্লেখিত) বইতে। Ch. VIII.

৩৯. Bengal Judicial Criminal Progs ; 3 April, 1832 ; No. 5. Colvin-এর রিপোর্টের Para 9.

৪০. একই ; Paras 22-23.

৪১. Bengal Judicial Criminal Proceedings ; 3 April, 1832 ; No. 83. Letter from E. P. Smith, Nadia Magistrate to the Deputy Secretary, Govt. of India, Judicial Dept. (16 Nov. ? 1831). Smith লিখছেন : 'These people ...pretend to a new religion, calling out Deen Mahomed declaring that the Company's Govt. is gone and that they are to receive malguzaree [revenue pavment].

৪২. Bengal Judicial Criminal Progs ; 5 Aug., 1833 ; No. 312B. 'Proceeding of the Barasat Trial (June-July 1832).

Para 2 : 'They...openly proclaimed themselves masters of the country, asserting that the period of British rule had expired, and that the Mahomedans from whom the English had usurped it, were the rightful owners of the empire.'

Para 11 : 'A standard with a peculiar device and inscrtption upon it which Mr. Alexander [Joint Magistrate of Barasat] understood to be symbolical of sovereignty was...found planted in the stockade [bamboo stockade]."

৪৩. বিহারীলাল সরকার, তিতুমীর (পূর্বোল্লেখিত), পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

৪৪. Bengal Judicial Criminal Progs ; 3 April, 1832 ; No. 87. Letter from Nadia Magistrate to the Deputy Secretary, Govt. of India, Judicial Dept., 21 Nov., 1831. ম্যাজিস্ট্রেট এ সম্পর্কে লেখেন : "...a paper written in Bengalee and signed in the Arabic character, was put into my hand, purporting to be an order from *Allah* to the Pal Chowdrys at Ranaghat to supply Russud etc. for the army of the Fukeers,

who were to fight with the Government, in default of which, a promise [was made] to visit them in seven or eight days, and make *Hidayut Oollahs* [converts to Titu Meer's doctrines] of them. A similar document was forwarded to me, under the little of *Judges Magistrate* holding out threats in case of resistance' [Para 2] বিহারীলাল সরকারও (**তিতুমীর,** পুস্তক বিপণি সংস্করণ, ১৯৮১) গোকনা গ্রামের জমিদার রামনিধি হালদারকে লেখা এক পরোয়ানার উল্লেখ করেছেন। পৃ ৪৭

৪৫. তিতু নাকি তখন বলেছিল : 'ভয় পাইও না। যখন মরিতেই হইবে, তখন যুদ্ধে মরিবার জন্য ভয় কেন ? কোরানে লিখিত আছে, যুদ্ধে মরিলে মানুষ 'ভেস্তে' [বেহেস্ত] যায়।' বিহারীলাল সরকার, পূর্বোল্লেখিত। পৃ ৫৪

৪৬. গিরীন্দ্রনাথ দাস সাজন-গাজীর 'তিতুমীরের গান'-এর যে সংক্ষিপ্তসার দিয়েছেন, তাতে এক উল্লেখ আছে : 'ক্রুদ্ধ যোদ্ধাগণ মৃত্যু পণ করেছে, ধর্মের শক্তিতে মোরসেদ বা নেতার হুকুম তামিল করতে তারা প্রস্তুত। বন্দুককে তারা তুচ্ছ মনে করে। ইসলাম প্রচারক বিরাট ফকির (মসের আলি) নিসার আলিকে মারবে এমন সাধ্য কার ? তিনি যে মক্কার হাজি।' গিরীন্দ্রনাথ দাস, পূর্বোল্লেখিত ; পৃ ১৮৭

৪৭. বালাকোটের যুদ্ধের (মে ১৮৩১) প্রায় বারো বছর (১৮৪৩) পরেও ওহাবিদের এ বিশ্বাস অটুট ছিল। সরকারি দলিলের ভিত্তিতে জানতে পারি, ১৮৪৩ সালে ওহাবিরা আবার শিখ-বিরোধী যুদ্ধের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়। লোকজন, অর্থ ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য ওহাবি প্রচারকরা বারাসত, যশোর, রাজশাহী, পাবনা ইত্যাদি অঞ্চলে যায়। নানা সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে Superintendent of Police, Lower Provinces (Dampire) লেখেন : "I understand that they declare Syed Ahmed, the former leader in the war against the Sikhs, to be still alive, and that he will lead the army to be assembled.' [Bengal Judicial Criminal Progs ; 29 May, 1843, No. 21 ; Dampier's letter to the Secretary, Govt. of Bengal, Judicial Department ; 29 March, 1843.]

৪৮. 'হরুগীতি' নামক তিতুর এক জীবন-কাহিনীতে আছে :

"কামানের শব্দ শুনে ফকির পানে মৌলুবী চায়
বুজরুগী সব ফাঁকি জান পেলো রে হায়।
ফকির বলে তখন, বাপুধন, ভয় করবে কারে
এ দ্যাখ গোল্লা খাই হজরতের বরে"

(রণজিৎকুমার সমাদ্দার, **বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব,** (কলিকাতা, ১৯৮২) পৃ ২৭৩। এ ধরনের আরো একটা গানের জন্য পৃ ২৬৪ দ্রষ্টব্য)।

৪৯. Bengal Judicial Criminal Progs ; 6 Dec., 1831, No. 50 ; E. P. Smith, Nadia Magistrate to the Commissioner, Nadia Division, 26 Nov., 1831. ম্যাজিস্ট্রেটের ধারণা : 'Indeed their total want of method in conducting the warfare and blind precipitancy in rushisg on their own destruction betokens anything but a deep-laid and extensive conspiracy against the Government of the country.' (Para 10)

৫০. Bengal Judicial Criminal Progs ; 6 Dec., 1831, No. 49. Commissioner, Nadia Division to the Secretary, Govt. of India, 28 Nov., 1831.

৫১. Bengal Judicial Criminal Progs ; 22 Nov., 1831, No. 72 ; Nadia Magistrate to the Officer in Command of the Military force at Bongong, 19 Nov., 1831 ; Para 2.

৫২. W. C. Smith, *Modern Islam in India ; A Social Analysis* (Lahore 1943) : Smith-এর সিদ্ধান্ত : 'The movement...though religious, was not simply communalist. The...movement ...did not set the lower class Muslims against lower class Hindus in open conflict, nor did it divert the lowest class Muslims from economic issues to a false solidarity with their communal friends but class enemies.' পৃ ১৯৩

৫৩. Abhijit Dutta, পূর্বোল্লেখিত। পৃ ১৭০-১৭১

৫৪. Bengal Judicial Criminal Progs ; 3 April, 1831, No. 5 ; Colvin Report-এর Para 36. Colvin স্বীকার করেছেন : "The entire root of the mischief which has occurred lies deep. The powers possessed by zamindars enable them to exercise a petty jurisdictions among their ryotts, and to make petty exactions on all kinds of pretences."

৫৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য Abhijit Dutta, পূর্বোল্লেখিত, দ্রষ্টব্য ; অষ্টম পরিচ্ছেদ। এর একটা কারণ, স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে য়ুরোপীয় নীলকরদের সামাজিক সম্পর্কের কথা তারা জানত। তাছাড়া কৃষকদের মধ্যে ওহাবি প্রভাব বৃদ্ধিতে নীলকরেরাও শঙ্কিত হয়।

৫৬ জানা যায়, ১৮৩১-এর প্রায় পাঁচ বছর আগে এ অঞ্চলে ওহাবি প্রচার শুরু হয়েছিল।

৫৭. **তিতুমীরের গান** (পাদটীকা নং ৩৫ দ্রষ্টব্য) বইতে অন্তর্ভুক্ত কোনো-কোনো গান থেকে এ ধারণার সমর্থন মেলে। ওহাবিদের ধারণা ছিল, তাদের প্রচার প্রধানত ধর্ম-সম্পর্কিত ; তারা "নামাজ পড়ে দিবারাতি" ; এতে কারোর 'খেতি'র [ক্ষতি] বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। [গিরীন্দ্রমোহন বসু, পূর্বোল্লেখিত, পৃ ১৮৮]।

৫৮. বিহারীলাল সরকারের বইতে (**তিতুমীর**) এ ধরনের ঘটনার বিবরণ আছে।

৫৯. Abhijit Dutta-র (পূর্বোল্লেখিত) একটা মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করছি : 'Titu Meer called for the total rejection of all traces of Hinduised culture from the body politic of rural Islam. He, moreover, characterised the Hindu accretions creeping into rural Islam as unholy, evil, dissolute.... These baneful characterizations ...issue only from the mouth of a rabid communalist who forcefully propagates his faith not only with the positive intention of purifying Islam, but with the ulterior motive of fomenting Hindu-Muslim communal tension in the countryside.' (পৃ ১০৫)

৬০. কৃষকদের এ ধরনের জটিল মানসিকতার এক মনোজ্ঞ বিশ্লেষণের জন্য দ্রষ্টব্য G. Pandey, 'Rallying Round the Cow : Sectarian Strife in the Bhojpuri Region : C 1888-1917, in R. Guha (ed) *Subaltern Studies*, II, (O.U.P., 1983) ; প্রবন্ধের Section VI.

৬১. Abhijit Dutta, পূর্বোল্লেখিত, পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

৬২. মুইনুদ্দীন আহমেদ খানের এ মত দত্ত উদ্ধৃত করেছেন। পৃ ৯৫-৯৬

৬৩. বারাসত বিদ্রোহের **ঠিক আগে** এ সম্পর্কে তিতুর কী ধারণা ছিল তা জানা যায় না। আব্দুল গফুর সিদ্দিকী (**শহীদ তিতুমীর,** বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৬৮) কলকাতায় ওহাবিদের এক সমাবেশে (সন-তারিখের কোনো নির্দেশ নেই) তিতুর এক ভাষণের উল্লেখ করেছেন। তাতে তিতুর হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তিতুর ভাষণের কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি : 'বাংলাদেশের মুসলমানদের ঈমান খুবই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদিগকে পাকা মুসলমান করিতে না পারা পর্যন্ত বাংলার তরফ হইতে জিহাদ ঘোষণা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইবে। আমি তাহাদের মধ্যে ইসলামের ব্যবস্থা করিতেছি। কেবল তাহাই নহে, আমি মনে করি, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও স্বাধীনতার সংগ্রামে আমাদের সহিত যোগদান করিতে পারে। ...কারণ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ জাতির উপর নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা সন্তুষ্ট নহে। আমরা যদি মুসলমানদিগকে পাকা মুসলমান করিয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানদিগকে একতাবদ্ধ করতঃ বিলাতী ও দেশী নীলকরদিগকে শায়েস্তা করিতে পারি, তাহা হইলে কেন্দ্রের [ওহাবিদের পাটনা কেন্দ্র] নির্দেশ মান্য করিয়া, কেন্দ্রের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া কেন্দ্রকে সাহায্য করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে না।' [পৃ ৩৬]। এ ধরনের অজস্র প্রত্যক্ষ উক্তি সিদ্দিকী নানা জনের উপর আরোপ করেছেন। এদের ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হবার কোনো উপায় নেই। পারিবারিক দিক থেকে সিদ্দিকী ওহাবি ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত। তিতুর এক সহযোদ্ধা গোলাম মাসুম ছিলেন সিদ্দিকীর 'বড় চাচা আব্বা...সুফি খোদদাদ সিদ্দিকী রাজীর শ্যালকপুত্র' [পৃ ৭১] কিন্তু এ ধরনের নানা প্রত্যক্ষ উক্তি বিশ্লেষণ করলে তাদের অনৈতিহাসিকতা (এবং অবাস্তবতা) সম্পর্কে কোনো সন্দেহ থাকে না। বর্তমান প্রবন্ধে এ আলোচনা প্রাসঙ্গিক নয়। বস্তুত, তিতুর ঘনিষ্ঠ নানা সহযোগীর মুখে লেখক যেসব প্রত্যক্ষ উক্তি আরোপ করেছেন, তাতে বোঝা যায়, তাদের মূল লক্ষ্য ছিল "উচ্চবর্ণের হিন্দু", নীলকর, খ্রীষ্টান পাদ্রী ইত্যাদি গোষ্ঠীর

সম্মিলিত এক "চক্রান্ত" ব্যর্থ করা; এ চক্রান্ত হল: 'মুসলমানদিগকে পথভ্রষ্ট করা এবং ইংরাজ ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানীকে তথা ইংরাজ সরকারকে শক্তিশালী করা।' আর ওহাবিদের উদ্দেশ্য, প্রাক্তন মুসলমান রাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। (পৃ ৭৩-৭৪) বিদ্রোহ চলাকালীন হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার কোনো চেষ্টা তিতুর পক্ষ থেকে হয় নি।

৬৪. Bengal Judicial Criminal Proceedings; 6 Dec., 1831, No. 49। কমিশনারের চিঠিতে (28 Nov. 1831) ওহাবিদের 'fanatics' বলা হয়েছে। (Para 4).

৬৫. একই; কমিশনারের ধারণা: 'The insurrection was entirely local···probably if the Sindar dacoit Teetoomeer and and other dacoits also, who, it seems, were of the party, had not been there, the insurrection would never have advanced to the atrocious and murderous character it subsequently assumed' [Para 9].

৬৬. Bengal Judicial Criminal Progs; 6 Dec., 1831, No. 51, Deputy Secretary, Govt. of India, Judicial Dept. to Nadia Commissioner, 6 Dec., 1831. এ নির্দেশে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে: "The fact that some of the sect in a certain part of the country were found in arms by no means justifies the seizure of others who profess the same tenets and who may be conducting themselves peaceably.' [Paras 2-3]

৬৭. স্পষ্ট তিতু-বিরোধী মনোভাব থেকে লেখা তিতু-জীবনী 'হরু গাঁ'তে অনেক বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য আছে। যেমন 'ফকিরের বুজরুগীতে লোক হল পুঁড়া ছাড়া'। (রণজিৎকুমার সমাদ্দার, পূর্বোল্লিখিত, পৃ ২৬৯)।

৬৮. Bengal Judicial Criminal Progs; 29 May, 1843. No. 25; Dampier, Superintendent of Police, Lower Provinces to the Secretary, Govt. of Bengal, 13 May, 1843. ড্যাম্পিয়ার জানতে পারেন: 'They [Farazis] also hold, though not openly, that as God made the earth common to all men, payment of rent is contrary to this law and they frequently resist all demands on this account, especially from Hindu Zamindars ('ara 8). ১৮৪৭ সালে লেখা ঢাকা বিভাগের কমিশনারও (J. Dunbar)-এর উল্লেখ করেন। আবওয়াব তো বটেই, এমনকি বৈধ খাজনা আদায়েও তারা জমিদারকে বাধা দেয়। 'They would withhold it [rent payment] altogether, if they dared: for it is a favourite maxim with them that the earth is God's who gives it to his people; the landlord is accordingly held in abomination, and they are taught to look forward to the happy time when it will be abolished' [Bengal Judicial Criminal Progs; 7 April, 1847, No. 99]. Dunbar-এর চিঠির (১৮ মার্চ ১৮৪৭) Para 7. পরবর্তী একটা চিঠিতে (২০ এপ্রিল ১৮৪৭) Dunbar লিখছেন, এজন্যই জমিদারেরা নানাভাবে চেষ্টা করে, যাতে ফরাজিরা তাদের এলাকায় চাষী হিসেবে না থাকতে পারে: 'it is within my knowledge that strenuous measures for their expulsion from the estates of landholders who do not approve of their doctrines, have been adopted, and carried out with success'. [Bengal Judicial Criminal Progs; 28 April, 1847, No. 128] Dunbar-এর চিঠির Para 2.

৬৯. Bengal Judicial Criminal Progs; 3 April, 1832, No. 6. ঢাকা ম্যাজিস্ট্রেটের 'রুবাকারী'তে (২৯ এপ্রিল ১৮৩১) এ বিষয়ে উল্লেখ আছে: 'One of the followers of the Hajee [Sariatullah] wished to bring his brother over to that sect, and on his not consenting, a large body of persons attacked and plundered the villages in which he lived, with the view to bringing about conversion by force. He repeated the attack the next day'

৭০. Bengal Judicial Criminal Progs, 16 April, 1831, No. 51. ফরিদপুর ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি (৭ এপ্রিল ১৮৩৯).

৭১. ফরাজিদের নানা বিবরণ এবং পুঁথির ওপর নির্ভর

করে মুইনুদ্দীন আহম্মদ খাঁ জমিদারি পীড়নের এসব কৌশলের নানা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। *History of the Fara'idi Movement in Bengal (1818—1906).* (Karachi, Pakistan Historical Society, 1965), পৃ ২৬-২৭.

৭২. Bengal Judicial Progs, 23 Jan., 1850; No. 61. Doodoo Meah's petition to the Government, 1 January, 1850 (Para 4).

৭৩. Bengal Judicial Criminal Progs; 29 May, 1843, No. 25. Superintendent of Police, Lower Provinces, to the Secretary, Govt. of Bengal; 13 May, 1843, Para 10.

৭৪. এ সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা আছে মুইনুদ্দীন আহম্মদ খানের বইতে, পূর্বোল্লেখিত, (পাদটীকা নং ৭১); অষ্টম পরিচ্ছেদ।

৭৫. একই; পৃ ২৫।

৭৬. একই; পৃ ৮৫-৮৬। মুইনুদ্দীন খাঁর মন্তব্য: 'Haji Shariat Allah viewed the existence of social discrimination among the Muslims with grave concern and denounced it as a deadly sin; because, in his opinion such practices werecontradictory to the Sperit of the Quran. He imphasises on the equality of all Muslims and held that the Faraidi···who have submitted most humbly to the will of God, repented for their past sins, and resolved to lead a more godly life in future, could not be subjected to unequal treatment or discrimination either among themselves or in the outside society' [p 85].

৭৭. Bengal Judicial Progs; 7 April, 1847; No. 99. Dacca Commissioner to Govt. of Bengal, 18 March, 1847; Para 5.

৭৮. এ ধরনের সাহায্যকে ঢাকা কমিশনার আইরিশ স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য সংগৃহীত 'O'connell's Rent'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

"চতুরঙ্গ" সেপটেম্বর ১৯৮৮ সংখ্যায় প্রকাশিত "কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অক্লান্ত যোদ্ধা প্রেমানন্দের মুখোমুখি"—সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন দীপক। সাক্ষাৎকারগ্রহণে সহযোগিতা করেছিলেন গৌরাঙ্গ মালাকার এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ বয়েজ মেন হোস্টেলের ৫ম বর্ষের কিছু আবাসিক ছাত্র।

বিষয় : ব্রহ্মদেশ

সম্পাদকের ভূমিকা

বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়

সম্প্রতি ব্রহ্মদেশে সারাদেশব্যাপী বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে যে বিস্ময়কর এবং প্রতিশ্রুতিপূর্ণ বিপ্লব ঘটে গেল, কলকাতার সংবেদনশীল যুবসমাজে সে বিষয়ে আশাহতরূপ আলোড়ন বা উল্লাসের প্রকাশ না দেখে অনেকেই নিশ্চয়ই ব্যথিত এবং বিহ্বল বোধ করেছেন। প্রেসিডেন্ট জিয়ার মৃত্যু নিশ্চয় খুব বেদনাদায়ক, কিন্তু তাঁর অকস্মাৎ তিরোধানে পাকিস্তানে সারাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিকাশের অবসর যেভাবে প্রশস্ত হল, সে সম্ভাবনাকেও কলকাতার যুবসমাজ সোৎসাহে বরণ করলেন না। অথচ ১৯৫৪ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের পরদিন হো চি মিনের সৈন্যদল যখন ডিয়েন-বিয়েন-ফু দখল করে তখন কলকাতার রাস্তায় যে উল্লাসের বান ডেকে যায়, সেকথা স্মরণ করে আজও অনেকের দেহে যৌবনের উন্মাদনা আর শিহরন আসে। ত্রিশ এবং চল্লিশ দশকে পৃথিবীর যে-কোনো কোণে স্বাধীনতা-অভিযানের সামান্য স্ফুলিঙ্গমাত্র দেখা গেলেই সারা কলকাতাময় অভিনন্দনের জোয়ার আসত। বহির্জগৎ, এমন-কী একান্ত আপন জগৎ সম্বন্ধে—যেমন দার্জিলিং জেলায় জোড়া-লাগবেনা-ধরনের ফাটলের সম্ভাবনা সম্বন্ধে, তৎপরে জলপাইগুড়ি-কুচবিহার হারানো সম্বন্ধে আশঙ্কা সত্ত্বেও, কলকাতার বুকে সরকারি গাফিলতির ফলে শত-শত লোকের পঞ্চাঘাতে পঙ্গুকরণের ব্যাপারে, শহরের বুকে যানজট ছাড়ানোর শুভসম্ভাবনাপূর্ণ আশাকে নির্মূল করা সম্বন্ধে—আশির দশকে কলকাতার যুবসমাজ যে এত উদাসীন, নির্লিপ্ত আর নিস্পৃহ হতে পারেন, তা অনেকেই আশঙ্কা করেন নি। নিরুদ্বিগ্নতা ও দুর্মতির ফলে অধিকাংশ বড়ো, মাঝারি আর বর্ধিষ্ণু ছোট শিল্পকে প্রথমে রোগগ্রস্ত করে, পরে তাদের তিলে-তিলে শ্বাসরোধ করে মারা সম্বন্ধেও এই একই ঔদাস্য দেখা যায়। সম্প্রতি নেল্‌সন্ ম্যানডেলার দীর্ঘ কারাবাস ও স্বাস্থ্যভঙ্গ উপলক্ষে সরকারি সূচনাগৃহে একটি 'মনোরম' সাড়ম্বর পোশাকি অনুষ্ঠান আর প্রদর্শনী হয়, সেটি আশার বিষয়, কিন্তু কলকাতার রাজপথে যদিও শোভাযাত্রা হয়েছে তবুও তাতে নগরের প্রসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধ এবং প্রতিবাদ এই মহানগরের ঐতিহ্যানুযায়ী প্রকাশ পায় নি। ব্রহ্মদেশে সম্প্রতি যে রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটে গেল তার প্রতি আমাদের উৎসাহ অনেক বেশি হবে, তা আশা করা অন্যায় হত না।

বস্তুত ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্য আজকের নয়, বহুকালের। শ্রী বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়-লিখিত নিবেদনে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ১৮৮৬ সালের স্মৃতিকথা থেকে আমি তার প্রমাণ দিয়েছি। অথচ ব্রহ্মদেশের কাছে আমাদের দুই বঙ্গ তো বটেই, ভারতের অন্যান্য প্রদেশও বিশেষভাবে নানা বিষয়ে ঋণী। প্রথমত, অর্থ এবং সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে বহু সহস্র বাঙালি ও ভারতীয় পরিবার বহু দশক, এমন-কী শতক ধরে ব্রহ্মদেশে যে ধন উপার্জন আর সংগ্রহ করে গৃহে এনেছেন তাতে আমাদের দুই বঙ্গ এবং ভারতের নানা প্রদেশ বিশেষ-ভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বহু ভারতীয় তাঁদের পেশা ও বিশেষজ্ঞবিদ্যার শীর্ষে যেভাবে ওঠেন, ব্রহ্মদেশে লালিতপালিত না হলে তাঁদের সে-উন্নতি দুষ্কর হত। তৃতীয়ত, ব্রহ্মদেশের নারীসমাজ ভারতীয় প্রবাসী নারীসমাজকে যে

বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের এই রচনাটি আদ্যোপান্ত সম্পাদনা করেছেন প্রবীণ সমাজতত্ত্ববিদ এবং শিল্প-ইতিহাসবেত্তা অশোক মিত্র।

স্বাধিকার এবং প্রগতির পথে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন, তা সকলেই স্বীকার করবেন। চতুর্থত, ব্রহ্মদেশ-প্রবাসীরা ভারতে প্রত্যাবর্তন করে এদেশের কত উপকার করেছেন, তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি ১৯৪২ সালে ঢাকার বিক্রমপুর মহকুমায়। জাপানি আক্রমণের পর অনেক ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙালি বিক্রমপুরে ফিরে আসেন। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি, চালচলন, মানস, সরল-উদার মনোভাব, সংকীর্ণতা এবং মাৎসর্যের অভাব আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। পরে বারে-বারে জীবনের নানা ক্ষেত্রে ব্রহ্মদেশীয় বিশেষজ্ঞদের শিক্ষাদীক্ষা, দৃষ্টিভঙ্গি আর সহৃদয়তা আমাকে মুগ্ধ করে। ব্রহ্মদেশে লালিত আমার নবীন সহকর্মী স্বর্গত শ্রী জীতেশ তালুকদারের মতো ব্যক্তি ও বন্ধু আমি খুব কম পেয়েছি। তাঁর ভাগিনেয় দিল্লীর অল্ ইন্ডিয়া ইন্‌স্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসের শল্যবিশেষজ্ঞ ডাঃ সমীরণ নন্দী এখন জগদ্বিখ্যাত বলা যায়। মহিলাকর্মীদের মধ্যে অনেকেই শৈশবকালে ব্রহ্মদেশে লালিতপালিত হয়েছেন।

ব্রহ্মদেশে সাম্প্রতিক আলোড়ন শুরু হবার উপক্রমকালে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী কনক চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর লেখা কিছু পাণ্ডুলিপি ভাগ্যক্রমে পাই। তাঁর কাছে জানতে পারি যে শ্রীযুক্ত গঙ্গো-পাধ্যায় বহু বছরের পরিশ্রমে ব্রহ্মদেশের একটি সুবৃহৎ ইতিহাস রচনা করেন। নিতান্ত দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৪২ সালের গোড়ায় যখন তাঁরা মেমিও ত্যাগ করেন, তখন সে পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসা সম্ভব হয় নি। যুদ্ধাবসানে ১৯৪৭ সালে যখন গঙ্গো-পাধ্যায় মহাশয় মেমিওতে ফিরে যান তখন সে সুবৃহৎ পাণ্ডুলিপির অতি অল্পই ফিরে পান। ১৯৪৮ সালে মেমিওতে মারা যান তিনি। শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায়ের দাদা তাঁর বোনকে পাণ্ডুলিপির যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা অর্পণ করেন। এই পাণ্ডুলিপির উল্লেখ শ্রীমতী চট্টোপাধ্যায় আমাকে বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে করেন। বর্তমানই প্রশস্ত সময় বিচার করে আমি তাঁর কাছে সে পাণ্ডুলিপিগুলি নিয়ে এসে যা উদ্ধার করতে পেরেছি তা চতুরঙ্গ-পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় সানন্দে ছাপানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেন। শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বলিখিত উপক্রমণিকায় তাঁর এই সুবৃহৎ কাজের ও সে-বিষয়ে তাঁর প্রস্তুতির কথা লিখেছেন। তাতেই পাঠক বুঝতে পারবেন, তিনি যা করেছিলেন তার কত সামান্য অংশ আমি উপস্থাপিত করতে পেরেছি।

শ্রীযুক্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজের কথামত ১৯০৬ সালে তিনি প্রথম বর্মায় যান। তাঁর শ্বশুরমহাশয় বর্মা সরকারের হস্তী-বিভাগের প্রধান ছিলেন। হাতিদের খেদা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। মেমিও শহরে প্রধান-প্রধান অনেক সরকারি দপ্তর ছিল, বড়ো আদালত ছিল। বীরেশ্বরের আদি দেশ ঢাকার মানিকগঞ্জ মহকুমার স্বরা গ্রামে। রাজশাহী কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে তিনি কলকাতায় আইন পাশ করেন। তার কিছু পরে তাঁর শ্বশুরমহাশয় তাঁকে আইন ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মেমিওতে আহ্বান করেন। বীরেশ্বর রেঙ্গুনে কিছুকাল অবস্থান করে বর্মি ভাষা ও বর্মি আইন—এই দুই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেমিওতে ওকালতি শুরু করেন। অবিলম্বে আইনব্যবসায়ের শীর্ষে উপনীত হন, এবং মোকদ্দমার ব্যাপারে সারা ব্রহ্মদেশময় তাঁর পসার হয়, এবং সেই উপলক্ষে তিনি ব্রহ্মদেশের বহুস্থান

ঘোরার, দেখার, বোঝার সুযোগ পান। মেমিও, রেঙ্গুন আর মান্দালয়ের বাঙালি সমাজে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করেন। আইনব্যবসায়ে তাঁর প্রতিষ্ঠার সূত্রে সম্ভ্রান্ত ও অতিসাধারণ বর্মিসমাজে তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি হয় এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী হিসাবে তিনি ইংরেজ-সমাজেও আদৃত হন। বীরেশ্বরের লেখার প্রতি ছত্রে ব্রহ্মদেশীয় সমাজ, ঐতিহ্য, দেশাচার ও তদ্দেশীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে সুগভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়, সেইসঙ্গে বিজয়ী ইংরেজদের বিবরণের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে তার ঐতিহাসিকবোধ-জনিত সন্দিগ্ধতারও যথেষ্ট প্রমাণ পাই। বলিষ্ঠ, দীর্ঘদেহী, গৌরবর্ণ সুপুরুষ কার্যক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ স্বভাব-নেতৃত্বে ও বিদ্যায় ব্রহ্মবাসী বাঙালি-সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন।

আমি শ্রী বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের পাণ্ডুলিপির যেটুকু পেয়েছি তার পাঠোদ্ধার করে চতুরঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য করে সংকলন করেছি। একটি বড়ো প্রবন্ধের কিছু অংশের পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার আমি করতে পারি নি—তার বিষয় ছিল ব্রহ্মদেশের নৃত্য ও নাট্যমঞ্চের ইতিহাস। যেটুকু উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছি সেটুকু দিতে সাহস করি না, পাছে পাণ্ডুলিপির নকল কালে আমার অজ্ঞতাজনিত নানা ভুলচুক ঢুকে পড়ে। এই অক্ষমতার জন্যে আমি লজ্জিত। আশাকরি যেটুকু উদ্ধার করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছে তাতে পাঠক পরিতৃপ্তি পাবেন। তাঁর কন্যাদের কাছে শুনেছি, ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত কলকাতার পুস্তকালয়গুলিতে তাঁর ঢালাও অনুরোধ ছিল, যে-কোনো বই বাঙলায় যখনই প্রকাশিত হবে তার একখণ্ড যেন অবিলম্বে তাঁকে মেমিওতে ডাকে পাঠানো হয়। ফলে মেমিওতে তাঁর লাইব্রেরি একটি কিংবদন্তী ছিল। যুদ্ধে সেটিও নষ্ট হয়। ত্রিশ দশকের প্রথমার্ধে শ্রী বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের কিছু প্রবন্ধ "প্রবাসী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

—অশোক মিত্র

প্রথম অধ্যায়

ব্রহ্মদেশের ইতিহাস

লেখকের নিবেদন

…যাহা আমাদের জীবনের সুখ দুঃখ এবং বিকাশ ও পরিণতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহাই আমার ও আমার পরিবারের, প্রতিবেশীর, স্বদেশবাসীর ও বিদেশীদিগের প্রতিদিনের ঘটনা পরিচালিত করিতেছে। তাহাই একজাতির উত্থান ও পতনের সহিত অন্য জাতির পতন ও উত্থান অতি সূক্ষ্মভাবে গ্রথিত করিয়া রাখিতেছে। এ পৃথিবীতে কিছুই আকস্মিক নহে; যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিতেছে।

মহারাজ তিব' রত্নগিরিতে নির্বাসনকালে

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ মার্চ—বেলা সাড়ে দশটার সময়ে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে রুশিয়ার বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ প্রফেসর বনরফ বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহে আগমন করিয়াছিলেন। পূর্বাহ্নে বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু চন্দ্রনাথ বসু, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন, বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত রজনীকান্ত গুপ্ত, এবং বাবু রাজকুমার সর্বাধিকারী প্রভৃতি কলুটোলায় তাঁহার বাসায় সমবেত হন। প্রবীণ প্রফেসর নববিজিত বর্মা মুলুক সম্প্রতি ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন, প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন সে দেশ সম্বন্ধে বাংলা-ভাষায় কোন পুস্তিকা লিখিত হইয়াছে কিনা? রাজকৃষ্ণবাবু বলিলেন, দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র যে মতামত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ব্রহ্ম-বিজয়ের অনুকূলে নহে, কিন্তু কোন পুস্তিকা (pamphlet) কেহ লেখে নাই। প্রফেসর পুনরায় বিশেষভাবে ইহার কারণ জানিতে কৌতূহলী হইলে বঙ্কিমবাবু বলিলেন, আসল কথা স্পষ্ট করিয়া মতামত দিতে কাহারও সাহস হয় না। তখন দেশভ্রমণের কথা উঠিল।…

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার

(যুগান্তর পত্রিকা ১৩ ভাদ্র ১৩৯৫/৩০শে অগস্ট ১৯৮৮, পৃ ৪)

ব্রহ্মদেশে আসিবার অল্প পরেই (১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে) মান্দালয়ে কয়েক মাস বাস করিতে হয়। তখন তথাকার পরিখাবেষ্টিত দুর্গ ও তদভ্যন্তরস্থ রাজ-প্রাসাদের শ্রীহীনতা দেখিয়া স্বাধীন ব্রহ্মরাজ্যের স্বাধীনতালোপের ইতিহাস জানিবার আগ্রহ হয়।

ব্রহ্মের শেষ রাজা মহারাজ তিব' ও তাঁহার মহারানী থুপিয়ালা তখন রত্নগিরিতে বন্দী। শেষ মন্ত্রী কিন্‌উন্ মিনজীর বিশ্বাসঘাতকতার গল্পে সমগ্র মান্দালয় শহর তখন মুখরিত। সম্ভ্রান্ত ব্রহ্মপরিবারের সহিত তখন আমার পরিচয় ছিল না। ব্রহ্মদেশীয় ভাষাও তখন পড়িতে পারিতাম না। অতএব ইংরেজিতে লিখিত পুস্তকে ব্রহ্মরাজ্য অধিকারের যে বিবৃতি আছে তাহাই পরে আমি প্রথম উপাদানরূপে গ্রহণ করি।

তাহার পর মেমিওতে ভূতপূর্ব মান্দালয় রাজসভার বৈদেশিক মন্ত্রী (কালাউন) মান্নুক সাহেবের পত্নী মিসেস মান্নুকের সহিত পরিচয় হয়। মহারাজ তিব'র রাজত্বকালে মান্নুক সাহেব রাজপ্রাসাদের বিদ্বেষভাজন হওয়াতে তিনি সপরিবারে শোয়েবো নগরে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। রেভারেনড জন ব্যাপটিস্ট নামক এক বৃদ্ধ ও শিক্ষিত পর্তুগীজ পাদ্রিও এই সময়ে (১৯০৭ খ্রী) মেমিওতে ছিলেন। তিনিই মিসেস মান্নুকের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দেন। ইহাদিগের নিকটে মান্দালয়ের ও মান্দালয় রাজগৃহের সম্বন্ধে অনেক বিবরণ শুনিতে পাই। রেভারেনড জন ব্যাপটিস্ট তাঁহার ডায়েরিতে দৈনিক ঘটনা লিখিয়া রাখিতেন কিন্তু সালাইং নগরে দস্যুদিগের দ্বারা ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পূর্বতন ডায়েরিপুস্তকগুলিও বিনষ্ট হইয়াছিল। তিনি আমাকে যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, ইংরেজি সরকারি রিপোর্টের সহিত তাহার অনেক ঐক্য আছে। মহারাজ তিব' ও মহারানী থুপিয়ালার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি তাঁহাদিগকে হৃদয়হীন রাজ-দম্পতি বলিয়া অভিহিত করিতেন। মিস ডান্নুগ্রী ও প্রফেসর ডুরোজেল সাহেবের সঙ্গেও এই সময়ে (১৯০৮) আলাপ হয়। কিন্তু তখন রাজপ্রাসাদ সম্বন্ধে কোনো কথা উঠাইলেই তাঁহারা বিরক্তভাবে অন্য কথার অবতারণা করিতেন। উভয়েই এখনো জীবিত আছেন। ডুরোজেল সাহেব এখন মেমিওতেই বাস করিতেছেন। এখন তাঁহারা উভয়েই অনুগ্রহ করিয়া কোনো জটিল বা অবোধ্য বিষয়ের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, যথোচিত উত্তরদানে আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

১৯১৩ সালে মান্দালয়ের সুপ্রসিদ্ধ অ্যাডভোকেট সুইনহো সাহেবের সহিত পরিচয় হয়। তিনি মান্দালয় সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সেই মূল্যবান পাণ্ডুলিপিখানির কী অবস্থা হইয়াছে তাহা অজ্ঞাত।

১৯০৯ সালে রেঙ্গুনে ছিলাম। সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার (পরে হাইকোর্টের জজ) উ-মে-আউঙ মহোদয়ের সঙ্গে এই সময়ে পরিচয় হয়। তিনি তখন ইয়ংমেন্‌স্ বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেনট ছিলেন, এবং লুইস স্ট্রীটে এই অ্যাসোসিয়েশনের সভাগৃহ ছিল। তিনি তখন পিগু ও পিউদেশের পুরাতন ইতিহাস সংগ্রহ করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত পরিচয়ে বার্নার্ড লাইব্রেরিতে ব্রহ্মদেশের ইতিহাস সম্বন্ধীয় কয়েকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করি এবং স্বাধীন ব্রহ্মদেশ অধিকারের (১৮৮৫ সাল) বিষয়ে তাঁহার সহিত ওই সময়ে ও পরে ১৯২৫ সালে (তখন তিনি হোমমেম্বার হইয়া মেমিওতে বাস করিতেছিলেন) অনেক আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত হারভী সাহেবও এ সময়ে এই আলোচনায় যোগদান করিতেন। কিন্তু তখন তিনি কোনো বিষয়ে স্বীয় মত প্রকাশ করিতেন না।

১৯২২ সালে হারভী সাহেবের সহিত পরিচয় হয়। তিনি এই সময়ে ব্রহ্মদেশের ইতিহাস প্রণয়ন করিতেছিলেন। পুস্তকপ্রণয়নে তিনি যে অপরিসীম পরিশ্রম করিতেছিলেন তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া এবং তাঁহার লিখিত নোটগুলি পাঠ করিয়া ব্রহ্মরাজ্যের শেষ দিবসের ইতিহাস লিখিবার সংকল্প করি। হারভী সাহেবের পুস্তকে তখন প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ পর্যন্ত ব্রহ্মদেশের ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল (১৮২৪)। এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগ এখনও প্রকাশিত হয় নাই।

১৯২৩ সাল উ-টিনকৃত ব্রহ্মভাষায় লিখিত ব্রহ্মদেশের ইতিহাস প্রকাশিত হয়। ইহাতে মহারাজ আলাউদায়া হইতে ব্রহ্মের শেষ রাজা মহারাজ তিব'র রাজত্বকাল পর্যন্ত ইতিহাস লিখিত হইয়াছিল। ১৯৩১ সালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রামাণ্য, গ্রন্থাদি, বিশেষত ব্রহ্মসরকারের রোজনামচায় পরিচয় পাই। ব্রহ্মের রাজপ্রাসাদ, রাজ্যের ও রাজপ্রাসাদের আবশ্যকীয় দৈনিক ঘটনাগুলি লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। উ-টিন প্রধানত ওই পুস্তক অবলম্বনেই মহারাজ মিন্‌ডন্ ও মহারাজ তিব'র রাজত্বকালের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। তিনি রাজবংশসম্ভূত ছিলেন এবং ইংরেজ সরকারের উচ্চকার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি সামান্য ইংরেজিও জানিতেন। এবং ইংরেজি সরকারি রিপোর্ট তিনি অনেকাংশে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯৩২ সালে পুনরায় যখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় তখন ইংরেজি সরকারি রিপোর্টের সত্যতা সম্বন্ধে তিনি সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে তাঁহার ইতিহাসের দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি তাঁহার পূর্বলিখিত ভ্রমগুলি সংশোধন করিবেন। এখনো তাঁহার নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই।

এই সময়ে ওয়েমাছো-উন-ডাউক ও অন্য কয়েকজন উচ্চপদস্থ ভূতপূর্ব বৃদ্ধ রাজকর্মচারীর সহিত পরিচয় হয়। আমার ন্যায় নিম্নপদস্থ বেসরকারি ভারতীয় জিজ্ঞাসুদের প্রতি তাঁহাদিগের অস্বাভাবিক ঔদাসীন্য এবং ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতালোপের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তাঁহাদিগের সুদৃঢ় অনিচ্ছা এবং সর্বাপেক্ষা তাঁহাদিগের অসহ্য অভদ্রতা আমাকে অত্যন্তই ব্যথিত করিয়াছিল। তথাপি তাঁহারা অবশেষে যে সংবাদ দিয়াছিলেন তাহা উ-টিনের গ্রন্থে লিখিত বিবরণের সহিত অনেক স্থলে মিলিয়া গিয়াছিল।

ইতিমধ্যে উ-টিন, উকোকা, সুবেদার মেজর দুর্গা সিংহ, সুবেদার গঙ্গালাল, হাবিলদার রিয়াজদ্দিন খাঁ, উ-আউঙ-তা (বর্তমানে শিপোস্টেটের বৃত্তিভোগী) উ-বা (শিপো রাজ্যের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী) উ-বা-তাউঙ, উ-পেটিন এবং অধুনাতন অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সহিত পরিচয় ও আলাপে যেসকল সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলাম, তাহা ঐতিহাসিকের পক্ষে মূল্যহীন নহে।

১৯৩১ সালে মহারাজ তিব'র তৃতীয় কন্যার সহিত

মেমিও নগরে পরিচয় হয়। তিনি এখনো মেমিওতেই আছেন। তিনি ও তাঁহার স্বামী ব্যারিস্টার শ্রীযুক্ত উ-মিয়া-উ আমাকে অকাতরে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয়া তৃতীয়া কন্যার নিকট তাঁহার পিতামাতার সম্বন্ধে যে-সমস্ত বিবরণ জানিতে পারিয়াছি তাহা অমূল্য। এই পুস্তকের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগে কথোপকথনরূপে যে-সকল ঘটনা বিবৃত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই তাঁহার বর্ণনানুসারে লিখিত হইয়াছে।

রাজপ্রাসাদের ও রাজদম্পতির পারিবারিক জীবনের ঘটনাগুলি সম্বন্ধে যেসকল বিষয় এ নিবন্ধে লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রধানত মহারানী থুপিয়ালার প্রধানা সহচরী নাকজু মিওজা, মা চ্যিন্ তিন্-এর নিকট হইতে শ্রুত। তিনিও মহারাজ তিব' ও মহারানী থুপিয়ালার মৃত্যুর পর ইংরেজ সরকারের বৃত্তি পাইয়া মেমিওতে বাস করিতেছেন।

তাঁহাদিগের বর্ণিত ঘটনাগুলিও কথোপকথনরূপে এই নিবন্ধে বর্ণিত হওয়াতে অনেকের মনে হইতে পারে যে ইহা যেন একখানি উপন্যাস। পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণ যেভাবে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন সেইরূপভাবেই অনুবাদ করিয়া ওইসকল অংশ লিখিত হইয়াছে। এবং এইজন্যই ইতিহাস লিখিবার প্রচলিত পদ্ধতি ওইসকল অংশে অনুসৃত হয় নাই।

এক সময়ে এইসকল ব্যক্তির কথিত বৃত্তান্ত আমাকে এত প্রভাবান্বিত করিয়াছিল যে আমি তাঁহাদিগের কথিত বৃত্তান্তকেই ব্রহ্মরাজ্যের শেষ কয়েক বৎসরের প্রকৃত ইতিহাসরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু হারভী সাহেব আমাকে সতর্ক হইতে অনুরোধ করেন। ইংরেজি পুস্তকে লিখিত বিবরণ হইতে ইহাদের কথিত বিবৃতি অনেকস্থলে বিভিন্ন ছিল। আমি উভয় পক্ষের বিবৃতিই পাঠকদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। স্বীয় মত প্রকাশ করিতে সাহসী হই নাই।

এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিবার অল্প পরেই "ঝ্যাকার লেডী" নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। ওই পুস্তক প্রধানত ইংরেজি পুস্তক ও ইংরেজ সরকারের বিবরণী অবলম্বনে উপন্যাস আকারে লিখিত হইয়াছে। মহারাজ তিব'র রাজত্বকালে রাজপ্রাসাদের কয়েকটি ঘটনাকে ইংরেজ লেখকগণ অত্যন্ত অনুদারভাবে বর্ণিত করিয়াছেন। ওইসকল ঘটনাকে আরও সমৃদ্ধভাবে বর্ণিত করিবার জন্য এবং মহারানী থুপিয়ালার চরিত্র ও ব্যবহার জগতের সমক্ষে বিসদৃশভাবে চিত্রিত করিবার জন্যই যেন ওই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। অথচ ইহার বর্ণনার ভঙ্গি ও ভাষা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী এবং অনেক ঘটনা এরূপ সুন্দর ও সহজ ভাবে লিখিত হইয়াছে যে বাহিরের লোকে এই পুস্তককে সহজে অবিশ্বাস করিতে পারিবে না। সত্যের পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া মিথ্যা যে সত্যকে কতদূর অপদস্থ করিতে পারে, এই পুস্তক তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইহার ভাষা ও লিখনভঙ্গি এত মনোহর যে প্রায় একবৎসরকাল আমাকে ইহা প্রায় অকর্মণ্য করিয়া রাখিয়াছিল। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে, অর্থাৎ ব্রহ্মদেশে ইংরেজদের পদার্পণের পূর্বে, ব্রহ্মদেশ "কী ছিল" এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন ব্রহ্মদেশ কী প্রকারে ইংরেজের আয়ত্তাধীনে আসল—এই দুই বিষয়েই এই নিবন্ধের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। "কী ছিল" এই অংশ লিখিতে আমি শ্রীযুক্ত হারভী ও শ্রীযুক্ত হল সাহেবের লিখিত বিবরণই গ্রহণ করিয়াছি। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ কিরূপে স্বাধীনতা হারাইল, তাহাতেও প্রধানত ইংরেজ সরকারের রিপোর্টই অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু যে-স্থানে ব্রহ্মদেশীয় ব্যক্তিগণের কথিত বা লিখিত বিবরণের সহিত অমিল দেখা গিয়াছে, সে স্থানে উভয় বিবৃতিই উদ্ধৃত হইয়াছে। রাজপ্রাসাদের ঘটনা এবং রাজারানী ও রাজপুরুষদিগের কথা লিখিবার সময়ে ব্রহ্মদেশীয় লোকদিগের উক্তিই গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু ওইসকল বিষয়ে ইংরেজ লেখকগণের অভিমতও বর্জিত হয় নাই।

কোনো-কোনো অংশে, বিশেষত দ্বিতীয় ভাগে,

ব্রহ্মদেশীয় সামাজিক ও পারিবারিক জীবন জানাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সে চেষ্টা যদি বিফল হইয়া থাকে তাহা আমারই অপটুত্ববশে।

এই পুস্তকের অনেক অংশ অসম্বদ্ধ ও অতিবিস্তৃত বলিয়া মনে হইতে পারে। ব্রহ্মদেশের বিষয়ে বঙ্গদেশের অনেক লোকেরই ন্যায়সঙ্গত ধারণা নাই। তাঁহাদিগের নিকটও যদি এইসকল বিবৃতি দীর্ঘ বা অনুচিত মনে হয় তবে নিতান্তই দুঃখের বিষয় হইবে। কিন্তু সদ্বিবেচক পাঠকগণ অনায়াসেই ধারণা করিতে পারিবেন যে এইসকল অংশ দীর্ঘ হইলেও ঐতিহাসিক মূল্যে অসংবদ্ধ বা অপ্রয়োজনীয় নহে।

তৃতীয় ভাগে ইণ্ডোচায়নার ফরাসি অধিকারের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহার সহিত ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতালোপের অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল। ইণ্ডোচায়নায় ফরাসিগণের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাই ইংরেজ কর্তৃক উচ্চ ব্রহ্ম গ্রহণের প্রকৃত কারণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই অভিমত সত্য কিংবা অসত্য তাহা নির্ধারণ করা কঠিন। কিন্তু ইণ্ডোচায়নায় ফরাসির প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি যে ব্রহ্মদেশে ইংরেজ সরকারকে আশঙ্কিত করিয়াছিল, তাহা তখন তাঁহাদিগের প্রত্যেক রাজনৈতিক কার্যেই প্রকটিত হইতেছিল।

সর্বশেষে আমার নিবেদন এই যে, ঐতিহাসিকের ন্যায় অনন্যসাধারণ বিচারবুদ্ধি লইয়া আমি এই পুস্তক লিখি নাই; সেরূপ বুদ্ধির গর্বও আমি করি না। "যৎ প্রাপ্তং তৎ লিখিতং" এই নীতিতে, সত্য ঘটনার খুঁটিনাটি সংগ্রহ করিতে-করিতে এই পুস্তক সৃষ্টি হইয়াছে। তবুও ইহা ছাপাইলাম। কেন ছাপাইলাম, তাহার কারণও অতি সামান্য।

মেমিও

২৩শে ডিসেম্বর ১৯৩৫

[ক্রমশ

প্রেস কপি

১. প্রেস কপি বলপেনে না লিখে ফাউনটেনপেনে লেখাই ভালো—তাতে কমপোজিটরদের পড়তে সুবিধা হয়।

২. লাইনের দৈর্ঘ্য যেন ১৫ সেনটিমিটারের মধ্যে থাকে।

৩. দুই লাইনের মধ্যে অন্তত এক সেমি ফাঁক থাকা দরকার—'দাবী', 'দেরী' ইত্যাদি বর্জিত বানান কেটে 'দাবি', 'দেরি' ইত্যাদি লেখার জায়গা যাতে থাকে।

৪. পাতার বাঁ দিকে অন্তত তিন সেমি মারজিন থাকা উচিত। যা-কিছু সংযোজন, তা দুই লাইনের মাঝখানে না লিখে, মারজিনে লেখা ভালো।

৫. অনেক লেখায় কমা-দাঁড়ির তফাত বোঝা যায় না—দাঁড়ি কমার মতো মনে হয়। ড-ভ, ম-স—এসব অক্ষর স্পষ্ট হয় না। তাতে খুবই অসুবিধা হয়—বিশেষ করে বিদেশী ব্যক্তি-নাম-স্থাননামের ক্ষেত্রে। বিদেশী নামগুলি উপরন্ত মারজিনে রোমক লিপিতে বড়ো হাতের হরফে লিখে দেওয়া উচিত।

ধ্বনির পথে রসের সন্ধান

শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়

ধ্বনিই ছিল গোড়ায়। মানুষের মুখ থেকে উচ্চারিত অসংলগ্ন অর্থহীন ধ্বনিই হল ভাষার আদি মূলধন। আদি যুগে ওই অসংলগ্ন অর্থহীন ধ্বনি উচ্চারণ করেই কাজ সারতে হত। যেখানে তাতে কাজ হত না, সেখানে হাতে তালি দিয়ে বা পাথর বা গাছের ডাল ঠুকে বোঝাতে হত কাছের বা দূরের মানুষকে, তাড়াতে হত বনের পশুকে। সে ধ্বনিরও রকমফের ছিল। ডাকতে হলে একরকম, হাঁকতে হলে অন্যরকম, তাড়াতে হলে আরেক রকম। সুখ একরকম, রাগ অন্যরকম, কষ্ট আরেক রকম। তখন কাজেরও বৈচিত্র্য ছিল না বেশি, ভাবপ্রকাশের বৈচিত্র্যের তাগিদও ছিল না তেমন। প্রাথমিক ধ্বনির সঙ্গে সুরসংযোগে অর্থান্তর অর্থাৎ উচ্চারকের অভিপ্রায়ের বিভিন্নতা সূচিত হত। সুর বলতে ধ্বনির দীর্ঘায়ন, উচ্চরণ বা আবর্তন। পশুপাখি এখানে এসেই থেমে গেল। পাখির গান বলতে সেই প্রাথমিক ধ্বনির দীর্ঘায়ন, উচ্চরণ বা আবর্তন। মানুষের সংগীতে যেখানে বাণী অমুক্ত সেখানেও প্রায় একই ভিত্তি। তবে দীর্ঘায়ন, উচ্চরণ এবং আবর্তনের বিপুল স্তরভেদ এবং সূক্ষ্ম সুরবৈচিত্র্যে এক অভিনবত্ব অর্জন করেছে। বাণী বলতে অর্থযুক্ত ধ্বনি। ধ্বনির সঙ্গে অর্থযোগেই হল ভাষার সূচনা। অসংলগ্ন ধ্বনি থেকে অর্থবান ভাষায় উত্তরণ এক দীর্ঘকালের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার। কিন্তু সে পরীক্ষা কাগজকলম হাতে সভা ডেকে মত নিয়ে হয় নি। সেই প্রাথমিক পর্যায়ের অসংলগ্ন ধ্বনিভিত্তিক আহ্বান গর্জন ধমক উল্লাস ক্রন্দনের ভিত্তিতেই সূচনাপর্বের শব্দার্থ নির্ণীত হয়েছিল। এখনও সভ্য সমাজে এমন অনেক প্রাথমিক প্রতিক্রিয়াসূচক নিরর্থক ধ্বনির ব্যবহার রয়ে গেছে। ব্যাকরণে তাদের অনেকে নাম পেয়েছে অব্যয় বলে। উঃ, আহা, হায়, ইস্ ইত্যাদি সেই আদিকালের অসংলগ্ন ধ্বনিরই স্মৃতিবাহী। শুধু এগুলিই বহুযুগের ওপার হতে আমাদের ঘাটে এসে পৌঁছেছে, তা নয়। আদি যুগে নিত্যকর্ম-পরিচালনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত ধ্বনির ভিত্তিতেই হয়েছে আজকের অর্থবান ভাষা, ধ্বনি থেকেই সংগীত, ধ্বনি থেকে কবিতা।

তবে ধ্বনি থেকেই কবিতা নয়, ধ্বনি থেকেও কবিতা। অর্থাৎ 'ধ্বনিপ্রবাহের সূত্রে কবিতার মর্মকে স্পর্শ করা'। সব কবিতার ক্ষেত্রে হয়তো নয়, বিশেষ-বিশেষ কবিতার ক্ষেত্রে 'কবিতার আপন মূল্যে বুঝে নেবার' জন্য কবিতা পাঠ শুধু 'আরো বেশি উপযোগী' মাত্র নয়, আরো বেশি জরুরি। কারণ কবিতার ছন্দ আর ধ্বনি কবিতার রসেরই আনুকূল্য করে। যে-কবিতার মূল রস করুণ, তার ছন্দ আর ধ্বনি কি মাধুর্যরসের প্রসন্নতা আনতে পারে? অথচ কয়েকজন ছাত্র এবং শিক্ষক মিলে রবীন্দ্রনাথের "নিরুদ্দেশ যাত্রা" কবিতাটি পাঠ করতে গিয়ে এমন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আগ্রহী হয়েছিলেন। কবিতার ভাষা অর্থাৎ তার অর্থসূত্রেই রসে পৌঁছানো। কিন্তু ছন্দ-ধ্বনি যদি অন্য রসের ইঙ্গিত দেয়, তবে কোন্‌টিকে মানব কবিতার রস বলে? তবে এ পরস্পর সংঘাত বোধ হয় সর্বত্র অনিবার্য নয়। বিচার করতে জানলে হয়তো বা দেখা যাবে এ সংঘাত অনিবার্য নয় কোথাও। ছড়ার ছন্দে আছে একটা চটুলতা, যার সঙ্গে সুখের সম্পর্ক নিবিড়তর। শোকার্ত যিনি তাঁর বাগীহীন কান্নার কলরোল কি ছড়ার ছন্দে সাজানো হয়? শোকের বিলাপে বিলম্বিত ধ্বনিই তো প্রত্যাশিত কিন্তু শোকার্তের স্বাভাবিক বিলাপের হিস্টোগ্রামে যদি অন্য চিত্র ধরা পড়ে?

অশিক্ষিত মনে হাজারো সংশয় নিয়ে প্রবেশ করেছি সন্‌জীদা খাতুনের বইয়ের ভিতরে। লাভবান হয়েছি, অনেক সংশয়ের মেঘ কেটেছে, আবার কোথাও তর্কমুখর হয়ে উঠতে চেয়েছে মন হয়তো যথার্থ শিক্ষার অভাবেই। তবে লেখিকার সমস্ত চেষ্টা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলেছে নিঃসন্দেহে, সে কথাটা পরে যদি আর বলার সুযোগ না পাই, তাই এখানেই বলে রাখি।

কবিতায় অভিধাগত অর্থসম্পৃক্ত শব্দ থাকে আর থাকে সেই শব্দাশ্রয়ী ধ্বনি। ধ্বনি শব্দকে চালিয়ে নিয়ে যায় কবির মন থেকে পাঠক-শ্রোতার মনে। শব্দ যেন ট্রেনের কামরা—সেখানে বসার আসন আছে, স্বাচ্ছন্দ্য আছে আর ধ্বনি যেন ইনজিন। ইনজিনকে কেউ রেলগাড়ি বলে না, সেখানে বসতে চায় না যাত্রী কিন্তু ইনজিনহীন কামরায় বসা যায়, চলা যায় না, পৌঁছানো যায় না অভিপ্রেত স্টেশনে। ইনজিন

ধ্বনি থেকে কবিতা—সন্‌জীদা খাতুন। বিশ্বভারতী গবেষণা প্রকাশন বিভাগ। শান্তিনিকেতন, ১৯৮৭। ষাট টাকা।

পারে চালিয়ে সেখানে নিয়ে যেতে। কিন্তু শুধু ইনজিন তো আর ট্রেন নয়। সেখানে যাত্রী বসবে কোথায়। ইনজিন আর কামরা দুইয়ে মিলে ট্রেন অর্থাৎ কবিতা। উপমাটা মাথায় আসার পরে মনে হল বোধহয় ঠিক খাপে-খাপে মিলল না। ধ্বনিকে হুবহু ইনজিন বলা যায় না বোধহয়। তবে তো ধ্বনিকেই বলতে হয় কবিতার একমাত্র চালিকা শক্তি। ভাষার উৎসে ধ্বনি—এ কথা তো গোড়াতেই বলে নেওয়া হয়েছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেও তার সমর্থন আছে—কঠিন দ্রব্যের আঘাতে ট-বর্গের জন্ম, কোমল দ্রব্যের অভিঘাতে ত-বর্গের স্মৃতি। 'বোমা ফাটে'—এ বাক্যের ক্রিয়াপদের 'ট' ধ্বনি কঠিন দ্রব্যের আঘাতের সঙ্গে বেশ মিলে যায়। কিন্তু 'গরম লোহা তাতে'—এখানে ক্রিয়াপদের 'ত' ধ্বনি তো কোমল অভিঘাতের স্মৃতি নয়। একটি উদাহরণে সবকিছু প্রমাণ করা যায় না ঠিকই। তবে ধ্বনিমাত্রেই একটি অর্থনিরপেক্ষ স্বাভাবিক ধর্ম অর্জন করে, তা থেকে একটা সংস্কারও গড়ে ওঠে। কিন্তু শব্দমাত্রেই তো আর ভাষার সরল রাজপথে ধ্বনির সওয়ার নয়, অর্থের বন-বাদাড় পেরিয়ে হয়তো দেখা যাবে ধ্বনি বেচারা পথের মাঝে হাঁপাচ্ছে, আর শব্দ অর্থের ধারালো অস্ত্রে পথ কাটতে-কাটতে চলেছে। এমনও তো হতে পারে। অর্থাৎ ভাষার সব শব্দই তো আর ধ্বন্যাত্মক শব্দ নয়।

কবিতা পড়তে গিয়ে (উচ্চারণ করেই হোক, আর মনে-মনেই হোক) ধ্বনির আবেদনই প্রথম আসে কানে। এবং কানের ভিতর দিয়া মরমে। কবিতা কেন, একটা বর্ণ পড়তে গেলেও ধ্বনির প্রসঙ্গ আসে প্রথমে। 'ব'—এই বর্ণটি পড়লে একটি ত্রিভুজ বা ত্রিকোণাকৃতির আগে একটি বিশেষ ধ্বনিই মনকে অধিকার করে। অর্থাৎ বর্ণমালা ধ্বনিরই প্রতীক। ধ্বনিই লক্ষ্য, চিত্রলিপি তার একটি রূপমাত্র—কানের কাজ চোখকে দিয়ে করানোর জন্য এই রূপাশ্রয়। বর্ণ ধ্বনির প্রতীক, তাই বলে শব্দও কি একান্তভাবে ধ্বনিনির্ভর। তাই কি ঠিক ঝংকারটি না শোনা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় নিরন্তর পাঠপরিবর্তন করে যেতেন? যথার্থ ব্যঞ্জনার ব্যাকুলতায় কি পাঠপরিবর্তন করেন নি? ধ্বনিই কি ব্যঞ্জনার একমাত্র নির্ণায়ক উপাদান? এসব প্রশ্ন উত্থাপনের আগে ধ্বনির স্বরূপ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা প্রয়োজন। স্পষ্ট ধারণার একটা পথ যন্ত্রের গণনায় গ্রাফ এঁকে নেওয়া অর্থাৎ পাঠ্য কবিতায় কটি উষ্মতাধর্মী ব্যঞ্জনধ্বনি, কটি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি, কটি কম্পনজাত ব্যঞ্জনধ্বনি, কটি পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনি, কটি উপাদানধর্মী কোমল ব্যঞ্জনধ্বনি, কটাই বা মিশ্র ব্যঞ্জনধ্বনি। স্বরধ্বনিরও এই ধরনের গ্রাফ সম্ভব। তারপর শুধু গণনা করে তুলনা করে ফেলা। বিশ্লেষণ যিনি করবেন তাঁর পক্ষে হয়তো বা এ-ই একমাত্র পথ। কিন্তু যিনি কবিতা পড়বেন তিনিও কি এই গণনাকার্যের ভিত্তিতে কবিতা পড়বেন? এটা নিশ্চয়ই অভিপ্রেত নয়। কেন জানি না, কেদার বাঁড়ুয্যের কথা মনে পড়ে গেল—সেই 'উপচিকীর্ষা'র সঙ্গে 'গুঁফো নাদিরশা'র বা 'পরন্তপ'-এর সঙ্গে 'মটন চপ'-এর মিল খোঁজা। ধ্বনিবিশ্লেষণে হয়তো 'উপচিকীর্ষা' আর 'গুঁফো নাদিরশা' সমতুল্য—তাই বলে কবিতায় কি এরা পরস্পর বিনিমেয়? এসব প্রসঙ্গ তোলাই বোধহয় ভুল হল। সন্‌জীদা খাতুন এ-পথে ধ্বনি থেকে কবিতায় পৌছতে চান নি। মানুষের বুদ্ধি আর অভিজ্ঞতা, বোধি আর প্রেরণা যখন সংহত হয় চেতনার এক কম্পমান বিন্দুতে, সেই বিন্দু থেকে তৈরি হয় শিখার মতো দীপ্যমান এক রেখা। সেই রেখাটি বিন্যস্ত করবার কাজে আসে ছন্দ আর ভাষা। কম্পনটি মূল। কম্পন নেই অথচ অবয়ব তৈরি হল ভাষা আর ছন্দে—তাকে কবিতা বলা যাবে না কখনোই। শ্রীশঙ্খ ঘোষের ''ছন্দের বারান্দা''য় এরকমই বলা হয়েছে, জানিয়েছেন সন্‌জীদা খাতুন। যথাযথ উপস্থাপন করা হল কিনা জানি না। কবির চেতনাই কবিতার মূল কথা। কিন্তু ছন্দ রক্ষা করে ভাষান্তরিত বিন্যাস অথবা পরিবর্তন কি সর্বদাই 'ঝাড়ে মূলে সব ধ্বংস করে দেবে'? যেমন দেখানো হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'চম্পা' কবিতার আড়ষ্ট ভাষান্তরে বা মধুসূদনের 'মেঘনাদবধকাব্যে'র ছন্দান্তরে। প্রদত্ত দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে লেখিকার প্রতিপাদ্য প্রমাণিত হলেও একে কি সাধারণ সত্য হিসেবে মেনে নিতে হবে? রবীন্দ্রনাথ কি একই কবিতার ভাষান্তর বা ছন্দান্তর করেন নি? সেসব ক্ষেত্রে কি ঝাড়েমূলে সব ধ্বংস হয়ে গেছে? তবে 'অনুকূল ধ্বনিসজ্জার সুষমা' সম্বন্ধে সচেতন না থাকলে কবিতা সার্থক হয়ে উঠবে না—এ-কথা মানতে আপত্তি উঠতেই পারে না।

বাঙলা ভাষার ধ্বনিচরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন সন্‌জীদা খাতুন। রীতিমতো টেকনিক্যাল বিষয়। সেভাবেই আয়োজন করা হয়েছে অধ্যায়টির। জে. আর. ফার্থ থেকে শুরু করে রামেন্দ্রসুন্দর, সুনীতিকুমার, আবদুল হাই, মুনীর চৌধুরী অনেককেই সাক্ষী মেনে-মেনে বিষয়টিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। এত আয়োজনের প্রয়োজন ছিল কিনা প্রশ্ন তুলব না। অর্থভেদবিশিষ্ট প্রায় সমোচ্চারিত যুগল শব্দের তালিকায় ভারি (very) / ভারী (heavy) নেই কেন, সে প্রশ্ন তোলা যায় বোধ হয়। ই স্বরধ্বনি প্রসঙ্গে রামেন্দ্রসুন্দরের উক্তিগুলি তর্কের অবকাশ রাখে না—সেগুলি হয় অনুকার শব্দ অথবা তার অর্থ নিজের অঙ্গেই বহন করছে। কিন্তু ওই একই টানে কি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'মেলেনি উত্তর'-এর 'নি'-এর ' ি ' ধ্বনির ব্যাখ্যা বিনা ভূমিকায় বা বিনা তর্কে মানা যায় বা শোনা যায়?

গ্রন্থের সবচেয়ে জরুরি অধ্যায়টিকে নামাঙ্কিত করা হয়েছে গ্রন্থেরই নামে। পাঁচটি কবিতা বেছে নিয়েছেন লেখিকা—রবীন্দ্রনাথের, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের, নজরুল ইসলামের, জীবনানন্দ দাসের এবং শ্রীশঙ্খ ঘোষের। বিভিন্ন ধরনের ধ্বনি গুনে-গেঁথে গ্রাফ এঁকে প্রমাণ করেছেন বক্তব্যে আর ধ্বনিতে এই মিল [নিরুদ্দেশ যাত্রা কবিতায়] বাক্‌ধ্বনির ভাববহনের ক্ষমতার পরিচায়ক। সত্যেন্দ্রনাথের "চম্পা" কবিতার ভাষান্তর এবং ছন্দান্তর পর্যালোচনা করে আসলের সঙ্গে নকলের প্রধান ভেদ ধরা পড়েছে সংগীতধর্মে। প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে সার্থক কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দোবাণীর পরিবর্তন 'কাব্যাত্মার ক্ষতিসাধন' করে। নজরুল ইসলামের "সর্বহারা" কবিতাতেও বাচ্যার্থে যেমন ভাবের সঙ্গে ধ্বনির সার্থক যোজনা কবিতার সর্বাবয়বে অভিব্যক্ত হয়েছে। জীবনানন্দ দাসের "আমাকে একটি কথা দাও" কবিতার ধ্বনি এবং দলসমাবেশের ধরন প্রাথিত কোমল স্বরটিকে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কবিতাটিতে চিত্রে যা বলে, ধ্বনিতেও তার দ্যোতনা মুখর হয়ে উঠেছে। শ্রীশঙ্খ ঘোষের "ভিখিরির আবার পছন্দ" কবিতায় ধ্বনি-ব্যবহার-বৈশিষ্ট্যে ক্ষোভ থেকে শেষ পর্যন্ত সঙ্ঘশক্তির দৃঢ় প্রকাশ ধ্বনিত হয়েছে। এসব সিদ্ধান্তই এসেছে ধ্বনিবিশ্লেষণসূত্রে। তার অর্থ এ নয় যে ধ্বনিবৈশিষ্ট্যই কবিতা পাঁচটিকে তাদের অভিপ্রেত লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছে। ধ্বনিবিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, কবিতার যা লক্ষ্য তার সমর্থন আছে ধ্বনিব্যবহারে, অর্থাৎ ধ্বনি সহায়ক এবং সমর্থক। ধ্বনি থেকে কবিতা নয়, ধ্বনিও কবিতার অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ।

প্রধান অধ্যায়ের পরেই আছে আরেকটি জরুরি অধ্যায় যেখানে রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাঠান্তর প্রসঙ্গ এসে পড়েছে ধ্বনিবিচারসূত্রে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ভাষা ছন্দ পরিবর্তন ঘটেছে নানাভাবে। কখনো একই কবিতা পালটাতে-পালটাতে চলেছে, কখনো এমন পালটেছে যে পরিবর্তিত রূপটি একটি নতুন কবিতার মর্যাদা পেয়েছে। কবির অতৃপ্তিই হয়তো এই পরিবর্তনের কারণ। কিন্তু ধ্বনির পরিবর্তনে কবিতার পরিবর্তন বিচার করে দেখা যেতেই পারে ধ্বনিব্যঞ্জনাতেও কবির অতৃপ্তি ছিল বা পরীক্ষানিরীক্ষার প্রবণতা ছিল। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, পালটাতে-পালটাতে যেখানে এসে পৌঁছেছেন সেখানেই কি তৃপ্ত হয়েছেন কবি এবং সেই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বতর রূপগুলি কি বাতিল হয়ে যায়? এই সূত্রে "সন্ধ্যাসঙ্গীত"-এর একটি কবিতার কথা মনে পড়ে। পরিবর্তন করতে গিয়ে অসহিষ্ণু কবি মন্তব্য করে বসেন, 'সংশোধনের অতীত, এটি পরিত্যাজ্য'। সত্যি কি তাই? এর বিচার ভিন্ন আলোচনার অবকাশ রাখে। তাই এ প্রশ্ন সন্‌জীদা খাতুনের কাছে তুলে লাভ নেই। 'ধ্বনি পর্যালোচনার সূত্রে কবিতার রসের জগতে বিচরণের প্রয়োগ আধুনিক নন্দনতত্ত্বের পরিসীমার অন্তর্ভুক্ত' হয়েছে। এবং হয়েছে বলেই সন্‌জীদা খাতুনের এই প্রয়াস আমাদের কাছে মূল্যবান।

দুই বঙ্গের জীবনীচর্চা

আজহারউদ্দীন খান্‌

বাঙলার নবজাগরণের মনীষীরা যে খণ্ডিত আর খর্বিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিলেন, তা প্রধানত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে মিতালি করে; তার মধ্যে প্রথম থেকেই কখনো সচেতনভাবে কখনো অচেতনভাবে একটা সাম্প্রদায়িক মানসিকতা থেকেই গিয়েছিল। উনিশ শতকের জাগরণ প্রধানত হিন্দুধর্মের জাগরণ। রামমোহনের মতো প্রগতিশীল ভারতপথিকও ইংরেজের জয়কে স্বাগত জানিয়ে

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ—আহমদ শরীফ।
এস ওয়াজেদ আলী—সৈয়দ আকরম হোসেন।
আবুল কালাম শামসুদ্দীন—ভূঁইয়া ইকবাল।
গোলাম মোস্তাফা—মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্‌।
আবদুল কাদির—রফিকুল ইসলাম।
আবুল মনসুর আহমদ—নুরুল আমিন।
হবীবুল্লাহ বাহার—আবু জাফর শামসুদ্দীন।
মুহম্মদ আবদুল হাই—মনসুর মুসা। ১৯৮৮।
বন্দে আলী মিয়া—গোলাম সাকলায়েন।
প্রত্যেকটিরই প্রকাশক বাংলা একাডেমী। **প্রত্যেকটিরই** মূল্য পনেরো টাকা।

ভারতের মূল অধিবাসী হিন্দুদের হৃদিন এসেছে, এমন কথাও বলেছিলেন। হিন্দুদের সাথে মুসলমানরাও যে ছিল তাদের কথা ভেবে দেখেন নি। এই মানসিকতা আরও প্রকট হয়ে ওঠে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠায় আর বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়ে। তিনি কয়েকটি উপন্যাসে হিন্দুজাগরণ ও ইংরেজ প্রভুদের সঙ্গে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ককে বিষিয়ে তুলেছিলেন। ইংরেজ রাজত্বের আগে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গাহাঙ্গামার কথা শোনা যায় না। বিভেদনীতি চালিয়ে ইংরেজ তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। এই উদ্দেশ্যে ইল্বন যুগিয়েছে উনিশ শতকের উঠতি হিন্দু বুর্জোয়া যাঁরা স্বদেশ-প্রীতি আর স্বধর্মপ্রীতিকে এক করে দেখেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষা অনেক পরে মুসলমান গ্রহণ করেছিলেন। হিন্দুরা অনেক আগে গ্রহণ করে শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে গিয়েছিলেন। এই অগ্রগতিতে চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে যেমন অগ্রাধিকার তাঁরা পেয়েছিলেন, তেমনি মুসলমান সমাজ পিছিয়ে থেকে যখন এগিয়ে এলেন তখন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হলেন। না-পারার দরুন বিক্ষুব্ধ হলেন এবং এই ক্ষুব্ধতাকে ইংরেজ-শাসক মূলধন করে বিভেদের মানসিকতাকে আরও তীব্র করে তুলল। পরবর্তী কালে স্বাধীনতা আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসের কয়েকটি বিসদৃশ ঘটনা হিন্দু-মুসলমানের দূরত্বকে আরও বাড়িয়ে দিল। এই মানসিকতা থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখা হয়েছে, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নমাত্র', সেখানে ভারতবর্ষ নেই ভারতবাসী নেই, আছে কেবল 'এক বিচিত্র কুহেলিকা যা আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র।' এর ছায়াপাত আমাদের সাহিত্যেও ঘটেছে। একটি কথা বেদনার সঙ্গে আনতে হল যে জাতিবর্ষবর্ণনিবিশেষে বাঙলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির হিন্দু মুসলমান মিলিত-ঐক্যের মর্মবাণী আমরা কেউই আজও মনেপ্রাণে গ্রহণ করি নি। গ্রহণ করি নি বলেই বাঙলা ভাগ হয়েছে, বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়েছে, ভারতবর্ষ-নামক দেশের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন হয়ে পড়েছে। উনিশ শতকের সংকীর্ণ মানসিকতা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি নি। সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে উদাহরণ চাইলে এ বাঙলার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ওপার বাঙলায় কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের সাহিত্য-সাধক-পরিচিতি গ্রন্থমালার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ওপার বাঙলায় এই সিরিজ প্রবর্তনের প্রয়োজনই হত না যদি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সাহিত্যের মূল্যবিচার এবং জীবনী প্রণয়নে নিরপেক্ষ আর উদার হতেন। তাঁরা এমন অনেকের জীবনী রচনা করেছেন যাঁরা বাঙলা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রধান ব্যক্তি নন—নবজাগরণের সঙ্গেও তাঁদের কোনো সম্পর্ক নেই—সংস্কৃতের টুলো পণ্ডিত তাঁরা। এরকম অনেক অপ্রধান ব্যক্তি আর চরিত্রের জীবনী রচনা করেছেন শুধু তাঁরা গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি বলেই। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের পাশে হাজার বছর ধরে আর-এক সম্প্রদায় ছিলেন এবং তাঁরা বাঙলা সাহিত্যচর্চায় তাঁদের থেকে কোনো অংশে ন্যূন ছিলেন না, এমন-কী মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে তাঁরাই মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ইংরেজ রাজত্বকে মুসলমান ধ্বংসচিত্তে নিতে পারেন নি বলে উনিশ শতকে তাঁরা পিছিয়ে ছিলেন এবং যাঁরা তাঁদের মধ্যে ইংরেজিশিক্ষা গ্রহণ করে জাতি হিসেবে এগিয়ে যাবার প্রবর্তনা দিয়েছিলেন, তাঁদের নাম বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বেমালুম ভুলে গিয়েছেন। যেমন মুনশী মেহেরুল্লাহ্ (১৮৬১-১৯০৭) যাঁকে মুসলিম বাঙলার রামমোহন বলা হয়, মুহম্মদ জমীরউদ্দীন (১৮৭০-১৯৩০), মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী (১৮৭৪-১৯৫০), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) প্রমুখ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ উনিশ শতকের কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০) দিয়ে সাহিত্য-সাধক চরিতমালার সূচনা করেন—প্রকাশকাল মাঘ ১৩৪৬। দেশভাগের আগে পর্যন্ত যে ৭২খানা জীবনী তাঁরা প্রকাশ করেন তার মধ্যে একমাত্র মীর মশারফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)-কেই তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন—প্রকাশকাল ভাদ্র ১৩৫০, সংখ্যা ২৯। এ পর্যন্ত চতুর্দশ খণ্ডে মোট ১২৬ জনের জীবনী বেরিয়েছে। মীর মশারফ হোসেন ছাড়া এই সিরিজে স্থান পেয়েছেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (১৮৮৫-১৯৬৯); প্রকাশকাল শ্রাবণ ১৩৮৮, সংখ্যা ১১৫। তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে অনেক জল ঘোলা হয়েছিল তদানীন্তন সম্পাদকের কারসাজিতে। যেসব মুসলমান সাহিত্যিক মুসলমান হিসেবে নয়, পুরোপুরি সাহিত্যিক হিসেবেই এখানে জন্মেছেন, এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, যেমন মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), এস ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১) প্রমুখ এই সিরিজের অন্তর্ভুক্ত হন নি। বাংলাদেশ তাঁদের জীবনী বের করেছেন। দেশভাগের আগে যাঁরা কলকাতায় জীবনের তিনভাগ সময় অতিবাহিত করেছেন, দেশভাগের সময় অপশন নিয়ে চলে

গেছেন, যেমন গোলাম মোস্তাফা (১৮৯৭-১৯৬৪), জসীমউদ্দীন (১৯০৪-১৯৭৬), আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯১-১৯৮৮), মুহম্মদ কুদরৎ-এ খুদা প্রমুখ। এঁদের জীবনী বাংলাদেশ থেকে বেরিয়েছে—সাহিত্যসাধক চরিত-মালায় স্থান পান নি। বাংলাদেশ ভাগ হয়ে যাবার পর সাহিত্যিকরা যাঁদের জন্ম ওপার বাঙলায়, তাঁরা আর নিজের জন্মভূমিতে ফিরে গেলেন না, কলকাতা কিংবা তার আশে-পাশে জীবন কাটিয়ে দিলেন, সেরকম সাহিত্যিকদের সাহিত্য পরিষৎ সিরিজের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আবার ওপার থেকে এপারে এসে রয়ে গেছেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেছেন এরকম ব্যক্তি উপেক্ষিত রয়ে গেছেন, যেমন কাজী আবদুল ওদুদ। কাজী আবদুল ওদুদের জন্ম কুষ্টিয়া জেলার জগন্নাথপুরে, জন্মতারিখ ২৬শে এপ্রিল ১৮৯৪, মৃত্যু কলকাতায় ১৯শে মে ১৯৭০। আঠারো বছরের ওপর হয়ে গেল তিনি সিরিজের অন্তর্ভুক্ত হন নি। বাংলাদেশ থেকে জীবনীগ্রন্থমালা সিরিজ ছাড়া তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আবদুল কাদির তাঁর ওপর বই লিখেছেন (১৯৭৬) যার ভূমিকা লিখেছিলেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। বিভাগের আগে যাঁর সারাজীবন ঢাকায় কেটেছে—ঢাকাতেই জন্ম, ঢাকাতেই মৃত্যু, তিনি সিরিজের অন্তর্ভুক্ত হন নি—আমি সোমেন চন্দের (১৯২০-১৯৪২) কথা বলছি। এঁর জীবনীও বাংলাদেশ বের করেছেন। যে অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৯১৪-১৯৫২) জন্ম ওপার বাঙলায়, মৃত্যু হল এপার বাঙলায়, তিনিও কলকে পেলেন না। তাঁর জীবনীও বাংলাদেশ প্রকাশ করেছেন। এর চেয়ে আরও গভীর লজ্জা আর পরিতাপের কথা—আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, যিনি প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্দেশ্য আর লক্ষ্যকে সার্থক করে তুলেছিলেন, তাঁর জীবনী আজ পর্যন্ত পরিষৎ বের করেন নি। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁদের অনুরোধ করেছি এবং জীবনী রচনা করার দায়িত্বও গ্রহণ করতে চেয়েছিলাম—কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করেন নি। সাহিত্য-বিশারদের মৃত্যু হয়েছে ১৯৫২ সালে, তাঁর জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়েছে ১৯৬৯ সালে পূর্ববাঙলায় মহাসমারোহে, ইংরেজি ও বাঙলাতে দুখানি স্মারকগ্রন্থ বেরিয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি একজন সহ-সভাপতি ছিলেন এবং আজীবন সহায়ক সদস্য ছিলেন। পরিষৎ পত্রিকায় ১৩০৭ থেকে ১৩৪৪ বর্ষ পর্যন্ত খান পনেরো মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখের তিনি বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। অর্ধশতাব্দীকাল বাঙলা সাহিত্যের সেবা করেছেন, ছ-শত শ প্রবন্ধ রচনা করেছেন, শত-শত পুঁথি উদ্ধার করে প্রাচীন আর মধ্য যুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস নতুন করে লেখার সূত্র দিয়েছেন। তাঁর জীবনীও বাংলাদেশ থেকে বেরুল—এর চেয়ে অসম্মানের বাপার আর কী থাকতে পারে? বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হয়তো উল্লিখিত ব্যক্তিদের সাহিত্যিক বলে মনে করেন না, কিংবা তাঁদের দান নেহাতই অকিঞ্চিৎকর বলে তাঁরা মনে করেন। পছন্দ অপছন্দ ব্যাপারে ব্যক্তিবিশেষের নির্বাচনে বলার কিছু নেই, কিন্তু প্রতিষ্ঠান যখন এই বিষয়ে জড়িত থাকেন তখন তার গুরুত্ব অনেকটা বেড়ে যায়।

অহুদার মনোভাব এবং উদ্দেশ্যমূলক আচরণের জন্য বাঙলা ভাগ হবার সঙ্গে-সঙ্গে ওপার-বাঙলায় স্বাভাবিক কারণেই এবং ঐতিহ্যসন্ধানের তাগিদে মুসলিম সাহিত্যসাধক-দের জীবনী রচনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। ১৯৬৩ সালে কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড "সাহিত্যসাধক পরিচিতি গ্রন্থ-মালা" প্রবর্তন করেন। এই গ্রন্থমালায় যতদূর মনে পড়ে চৌদ্দটি গ্রন্থ বেরোয় এবং সবকটি গ্রন্থই মুসলিম সাহিত্যিকদের জীবনচরিত। পূর্বপাকিস্তান বাংলাদেশে রূপান্তরিত হবার পর কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড ১৯৭২ সালের ১৭ই মে ঢাকা বাংলা একাডেমীর অঙ্গীভূত হয়। এরপর বাঙলা একাডেমী ১৯৮৭ সালে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণে 'জীবনী গ্রন্থমালা' প্রবর্তন করেন। বাঙলা একাডেমীর মহা পরিচালক আবুহেনা মোস্তাফা কামাল প্রতিটি গ্রন্থের 'প্রসঙ্গ-কথায়' বলেছেন যে 'বাংলাসাহিত্যের গবেষক ও ইতিহাস রচয়িতাদের প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই সম্প্রতি বাঙলা একাডেমী কর্তৃক 'জীবনী-গ্রন্থমালা' শীর্ষক যে-প্রকল্প গৃহীত হয়েছে তার পূর্ণ বাস্তবায়ন, আমাদের বিশ্বাস, এক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত দীর্ঘদিনের শূন্যতা, অংশত হলেও, পূরণ করবে। বাঙলা ভাষার একশ জন বিশিষ্ট লেখকের জীবনী এই প্রকল্পের অধীনে পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হবে। এবার একুশে ফেব্রুয়ারিতে ভাষা-আন্দোলনের অমর শহীদদের সর্বত্র স্মৃতির উদ্দেশে বাংলা একাডেমীর শ্রদ্ধ নিবেদন ত্রিশজন স্মরণীয় সাহিত্য-শিল্পীর জীবনালেখ্য।' একুশে ফেব্রুয়ারি স্মরণে ১৯৮৭ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারিতে এই প্রকল্পের প্রথম ত্রিশজন স্মরণীয় সাহিত্যিকদের জীবনী বেরোয়। এই প্রকল্পের প্রথম গ্রন্থ ছিল গোবিন্দচন্দ্র দাস—লেখক সৈয়দ আবদুল মকসুদ। গোবিন্দ-চন্দ্র দাস ছাড়া কেদারনাথ মজুমদার (যতীন সরকার

রচিত), রমেশ শীল (সৈয়দ মোহম্মদ শাহেদ), মুকুন্দ দাস (স্বরোচিষ সরকার), সতোন সেন (অজয় রায়), অদ্বৈত মল্লবর্মণ (শান্তনু কায়সার), সোমেন চন্দ (হায়াৎ মামুদ) আছেন। ১৯৮৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি আরো ত্রিশজন সাহিত্যিক-শিল্পীর জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড যে ১৪ জনের জীবনচরিত প্রকাশ করেছিলেন তাতে কোন অমুসলমান সাহিত্যিকের জীবনী ছিল না—প্রধানত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একচোখোমির প্রতিবাদেই উন্নয়ন বোর্ড এই রীতি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু বাংলা একাডেমী সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে জীবনীরচনার কাজে হাত দিয়েছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ যেখানে ১২৬ জনের জীবনীর মধ্যে দুজন মুসলিম সাহিত্যিককে নিয়েছেন, সেখানে বাংলা একাডেমী প্রথম ত্রিশজনের মধ্যে সাতজন হিন্দু সাহিত্যিককে গ্রহণ করেছেন। আনুপাতিক হারের দিক দিয়ে বিচার করলে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যে জাতিধর্ম আমি মানি না। তর্কের খাতিরে ক্ষোভের সঙ্গে বিষয়টি উল্লেখ করে হালকা হলাম।

ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়া হচ্ছে বলে অনেকে মনে করতে পারেন, কিন্তু দুই বাঙলায় জীবনীপ্রকাশের দৃষ্টিভঙ্গির একটি তুলনামূলক আলোচনা করেই আমার সমালোচ্য গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রবেশ করতে চেয়েছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ যাঁদের অচ্ছুত করে রেখেছেন বাংলাদেশ তাঁদের জীবনী বের করছেন। এদিক দিয়ে সাহিত্যসাধক চরিতমালা পরিপূরক হয়ে উঠছে 'জীবনী গ্রন্থমালা'। সাহিত্যসাধক চরিতমালার সব গ্রন্থই সচিত্র নয়—যে কয়েকটি আছে তাতে লেখকের শুধু একটি চিত্রই দেওয়া হয়েছে। এদিক দিয়ে বাংলাদেশের জীবনী গ্রন্থমালার প্রতিটি গ্রন্থই সচিত্র; এক বা একাধিক চিত্র যেমন আছে তেমনি অনেকস্থলে লেখকের হাতের লেখা ব্লক করে দেওয়া হয়েছে, এবং সেহেতু প্রতিটি গ্রন্থই আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। চরিতমালার আকার ডবল ক্রাউন, জীবনী গ্রন্থমালার আকার ⅛ ডিমাই। সমর মজুমদারের আঁকা সরল অভিজাত প্রচ্ছদ রঙ পালটিয়ে পালটিয়ে প্রতিটি গ্রন্থের প্রচ্ছদরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি গ্রন্থই নয়নাভিরাম হয়ে উঠেছে। চরিতমালার মতো খুচরো জীবনী-গ্রন্থগুলিকে খণ্ডে-খণ্ডে গ্রথিতও করা হয়েছে।

তথ্যের পুঞ্জীভূত তালিকা প্রদান অর্থাৎ জনগণের ভাষায় which begins with a man's pedigree and ends with his funeral সাহিত্যসাধক চরিতমালা মূলত এই ভঙ্গিতেই আগাগোড়া বিন্যস্ত। কাজেই এই সিরিজের অন্তর্ভুক্ত জীবনী লেখকদের বাঁধাধরা ছকেই প্রতিটি জীবনীকে সাজাতে হয়েছে। প্রতিটি বই সাধুভাষায় লেখা, একমাত্র ব্যতিক্রম একাদশ খণ্ডের রামপ্রাণ গুপ্ত (পৌষ ১৩৭৮, সংখ্যা ১০৯)। প্রতিটি বইয়ের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১০০ পৃষ্ঠার বেশি হবার কথা নয়, বরং কম রাখার কথা। একমাত্র ব্যতিক্রম দশম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী (পৌষ ১৩৭১, সংখ্যা ১০১) যার পৃষ্ঠা-সংখ্যা ২১৪। ওপার বাঙলার জীবনী গ্রন্থমালা এই তথ্যাশ্রয়ী ভঙ্গিতেই রচিত, প্রতিটি গ্রন্থ চলতি ভাষায় লেখা। মোটামুটি ৫০ থেকে ৯০ পৃষ্ঠার মধ্যে এপর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থাদি সীমাবদ্ধ। লেখকরা বিন্যাসকরণে কিছু কিছু স্বাধীনতা নিয়েছেন, কিন্তু তাতে বইয়ের উদ্দেশ্য কোথাও ব্যাহত হয় নি।

এতক্ষণ যে কথাগুলি বলছি তার মধ্যে বাংলা একাডেমী প্রকাশিত জীবনী গ্রন্থমালার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে পাঠককে মোটামুটি একটা ধারণা দিতে চেষ্টা করেছি এবং সমালোচনা হিসেবে মোটা কথাগুলো বলেই দিয়েছি। কিন্তু আরও কিছু কথা বলতে হবে এই কারণে, যে বইগুলি সমালোচনার জন্য দেওয়া হয়েছে তাঁদের সম্পর্কে এপার বাঙলার পাঠকরা পরিচিত নন। আমি এবার পরপর বইগুলির পরিচয় সংক্ষেপে উল্লেখ করে যাব। মোট নটি বইএর মধ্যে প্রথম সাতখানা বইএর প্রকাশকাল ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, শেষোক্ত দুখানা বইয়ের প্রকাশকাল ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮।

আ ব দু ল ক রি ম সা হি ত্য বি শা র দ কোনরূপ স্বীকৃতি বা পুরস্কারের প্রত্যাশা না করে বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধানই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, স্বআরোপিত দায়িত্ব নিজেই নিষ্ঠাভরে সারাজীবন পালন করে গেছেন। এই অনন্যকৃতি সাহিত্যসাধকের সার্বিক পরিচয় তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র প্রখ্যাত গবেষক পণ্ডিত ড. আহমদ শরীফ ৫৮ পৃষ্ঠার মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন। সাহিত্যবিশারদের জীবনের প্রধান ঘটনাসমূহ যেমন বিবৃত করেছেন, তেমনি ঘরোয়া জীবনে তিনি কেমন ছিলেন তার সজীব বর্ণনা দিয়েছেন। ফলে এই ক্ষুদ্র জীবনীতে পুরো মানুষকে এক ঝলকে চেনা যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন এ স ও য়া জে দ আ লী র ওপর লিখেছেন। ওয়াজেদ আলীর জন্ম ১৮৯০, ৪ঠা সেপটেমবর হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার বড়তাজপুর গ্রামের এক অভিজাত পরিবারে। তাঁর মাতৃভাষা বাঙলা ছিল না—প্রমথ চৌধুরীর উৎসাহে তিনি বাঙলা শেখেন এবং লিখতে শুরু করেন। 'অতীতের বোঝা' নামে তাঁর প্রথম বাঙলা প্রবন্ধ সবুজপত্রের বৈশাখ-আশ্বিন ১৩২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধ, গল্প, ভ্রমণকাহিনী রচনা করেছেন। তাঁর দুঃখময় জীবনের বেদনাকে দু-একটি কথায় যেমন আকরম সাহেব তুলে ধরেছেন তেমনি তাঁর রচনাবলীর পরিচয় স্বল্প কথায় বেশ সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলেছেন এবং তাঁর রচনার নিদর্শনও তুলে দিয়েছেন যার সাহায্যে পাঠকরা তাঁর রচনার সাবলীলতা সম্পর্কে একটা ধারণা পাবেন। বর্তমানে তাঁর কোনো গ্রন্থ ছাপা নেই—পাঠকদের কাছে বর্তমানে ঐ রচনার নিদর্শনটুকু সম্বল। ওয়াজেদ আলী সাহেব ব্যক্তিজীবনে এক উদারহৃদয় মানুষ ছিলেন, ধর্মীয় গোঁড়ামি তাঁর ছিল না, মুক্তমনের মানুষ ছিলেন বলেই তিনি বলতে পেরেছিলেন 'আমরা নিজেদের মুসলমান বলে মনে করি, নিজেদের ভারতবাসী বলে মনে করি, আর সর্বোপরি নিজেদের মানুষ বলে মনে করি; আমাদের সাহিত্যে আমাদের এইসবগুলি বিশেষত্বকেই সম্যকরূপে ফুটিয়ে তুলতে হবে তা না হলে আমাদের সাহিত্যসাধনা সার্থক হবে না, তার মধ্যে বড় একটা অভাব, বড় একটা শূন্যতা থেকে যাবে।' সেজন্য তিনি তাঁর নিজের পরিচয় দিয়েছেন, 'আমি মুসলমান সমাজের বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ, আমি ভারতবাসী বটে, আমি বাঙাল বটে, কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ।' এই সাহিত্যপুরুষের জীবনাবসান ঘটে ১৯৫১, ১০ই জুন। ঢাকার বাংলা একাডেমী ওয়াজেদ আলীর জীবনী প্রকাশ করে আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হয়েছেন আর জীবনীলেখক হিসেবে আকরম সাহেবের কৃতিত্বও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"আজাদ" পত্রিকার সম্পাদকরূপে আ বু ল কা লা ম শা ম সু দ্দী নে র খ্যাতি ও অখ্যাতি দুইই স্মরণীয় হয়ে আছে। হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে শামসুদ্দীন সাহেব এক সাম্প্রদায়িক সাংবাদিকরূপে চিত্রিত আর এক সম্প্রদায়ের কাছে তিনি হিরো রূপে পূজিত। বর্তমান জীবনালেখ্য পাঠ করলে সাম্প্রদায়িক হিসেবে তাঁর যে পরিচয় আমাদের এধারে গড়ে উঠেছে তার অপনোদন হয় এবং সাংবাদিকতার বাইরে তিনি যে একজন সার্থক অনুবাদক প্রবন্ধকার ছিলেন এ পরিচয় আমরা জানতেই পারতাম না যদি না ড. ভুঁইয়া ইকবাল আমাদের জানাতেন। অর্ধ শতাব্দীর উপরকাল সংবাদপত্রের জগতে তিনি বিপুল দাপটে রাজত্ব করেছেন। এই বর্ণময় সাংবাদিকের জীবনকথা লেখক ছটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে বিবৃত করেছেন—জন্ম বংশপরিচয়, রাজনীতি, সাংবাদিকতা, সাহিত-সাধনা, রচনাপঞ্জী ও জীবনপঞ্জী। শামসুদ্দীন সাহেবের জন্ম হয় ১৮৯৭ ৩রা ডিসেমবর ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার ধানীখোলা গ্রামে। ঢাকা কলেজ থেকে আই. এ. পাশ করে কলকাতার সুরেন্দ্রনাথ কলেজে বি. এ ক্লাসে ভর্তি হন। তখন দেশজুড়ে চলছে অসহযোগ আন্দোলন—আন্দোলনে নেমে আর পড়া হয়নি। ১৯২১ সালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় গোটা সংসারের ভার জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে তাঁর ওপর পড়ে—রাজনীতি ত্যাগ করে বাধ্য হয়ে সাংবাদিকতায় চাকরি নিতে হয় ১৯২২-এর জুন মাসে। ১৯২২এ যার শুরু তা শেষ হল ১৯৭৮-এর ৪ঠা মার্চ। মওলানা আকরম খাঁর (১৮৭০-১৯৬৮) দৈনিক মোহম্মদীর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। পরে মোহম্মদী বন্ধ করে দৈনিক সেবক বের করেন আকরম খাঁ—এই কাগজের সঙ্গে শামসুদ্দীন যুক্ত হন। সেবক বন্ধ হয়ে যাবার পর সাপ্তাহিক 'মোসলেম জগৎ'-এর সহকারী সম্পাদক হন। ১৯২৬ সালে শামসুদ্দীন মৌলবী মুজীবর রহমান সাহেবের 'দি মুসলমান' পত্রিকায় যোগ দেন। এরপর কয়েকটি খুচরো কাগজে কাজ করার পর ১৯৩৬ সালে আকরম খাঁ প্রতিষ্ঠিত 'দৈনিক আজাদ'-এ যোগ দেন—১৯৪০ সালে ঐ পত্রিকার সম্পাদক হন। 'আজাদ'ই তাঁকে সাংবাদিক জগতে প্রতিষ্ঠিত করে এবং এরপর থেকে তাঁকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয় নি। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যেমন সংবাদপত্রের জগতে এক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন তেমনি শামসুদ্দীন ওপার বাংলায় সাংবাদিক জগতে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্‌ 'আজাদ'-এর ঐতিহাসিক ভূমিকার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেছেন, "একটি দৈনিক সংবাদপত্ররূপে বিচার করলে চলবে না, এই পত্রিকার আদর্শ উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যের কথাও বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। ...আসাম ও বাঙলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর মুখপত্র—নবজাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনের স্বাধীনতা সংগ্রামের বাণীবাহক এবং হাতিয়ার।' (মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতা ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন পৃ ৩১-৩২)। ওপার বাঙলায় সাংবাদিক জগতে তিনি ছিলেন পিতৃপ্রতিম। বহু তরুণ সাংবাদিক হাতে কলমে তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছেন। আবুল ফজলের (১৯০৩-১৯৮৩) কথায় পেশাগত ক্ষেত্রে তাঁর আন্তরিকতা ছিল অকৃত্রিম ও সঠিক।'

(আবুল কালাম শামসুদ্দীন স্মারকগ্রন্থ পৃ ১১) দেশবিভাগের পর আজাদ ঢাকা চলে যায়। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধের দরুন ১৯৬২ সালে আজাদ ত্যাগ করে ১৯৬৪ সালে 'দৈনিক পাকিস্তান' কাগজের সম্পাদক হন, ১৯৭২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। সাংবাদিকতা শুধু নয় সাহিত্যরচনাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল। তুর্গেনিভের 'ভার্জিন সয়েল' 'টরেন্টো অব স্প্রিং' কিছু খুচরো গল্প হারলড ল্যাম্বের 'টাইমুর দি লেম' গ্রন্থের তরজমা করেছিলেন, ইলিয়ডের গদ্যানুবাদ করেছিলেন 'দৃষ্টি কোণ' নামে তাঁর প্রবন্ধের সংকলন আছে, 'অতীতদিনের স্মৃতি' নামে তাঁর আত্মজীবনী আছে। সাংবাদিকরূপে তিনি চীনে গিয়েছিলেন—ভ্রমণমূলক অভিজ্ঞতা 'নতুন চীন নতুন দেশ'-এ লিপিবদ্ধ করেছেন। শিশুদেরও বঞ্চিত করেন নি। ভাষা আন্দোলনেও তাঁর ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে আছে। একুশে ফেবরুয়ারির আন্দোলনে ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের গুলি-বর্ষণের প্রতিবাদে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করে-ছিলেন, "আজাদে" এক জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় লিখেছিলেন (২৩শে ফেবরুয়ারি ১৯৫২) আমৃত্যু সাংবাদিকতা ও সাহিত্যের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন কিন্তু এই সংগ্রামী সাংবাদিকের প্রকৃত পরিচয় এপারের মানুষ জানেন না, যেটুকু জানেন সেটুকু নিন্দার্থে জানা—ভুলেও কোন প্রসঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারিত হয় না। অথচ ওপার বাঙলায় তিনি বহু প্রতিষ্ঠান থেকে সংবর্ধিত হয়েছেন, তাঁর সম্পর্কে একাধিক গ্রন্থ বেরিয়েছে তাঁর মৃত্যুর পর। সিরাজুল ইসলাম সাগর সম্পাদিত 'আবুল কালাম শামসুদ্দীন স্মারক গ্রন্থ' (১৯৭৯) মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ রচিত মুসলিম বাংলার সাংবাদিক ও আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৯৮৩) দুটি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। বাঙলা একাডেমী তাঁকে জীবনী গ্রন্থ-মালায় অন্তর্ভুক্ত করে যেমন জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন তেমনি ভূঁইয়া ইকবাল শামসুদ্দীন সাহেবের জীবনী যোগ্যতার সঙ্গে রচনা করেছেন।

গো লা ম মো স্তা ফা র নাম ও কবিতার সঙ্গে এ-কালের তরুণ ও অনতিতরুণ পাঠকরা পরিচিত নন বলেই মনে হয়। আমাদের পাঠ্যাবস্থায় তাঁর কবিতা পাঠ্যপুস্তকে অতিঅবশ্যই থাকত—তাঁকে বাদ দিয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনাই হত না। তাঁর সেই বিখ্যাত কবিতার লাইন 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুদের অন্তরে' ভোলার নয়। আজকের অনেক পাঠক এই পঙক্তিটি শুনেছেন কিন্তু রচয়িতা কে তা জানেন বলে মনে হয় না। আমাদের সময় ম্যাট্রিকুলেশন পাঠ্যবইয়ে 'রাখীভাই' কবিতা ছিল যদিও সেটি সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত ছিল না—না থাকলেও সেই সময়কার পড়ুয়ারা তাঁর নাম জানত। কোন অজ্ঞাত কারণে আজকাল তাঁর কবিতা পাঠ্যবইয়ে অন্তর্ভুক্ত হয় না। গোলাম মোস্তাফা রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের একজন কিন্তু তাঁকে নিয়ে আলোচনা হয় নি। তাঁর জন্ম ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলার মনোহরপুর গ্রামে। দৌলতপুর কলেজ থেকে আই. এ পাশ করে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে বি. এ পাশ করেন। ১৯২০ সালে ব্যারাকপুর গভর্নমেণ্ট হাই স্কুলে শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষাজীবনের অধিকাংশ কাল এপার বাঙলায় ব্যয়িত হয়। ব্যারাকপুর থেকে কলকাতার হেয়ার স্কুলে ন বছর শিক্ষকতা করার পর কলকাতা মাদ্রাসায় বদলি হন। বালিগঞ্জ গভর্নমেণ্ট হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করার পর হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে বদলি হন। এখান থেকেই তিনি বাঁকুড়া সরকারি স্কুলে যান তারপর দেশভাগের পূর্বেই ১৯৪৬ সালে ফরিদপুর জেলা স্কুলে বদলি হন এবং ১৯৫০ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ২৬ বছর কাল তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন এবং সেই সময়কালের মধ্যেই তাঁর কাব্যগ্রন্থ, উপন্যাস, জীবনীগ্রন্থ কলকাতা থেকেই বেরিয়েছে। মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ গোলাম মোস্তাফার জীবনীর সঙ্গে তাঁর কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন, ধর্মের প্রতি মোস্তাফা সাহেবের নিষ্ঠা এবং এই নিষ্ঠা মুসলিম সমাজের জাগরণে সহায়তা করেছে একথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। নির্ধারিত পরিসরের (৪০ পৃ.) মধ্যে তিনি বেশ নিপুণতার সঙ্গে গোলাম মোস্তাফার চরিত্র-চিত্রণ উপাদেয় করে তুলেছেন।

আ ব দু ল কা দি র বিদ্বৎসমাজ পরিচিত নাম বিশেষত বিভাগোত্তর বাঙলাদেশে ১৯৪৬ সালে তাঁর সম্পাদিত 'কাব্য মালঞ্চ' একটি স্মরণীয় সংকলনরূপে আজও বন্দিত যদিও বইটি বহু বছর আগে নিঃশেষিত। ছান্দসিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি এপার বাঙলাতেও ছড়িয়েছে। ছন্দ আলোচনার ক্ষেত্রে এপার বাঙলায় প্রবোধচন্দ্র সেন যেমন ছিলেন, ওপার বাংলায় তেমনি ছিলেন আবদুল কাদির। ১৯০৬ সালে ১লা জুন দক্ষিণবেড়িয়ার আড়াইসিদ্ধা গ্রামে তাঁর জন্ম হলেও তাঁর জীবনের দীর্ঘ বাইশ বছর কলকাতায় কেটেছে। কলকাতা করপোরেশনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতা দিয়ে তাঁর চাকুরিজীবনের সূত্রপাত। ১৯৩৫ সালে কমরেড মুজফফর আহমদের কন্যা আফিফা খাতুনের সঙ্গে তাঁর

বিবাহ হয়। বিবাহের উদ্যোক্তা ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। করপোরেশনে শিক্ষকতা করতে-করতেই তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বি. এ পড়ার সময় 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনে শামিল হন। ১৯৩০ এপ্রিল থেকে 'জয়তী' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নজরুল, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল ফজল প্রমুখের রচনাদি প্রকাশিত হয়। 'নবশক্তি' 'যুগান্তর' 'মোহম্মদী' 'পয়গাম' 'বাঙলার কথা' 'কৃষক' প্রভৃতি দৈনিক সাপ্তাহিক পত্রে সাংবাদিকতা করেছেন। ১৯৫২ সালে কলকাতা ছেড়ে ঢাকা আসেন। তিনি প্রথমে 'মাহেন ও' পত্রিকার সম্পাদক হন, তারপর কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের পাবলিকেশন অফিসার হন। ঢাকায় এসে তিনি নজরুল ইসলাম, এয়াকুব আলী চৌধুরী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাজী ইমদাদুল হক, আবুল হুসেন, বেগম রোকেয়া, লুৎফর রহমান রচনাবলী যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদনা করেন। কাজী আবদুল ওদুদ, ড. মুহম্মদ এনামুল হক সাহেবের ওপর তাঁর গ্রন্থ রয়েছে। ১৯৮৪-র ১৯শে ডিসেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুর তিন বছরের মধ্যেই তাঁর সম্পর্কে একটি তথ্যমূলক জীবনীগ্রন্থ বের করে ফেলায় যেমন একাডেমীর কৃতিত্ব তেমনি জীবনীলেখক ড. রফিকুল ইসলামের তথ্যসমৃদ্ধ জীবনালেখ্যটি আবদুল কাদিরকে চিনে নিতে সাহায্য করে।

আ ব দু ল ম ন সু র আ হ ম দে র ব্যঙ্গাত্মক লেখক হিসেবে খ্যাতি ছিল। তাঁর 'আয়না' 'ফুড কনফারেন্স' ব্যঙ্গ গল্পের সংকলনের কথা কোন কোন বয়স্ক পাঠকদের মনে থাকতে পারে। কর্মজীবনে তিনি ওকালতি, সাংবাদিকতা ও রাজনীতি করেছেন—পূর্ব পাকিস্তানে রাজনীতি করতে গিয়ে কারাদণ্ড হয়েছে তাঁর, আতাউর রহমানের মন্ত্রিসভায় ৬ দিনের জন্য শিক্ষামন্ত্রীও হয়েছিলেন। নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে ১৮৯৮ ৩রা সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহের ধানীখোলা গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৭৯ ১৮ই মার্চ ৮১ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। আবুল মনসুর আহমদ যা কিছু লিখেছেন তার মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ রয়েছে 'আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর' 'শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু' কিংবা 'আত্মকথা' গ্রন্থগুলিতে তাঁর সময়কার রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনৈতিক বাতাবরণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মৃত্যুতে 'দৈনিক ইত্তেফাক' সম্পাদকীয় মন্তব্য করেছিলেন, "আবুল মনসুর আহমদ ছিলেন সেদিনের বাঙলার জাতীয় জাগরণের এক নূতন জোনাথান সুইফট। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শানিত কশাঘাত সেদিন বাঙলার জাগ্রত মানসকে সকল কলুষ ও কালিমা হইতে মুক্ত করিয়াছিল।" (১৯. ৩. ১৯৭৯) জনাব নুরুল আমিন এই লেখকের জীবন ও সাহিত্যকর্মের সম্যক পরিচয় দান করে সাহিত্য পাঠকের অভাববোধ পূরণ করেছেন।

কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী পড়তে গিয়ে আমরা এপারের লোকেরা বাহার ও নাহার ভাইবোন নামের সঙ্গে পরিচিত। চট্টগ্রামে নজরুল এঁদের বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। 'সিন্ধু-হিল্লোল' কাব্যগ্রন্থটি তাঁদের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। দুটি ভাইবোনের এটুকুই পরিচয় নয়—পরবর্তী কালে দু'জনেই নিজেদের ক্ষেত্রে কৃতী হয়েছিলেন। ১৯০৬ সালে নোয়াখালির গুতুয়া গ্রামে হ বি বু ল্লা হ বা হা রে র জন্ম হয়। শৈশবে পিতৃহীন হওয়ায় নানার বাড়ি চট্টগ্রাম শহরে মানুষ হন। অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল তাঁর স্কুল-কলেজজীবনের সহপাঠী ছিলেন। চট্টগ্রাম থেকে আই. এসসি পাশ করে কিছুকাল কলকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়েন। ডাক্তারি পড়া তাঁর ভালো লাগল না। ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমান মৌলানা আজাদ কলেজ) থেকে বি-এ পাশ করেন। ছাত্রজীবন থেকে তিনি রাজনীতি করতেন--কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, মুসলিম লীগ, অহিংস সহিংস বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ ছিল। শেষে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করলেও সবার সঙ্গে তাঁর প্রীতি-সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি—তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের দরুনই এটি সম্ভব হয়েছিল। তাঁর সম্পাদিত 'বুলবুল' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ, অন্নদাশঙ্কর রায়, দিলীপকুমার রায়, যদুনাথ সরকার, মোহিতলাল মজুমদার, সুশোভন সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের রচনা প্রকাশিত হয়েছে। বাহারের জীবনীলেখক আবু জাফর শামসুদ্দীন এই সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'বাহার মুক্তবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সর্বপ্রকার অন্ধসংস্কার মুক্ত লেখক-সম্পাদক ছিলেন বলেই এই অসাধ্য সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আজকের দিনের স্বাধীন বাংলাদেশেও 'বুলবুলের' মতো উচ্চমানের মাসিক-ত্রৈমাসিক পত্রিকা বিরল।' (পৃ ৩৩) বাহার রাজনীতি ও পত্রিকা সম্পাদনার ফাঁকে-ফাঁকে একাধিক গ্রন্থও রচনা করেছেন। পূর্ববঙ্গ সরকারের তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৪ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হন—মন্ত্রীর দায়িত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৬৬ ৩রা জানুয়ারি পরলোক গমন করেন। আবু জাফর শামসুদ্দীন

বাহার সাহেবের জীবনকথা ৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে এমনভাবে তুলে ধরেছেন মনে হয়েছে তার বাইরে আর কোনো কথা থাকতে পারে না।

এমন অসময়ে চলে যাওয়ার কথা ছিল না মু হ ম্ম দ আ ব দু ল হা ই য়ে র, যিনি একজন প্রখ্যাতনামা ভাষাবিজ্ঞানী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর অধ্যক্ষতায় বাঙলা বিভাগের প্রভূত উন্নতিসাধন হয়েছিল। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৭৯) ও ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের (১৯০৯-১৯৮৪) প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ১৯১৯, ২৬শে নভেমবর মুর্শিদাবাদ জেলার রানানগর থানার মরিচা গ্রামে হাই সাহেবের জন্ম হয়। তাঁর ছাত্রজীবন বরাবর উজ্জ্বল ছিল, তাঁর লেখাপড়া রাজসাহী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথম কর্মজীবন ঢাকার ইসলামিক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে। তারপর সরকারি কলেজের বাঙলা-বিভাগের প্রভাষক রূপে (লেকচারার) কৃষ্ণনগর কলেজে ১৯৪৩, ৫ই মার্চ থেকে ১৯৪৭, ৩০শে অগস্ট পর্যন্ত তিনি কর্মরত ছিলেন। এখান থেকে তিনি রাজশাহী সরকারি কলেজে চলে যান, তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢেলে নতুনভাবে সাজান—ভাষাতত্ত্ব বিভাগকে সমৃদ্ধ করেন। নিজে বিলেত গিয়ে ভাষাবিজ্ঞান পড়ে আসেন এবং অনেককে বিদেশে পড়িয়ে আনেন। বাঙলা বিভাগের সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনা তাঁর এক উজ্জ্বল কীর্তি। ১৯৬৯, ৩রা জুন ট্রেন দুর্ঘটনায় মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে মৃত্যু হয়। তাঁর জীবনকথা কর্মোদ্যম ও সাহিত্যসেবার যাবতীয় তথ্য ৮০ পৃষ্ঠার মধ্যে সংগ্রহ করে মনসুর মুসা একজায়গায় মিলিত করেছেন। তথ্য সংগ্রহে তাঁর নিষ্ঠা এবং ব্যাখ্যানে তাঁর কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে (১৯৭৬) হাইসাহেব সম্পর্কে বাঙলাদেশ থেকে একটি বড় বই বেরিয়েছে। মুসা সাহেবের বইটি ছোট হলেও হাইসাহেবের সর্বাবয়ব পরিচয় বহন করে।

বাঙলাদেশ ভাগ হয়ে যাবার পর ব ন্দে আ লী মি ঞা একমাত্র লেখক ছিলেন যিনি উভয় বাঙলার কাগজপত্রে লেখা পাঠাতেন এবং এপার বাঙলার শিশুসাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকরা আগ্রহভরে তাঁর লেখা প্রকাশ করতেন। বন্দে আলী মিয়া প্রধানত ছোটদের লেখক হিসেবেই সমধিক প্রসিদ্ধ। সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে তিনি লেখনী চালনা করেছেন কিন্তু কোনটাই তাঁকে বিশিষ্টরূপে চিহ্নিত করতে পারে নি। বড়রা ভেবেছে তিনি ছোটদের লেখক, ছোটরা ভেবেছে তিনি বড়দের লেখক। কবিতায় তিনি যতটা সাফল্য অর্জন করেছিলেন গল্প-উপন্যাস-নাটকে তিনি ততটা সফল হতে পারেন নি। শিশুসাহিত্য রচনায় তিনি সবচেয়ে বেশি সফলতা দেখিয়েছেন এবং এ ক্ষেত্রটিই তাঁর প্রতিভা স্ফুরণের যথোপযুক্ত ছিল। ১৯০৬ ১৫ই ডিসেমবর পাবনার রাধানগরে বন্দে আলী মিয়ার জন্ম হয়। ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতার ইণ্ডিয়ান আর্ট একাডেমিতে ভর্তি হন, কোর্স শেষ করেছিলেন পরীক্ষা না দিয়ে, কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে পড়তে শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত বাঁধাধরা পড়াশুনা তাঁর ভালো লাগল না। কলকাতা করপোরেশনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার পদ নিয়ে চাকরিজীবন শুরু করলেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত এই চাকরি করেন। তারপর রাজশাহী বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে শেষদিন পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন। কবিতা ও আঁকা তাঁর এক সঙ্গে চলেছে—পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা ও ছবি বেরুতে লাগল। 'ময়নামতীর চর' তাঁর কাব্যগুচ্ছ রবীন্দ্রনাথের প্রশংসা অর্জন করেছিল। ছোট-বড় মিলিয়ে তাঁর পুস্তকের সংখ্যা ১৩৬। ১৯৭৯, ২৭শে জুন তিনি পরলোকগমন করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের প্রফেসর ড. গোলাম সাকলায়েন বন্দে আলী মিয়ার জীবন ও সাহিত্যের ওপর বইটি লিখেছেন। মোট ৮টি অধ্যায়ে বইটি রচিত। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর জীবনের প্রতিটি ঘটনা তিনি সাল-তারিখ দিয়ে উল্লেখ করেছেন কিন্তু রচনাগুণে সেটি শুষ্ক তালিকায় পরিণত হয় নি। রচনাশৈলীর সাবলীলতায় বইটি পাঠকের মনকে শেষ পর্যন্ত টেনে রাখে। 'জীবন-দর্শন ও সাহিত্য বৈশিষ্ট্য' অধ্যায়ের বন্দে আলী মিয়ার সার্বিক মূল্যায়ন বেশ হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। বন্দে আলী মিয়া সম্পর্কে প্রথম বই 'বন্দে আলী মিয়া স্মারক গ্রন্থ' (১৯৮০) যেটি গোলাম সাকলায়েনই সম্পাদনা করেছিলেন, দ্বিতীয় গ্রন্থ তসিকুল ইসলামের 'শিশুসাহিত্যে বন্দে আলী মিয়া' বর্তমান গ্রন্থটি বন্দে আলী মিয়ার জীবনের সামগ্রিক আলোচনার বই। পরবর্তী গবেষকরা এই বই থেকে প্রচুর সহায়তা পাবেন। বন্দে আলী মিয়ার বহু গান একাঙ্কিকা নক্সার রেকর্ড হয়েছে। সাকলায়েন সাহেব বহু পরিশ্রম করে তার তালিকাও দিয়েছেন। রেকর্ড কোম্পানি ও রেকর্ড নং তিনি উল্লেখ করে পাঠকের হিতসাধন করেছেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অতীতপ্রীতি সম্পর্কে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় একবার 'ক্ষোভের সঙ্গে' মন্তব্য করেছিলেন যে সাহিত্য পরিষৎ মৃতদের প্রতি যতটা আগ্রহী, জীবিতদের প্রতি ততটা নয়। সাহিত্যসাধক চরিতমালা মৃতজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, জীবিতজনের প্রতি উপেক্ষা। জীবিত লেখকদের প্রতি কিছু করার কথা তিনি বলেছিলেন। পরিষৎকে সজীবতার স্পর্শ দিতে চেয়েছিলেন। বাংলাদেশও মৃতজনের জীবনী গ্রন্থমালা বের করছেন, তবে বাংলা একাডেমী প্রতি বছর সাহিত্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছেন। যে spirit নিয়ে তারাশঙ্কর কথাগুলো বলেছিলেন সেকথা মানা হয় নি, উপরন্তু তাঁর মৃত্যুর সতের বছর অতিক্রান্ত হবার পরও সাহিত্য পরিষৎ থেকে তাঁর জীবনী বেরোয় নি সেখানে অন্তত বাংলাদেশ সদ্যসদ্য মৃতজনের জীবনী প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বের করেছেন। এদিক দিয়ে তাঁদের কাজের স্তুতি উল্লেখ করার মতো। দুটি প্রতিষ্ঠানই যখন মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের সাধনায় রত তখন আলোচনার উপান্তে এসে একটি কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে সাহিত্যসাধক চরিতমালা ও ঢাকার জীবনী গ্রন্থমালা যুক্ত করে পড়লে সামগ্রিক বঙ্গ সাহিত্যের হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যসাধকদের পরিচয় যেমন পাব তেমনি বঙ্গসংস্কৃতির অখণ্ড রূপটির সঙ্গেও আমাদের পরিচয় হয়ে যাবে।

তিনজন প্রথিতযশা বাঙালি প্রসঙ্গে

রণেন্দ্রনাথ দেব

শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতি বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেছেন তিনি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে ১৩৪৬ সালে যে বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয় তাতে "বর্ণপরিচয়" প্রথম ভাগের ষষ্টিতম সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে। এর পূর্বেকার আর কোনো সংস্করণ এখনো পাওয়া যায় নি। শ্রীঅধিকারী লনডন থেকে "বর্ণপরিচয়ে"র একবিংশ মুদ্রণের একটি জেরক্স কপি সংগ্রহ করে এই গ্রন্থে মুদ্রিত করেছেন। "বর্ণপরিচয়" রচনার ইতিহাস বলতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় "বর্ণপরিচয়" রচনা করেন তাঁর অন্যান্য পাঠ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর। বিলম্বের কারণ, তিনি দীর্ঘকাল ধরে চিন্তা করে বাঙলার বর্ণসমূহকে ক্রমপর্যায়ভুক্ত করেন এবং অপ্রয়োজনীয় বর্ণাদি বাদ দেন। "বর্ণপরিচয়" তাঁর দীর্ঘ চিন্তার ফসল, এবং এর পেছনে তাঁর সামগ্রিক শিক্ষানীতিরও ছায়াপাত লক্ষ করা যায়।

সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদক, পরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয় কলেজের পাঠনপ্রণালী এবং পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হন। অবান্তর, অনাবশ্যক বিষয়ে বাদ দিয়ে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পাঠ্যক্রম সাজিয়ে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার ক্ষেত্রে যুগান্তর আনেন। তিনি প্রথমেই প্রশ্ন তোলেন, মুগ্ধবোধের মতো দুরূহ তথা অতিসংক্ষিপ্ত ব্যাকরণপাঠ দিয়ে সংস্কৃতশিক্ষা শুরু হবে কেন? তিনি চেয়েছিলেন মাতৃভাষাকে ভালোভাবে আয়ত্ত করার জন্যই সংস্কৃত শেখাতে হবে এবং বাঙলা ব্যাকরণ এমনভাবে লিখতে হবে যার মধ্যে দিয়ে ছাত্ররা প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণের আভাস পায়। ১৮৫৩ সালে তিনি শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ড মোয়াটকে একটি চিঠিতে লেখেন,

> Leave me to teach Sanskrit for the leading purpose of thoroughly mastering the Vernacular and let me superadd to it the acquisition of sound knowledge through the medium of English.

এ কাজে বিদ্যাসাগর মশায় গোড়ার দিকে ইংরাজ শাসকদের সহযোগিতা পান, কিন্তু পরে শিক্ষা অধিকর্তা গর্ডন ইয়ং-এর প্রতিকূল আচরণে বিক্ষুব্ধ বোধ করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি চাকরি ছেড়ে দেন। নিজে একটি প্রেস স্থাপন করে পাঠ্যপুস্তক ছাপাতে শুরু করেন, এবং সরকারি যন্ত্রের বাইরে থেকেও তিনি শিক্ষাব্যবস্থাকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করেন। শ্রীঅধিকারী বিদ্যাসাগরের সংস্কারচেষ্টার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র দিয়েছেন। সেই সঙ্গে পরিশিষ্টে দিয়েছেন সংস্কৃত কলেজ সংস্কার প্রস্তাব, শিক্ষাপরিষদের সম্পাদক ড মোয়াটকে লেখা

বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতি ও বর্ণপরিচয়—সন্তোষকুমার অধিকারী। অনন্য প্রকাশন, ৬৬ কলেজস্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩। নভেমবর ১৯৮০। পৃ ১২৮। ষোলো টাকা।

বিজ্ঞান-পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র বসু—ড বিমলেন্দু মিত্র। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭০০০০৯। জানুয়ারি ১৯৮৬। পৃ ১৩৮। ষোলো টাকা।

মেঘনাদ সাহা: জীবন ও সাধনা—সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র। শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, কলিকাতা ৯। মার্চ ১৯৮৮। পৃ ১৪১। পঁচিশ টাকা।

চিঠি (৭. ৯. ১৮৫৩) এবং বাঙলা শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে মন্তব্যের বঙ্গানুবাদ। এ কারণে পরিশিষ্ট অংশটি মূল্যবান বিবেচিত হবে।

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বাঙালির শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় কখনো ফুরোবার নয়। শ্রী অধিকারীর গ্রন্থ পাঠকদের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করবে।

বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনার স্বল্পতা সর্বজনবিদিত। ইদানীং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের জীবনকথাবিষয়ে জ্ঞান আহরণের উপর জোর দেওয়ায় অন্তত বিজ্ঞানীদের জীবনবৃত্ত বিষয়ে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ জেগে উঠেছে। তারা জগদীশচন্দ্র ও মেঘনাদ সাহার জীবনী দুটি পড়ে উপকৃত হবে। শুধু ছাত্রছাত্রী নয়, সব শিক্ষিত বাঙালির কর্তব্য জগদীশচন্দ্র এবং মেঘনাদ সাহার কীর্তিকথা স্মরণ।

জগদীশচন্দ্র প্রথম ভারতীয় বিজ্ঞানী (প্রথম এশিয়াবাসী বিজ্ঞানী বলাই সঠিক) যিনি পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীদের সমকক্ষতা দাবি করেছেন। ড বিমলেন্দু মিত্র জগদীশচন্দ্রের বাল্য আর যৌবনের পটভূমিকা বিবৃত করে তিনি কিভাবে বহু প্রতিকূলতার মধ্যে নিজের গবেষণা চালিয়েছিলেন তার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। অদম্য মনোবলের বশে জগদীশচন্দ্র বিদেশে গিয়ে বিজ্ঞানসভায় আপনার আবিষ্কারসমূহ প্রতিষ্ঠা করেন। ওয়ালারের মতো খ্যাতনামা বিজ্ঞানীর বিরোধিতা, অর্থকষ্ট, বাঙলার শিক্ষাবিভাগের অসহযোগ—এই সমস্ত বাধা তিনি জয় করেন অসীম মনোবলে। ড মিত্র এই প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার ভূমিকাটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। জগদীশচন্দ্র নিবেদিতার প্রতি কতখানি কৃতজ্ঞ ছিলেন তা বোঝা যায় বসুবিজ্ঞানমন্দিরের প্রবেশপথে দীপবাহিনীর মূর্তিটি দেখে। লেখক জগদীশচন্দ্রের প্রধান কৃতিসমূহের পরিচয় যতটা সম্ভব সরল ভাষায় দিয়েছেন। একটি অধ্যায়ে জগদীশচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার প্রসঙ্গও উল্লেখিত হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে দিয়েছেন মানুষ জগদীশচন্দ্রের অন্তরঙ্গ প্রতিকৃতি। বইটি সুখপাঠ্য। সেই সঙ্গে বেশ কিছু চিত্র আর নকশা সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থের গৌরব বেড়েছে।

দুয়েকটি বিষয়ে আমাদের কৌতূহল অপরিতৃপ্ত থেকে গেল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর অধ্যাপনা শুরু হলে স্যার আশুতোষ খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের ডেকে এনে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হন। কিন্তু বরেণ্য বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের স্থান হল না কেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে?

ড মেঘনাদ সাহার জীবনকথাটিও সুলিখিত এবং পরিশ্রম-প্রসূত। ড সাহার জীবনের ঘটনাপুঞ্জী খুব সুপরিচিত নয়। তেষট্টি বছর বয়সে তাঁর মৃত্যুকে অকালমৃত্যুই বলা যায়। এই জীবনের প্রধান ঘটনাবলী সুন্দরভাবে সাজিয়ে পরিবেশিত হয়েছে আলোচ্য বইটিতে। দরিদ্র পরিবারের সন্তান মেঘনাদ বৃত্তির টাকায় স্কুলে পড়তেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় স্কুলে ইংরাজ গভর্নরের পরিদর্শনের সময় বয়কটে শামিল হয়ে তিনি স্কুল থেকে বিতাড়িত হন ও বৃত্তি হারান। এই ঘটনা তাঁকে বিন্দুমাত্র দমিত করতে পারে নি। কৈশোরের এই একটি ঘটনা থেকে ড সাহার চরিত্রকে স্বচ্ছ দর্পণের মতো দেখতে পাই। তিনি ছিলেন আজীবন সত্যনিষ্ঠ এবং আপোসহীন সংগ্রামী।

ড সাহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর গবেষণার যে ব্যাপক পরিচয় দিয়েছেন লেখক সূর্যেন্দুবিকাশ কর মহাশয় তাতে ড সাহার অনুসন্ধিৎসার প্রসার আর গভীরতা দেখে স্তম্ভিত হতে হয়। লেখক বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি বেশ সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করায় পাঠক-সাধারণ এ বই পড়ে আনন্দ পাবেন। বাঙলার একজন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর আড়ম্বরহীন জীবনে যে অনন্ত জ্ঞানপিপাসা নিহিত ছিল, তাঁর সম্যক পরিচয় আমাদের মুগ্ধ ক'রে রাখে। মেঘনাদ সাহার পারিবারিক জীবনের বর্ণনাটিও মনোমত হয়েছে। সংগৃহীত চিত্রগুলি বইটির বিশেষ সম্পদ।

মেঘনাদ সাহা বীক্ষণাগার-কেন্দ্রিক বিজ্ঞানী-মাত্র নন। তিনি গজদন্তমিনারবাসীও ছিলেন না। দেশের এবং মানুষের মঙ্গলের জন্য তিনি সর্বদা এগিয়ে এসেছেন। কংগ্রেসের প্যানিং কমিটির কাজে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পরিশ্রম করেছেন এবং কখনো নিজের যুক্তিকে অন্যের প্রভাবে চালিত হতে দেন নি। নেহরুর সঙ্গে তাঁর মতসংঘর্ষ সবাই জানেন। যত দিন যাচ্ছে ততই অনুভূত হচ্ছে ড সাহা ভুল করেন নি।

লেখক ড সাহার ব্যাপক কৌতূহলের এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের বহু শাখায় শেষের দিকে অর্থশাস্ত্রে, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের বিবরণ দিয়েছেন। ড সাহা সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন। অনেকেই জানেন না যে ভাষাতত্ত্বেও তাঁর প্রচুর দখল ছিল। শুনেছি ছাত্রজীবনে প্রেসিডেনসি কলেজ পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন বাঙলাভাষায় 'ড়' সম্বন্ধে

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। আমার এক সহকর্মী সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ডি. লিট ডিগ্রি প্রথম প্রবর্তিত হয় তিনি রামায়ণের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ে উচ্চাঙ্গের গবেষণা করে ডি. লিট উপাধি লাভ করেন। কোনো উপলক্ষে আমার সহকর্মীটির সঙ্গে ড সাহার দেখা হলে তিনি তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে প্রশ্ন করে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সব জেনে নেন এবং রামায়ণের ভাষায় অ-পাণিনীয় প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেন। ড. সাহার মতো বহুমুখী-প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি যে-কোনো দেশে যে-কোনো কালে বিরল।

ড সাহার সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা উক্তিও শোনা যায়। কেউ-কেউ সাইক্লোট্রন যন্ত্র নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেছেন। লেখক তার সমুচিত জবাব দিয়েছেন এই বইয়ে।

দুটি জীবনকথাই আগ্রহ নিয়ে পড়বার মতো। দুটি গ্রন্থেরই প্রচ্ছদ সুন্দর, কিন্তু মুদ্রণ সে তুলনায় ভালো নয়।

তিনজন নবীন গল্পকার

কান্তি গুপ্ত

কিন্নর রায়ের "রথযাত্রা"য় সংকলিত হয়েছে চোদ্দটি ছোটো-গল্প। প্রথম তিনটি—"রথযাত্রা", "ভোজ", "পরিত্রাণক" গল্পে কিন্নরের রথ চলেছে ভারতের অন্তরাজ্য বিহারের প্রত্যন্ত প্রদেশে। সেখানে ভারতমাতার অন্ত্যজ শ্রেণীর যে সন্তান-সকল বসবাস করে, তাদের কপালে শ্বাপদরূপী জমিদার, মহাজন, ধর্মীয় গুরু, রাষ্ট্র-নেতা প্রভৃতি ভারতমাতার অপর উচ্চবর্গীয় অর্থ-প্রতিপত্তিতে বলবান সন্তানবর্গের নিরবচ্ছিন্ন নির্মম আঘাতের চিহ্ন। স্বাধীন ভারতে, সুরক্ষিত গণতন্ত্রে এরা কেবল মার খায়; মার দিতে মেরুদণ্ড উদ্যত করতে শেখে নি।

"রথযাত্রা"য় বর্ণিত হয়েছে রাজনৈতিক নেতা আর প্রভাবশালী হিন্দু-জমিদারের নির্দেশে ভাগলপুরের চামার-টোলীর ওপর চড়াও হওয়া এবং চামার মৌলী আর ভোলার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা। হিন্দুধর্মের একাত্মতা এবং ভারত-মাতার পুজার অঙ্গনের পবিত্রতা রক্ষা করার এসব কর্মকাণ্ড নিশ্চিত হয়ে ওঠে। এরকম মধ্যযুগীয় বর্বরতার নির্মম কাহিনী বর্ণিত হয়েছে "ভোজে"। সেখানে হত্যাকাণ্ডের উপায়টি ভিন্ন রকমের। মার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে জমিদার ধনিকলাল নিমন্ত্রিত বুভুক্ষু চামারটোলীর পাতের সামনে মুদ্রার ঝংকার তোলে। লোভ সামলাতে পারে না ভুখা-নাঙ্গা মানুষেরা। হাতে টাকা নেয়, অজগরের মতন গেলে। অতঃপর পথে যেতে-যেতেই প্রাণ হারায় চারজন চামার। পুরোনো এই খেলায় ধনিকলাল কিঞ্চিৎ ম্রিয়মাণ। ইচ্ছত বাড়ানো যায় নি। ঠাকুরমার শ্রাদ্ধে খাওয়ার সময় পাতের ওপরেই বমি করতে-করতে প্রাণ হারিয়েছিল এগারোজন। "পরিত্রাণক" হত্যাকাণ্ডের কথা নয়, নাগরিকের পাবত্র অধিকার হরণের কথা। ভারতের শাসনতন্ত্রে সকলের ভোটাধিকার স্বীকৃত হলেও উচ্চবর্গীয় মানুষেরা অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে চলেছে। এই তিনটি গল্পেই কিন্নরের গভীর সহানুভূতি, অভিজ্ঞতা আর সহমমতা অনুভব করা গেল। এসব গল্পে, বাঙলা ছোটোগল্পের ভাণ্ডার, বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদে পূর্ণ করার আয়োজনে কিন্নর আপন শক্তির পরিচয় রেখেছেন।

অতঃপর কিন্নরের রথ মুখ ফিরিয়েছে বাঙলা গল্পের অতি-পরিচিত কলকাতা আর শহরতলির পথে। সেখানে সাংবাদিক, অফিসের কর্মচারী, গুণ্ডা, কয়েদি, রাজনৈতিক কর্মীর ভিড়। এসব গল্পে উপলব্ধির ঐশ্বর্য অনুপস্থিত। অনুভূতি নিষ্প্রভ। কিছু একটা দেখা নিয়ে গল্প তৈরি করার প্রবণতাই বড়ো। উপার্জনের অপেক্ষায় থাকেন নি কিন্নর রায়।

হাসপাতালে অসুস্থ সাংবাদিক উমানাথকে নিয়ে "কিছু সংশয়" আর "আউট" নেহাতই সংবাদ। গল্প নয়। "আমি-তুমি-আমরা" গল্পে একটি বিশেষ সত্য ক্রিয়াবান হয়ে উঠেছে বলে আনন্দ দেয়। অপরদিকে হাল আমলের ডিভোর্স জীবনের উৎপাত নিয়ে গল্পকারের বেদনা অনুভব করা গেল "রূপকথার বাইরে" ও "স্বপ্নচোর" গল্পে। "স্বপ্নচোর" নিটোল গল্প, কিন্তু "রূপকথার বাইরে"তে নববধূর প্রথম পক্ষের শিশু-সন্তান টুপুরকে নিয়ে পার্থের যন্ত্রণা হাস্যকর ঠেকে। অথচ গল্পকার চেয়েছেন শিশু টুপুরেরই যন্ত্রণা প্রকাশ করতে।

রথযাত্রা—কিন্নর রায়। প্রমা প্রকাশনী, কলিকাতা-১৭। চোদ্দ টাকা।

তৃতীয় ব্যক্তি—সন্দীপ দে। প্রমা প্রকাশনী, কলিকাতা-১৭। দশ টাকা।

পালান পার্বতীর উপাখ্যান—মিহির ভট্টাচার্য। কালধ্বনি, কলিকাতা-৯। দশ টাকা।

“ছবির উল্টো দিকে” রুগ্না স্ত্রীকে নিয়ে মণিমোহনের বিপন্নতা বোঝাতে যে ভেরী বেজেছে, পাঠকের বধির হৃদয়ে তা পৌঁছয় নি। মুদি কালচারের যুগে নব-উদ্ভিন্ন অর্থবানদের ঘরে মেয়েদের রাম খাওয়া, সিগারেট খাওয়া আকছার হচ্ছে। এ নিয়ে গল্প রচনার উৎসাহকে প্রশংসা করা যায় না। “রবি হাজরার হাজতবাসে”র সখারস অতিকথনদোষে দুষ্ট। এই অতিকথনের ফলে ‘‘সম্পাদক মশাই ও স্বাধীনতা”য় কিন্নরের অভিপ্রায় সরব হয় নি। শহরতলির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে রচিত “হননপর্ব” একটি সার্থক গল্প। অথচ এই গল্পের অনুসরণে “চক্রব্যূহে” প্রত্যয়ের বিশিষ্টতা প্রকাশে কিন্নরকে সচল দেখা গেল না। ঠাকুরমা গায়ত্রীর মুখে বনদুর্গার ব্রতকথা মূল রেখাঙ্কের বাইরেই থেকে গেছে, সুর ওঠায় নি।

সন্দীপ দে “তৃতীয় ব্যক্তি” গল্পসংকলনগ্রন্থে স্থান দিয়েছেন চোদ্দটি ছোটোগল্প। “তৃতীয় ব্যক্তি” গল্পটিকে অবলম্বন করেই সংকলনগ্রন্থের নামকরণ। রিমি স্বামী শান্তনুকে নিয়ে সুখী। শান্তনুও। একদিন সিনেমা দেখে ফেরার পথে রিমির বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবন্ধু বিকাশের সঙ্গে রিমি আর শান্তনুর সাক্ষাৎ। অতঃপর শুরু হল অসুখ। রিমির কাছে প্রত্যহ শান্তনুর জিজ্ঞাসা—‘কেউ এসেছিল?’ কেউ আসে নি। শান্তনুও জানে কেউ আসবে না। অথচ তৃতীয় ব্যক্তির আশঙ্কা সমস্ত চেতনাকে খুঁড়ে-খুঁড়ে খায়। প্রথম ব্যক্তি চলে চেনা পথে, সম্মুখে দ্বিতীয় ব্যক্তিও অচেনা নয়। অকস্মাৎ কোন্ সুড়ঙ্গপথে আবির্ভূত হয় তৃতীয় ব্যক্তি। অবয়বশূন্য এই তৃতীয় ব্যক্তির স্রষ্টা তো প্রথম ব্যক্তি স্বয়ং। সাক্ষাৎ কোনোদিনই ঘটে না। কিন্তু এর উপস্থিতির প্রত্যাশা সদা সন্ত্রস্ত করে, সংশয়-দ্বন্দ্ব-ক্ষোভ নিয়ত আনে অসুখ।

তৃতীয় এই ব্যক্তির অনুসন্ধানে সন্দীপ অগ্রসর হয়েছেন “জীবন এই রকম”, “বিকল্প”, “হায় জীবন”, “নদীর পারে”, “ঝুমার একদিন”, “জীবন যেমন”, “রঙিন অথবা সাদা কালো”, “তবুও” প্রভৃতি গল্পে। দৃশ্যমান প্রতিবেশের স্বীকৃতি অপেক্ষা সন্দীপের আমন্ত্রণ মানবহৃদয়। এসব গল্পে জাগতিক চেনা পরিবেশ, ঘটনা মাঝে-মাঝে উদয় হয় বটে, কিন্তু সংকীর্ণ পরিসরে। সন্দীপ তাদের গ্রহণ করেন পাত্র-পাত্রীর হৃদয়-অন্ধকারে আলোনিক্ষেপের জন্যে। সুতরাং বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্বাদ সন্দীপের গল্পে দুর্লভ। তবে জীবনজিজ্ঞাসা নিস্তরঙ্গ নয়।

সমস্ত গল্পেই সন্দীপের সার্থকতা অনুভূত হয় নি। “ঝুমার একদিন” গল্পে সামান্যকে অসামান্য করে তোলার কৈশোরিক আয়োজন পাঠকমনকে পীড়িত করে। তেমনি “রঙিন অথবা সাদা কালো”তে কোনো সঙ্কেত প্রতিভাসিত হয় নি। নিছক জীবনের উপরিভাগের খবর। সন্দীপের গল্পের সৌন্দর্য মিতভাষ। গল্পের পরিধি সংক্ষিপ্ত। এবং এর ফলেই অভিপ্রেত অর্থ রসরূপ লাভ করেছে।

প্যাটার্নের ঘুরপাক থেকে সন্দীপ মুক্ত হতে চেয়েছেন “জীবন নামে গল্প”তে এবং “বাঁচা মরার গল্প” শীর্ষক চতুষ্টয়ে। এই গল্পগুলি বাস্তব-পরিবেশ-সম্পৃক্ত। হয়তো অভিজ্ঞতার অভাবেই, “জীবন নামের গল্পে”র অন্যায়ের বিরুদ্ধে উৎপলের প্রতিবাদ ব্যক্তিগত থেকে সমষ্টিতে সংক্রমিত করার সুযোগ সন্দীপ গ্রহণ করেন নি। ফলে প্রস্তুতিহীনতায় কাদেরের চলায় যে প্রতিবাদের ভাষা সন্দীপ লক্ষ করেছেন, পাঠক-হৃদয়ে তা মুখর হয়ে ওঠে নি। নিছক গল্পের জন্য গল্প। অথচ নিটোল গল্প, এমনও তো বলা যায় না। “বাঁচা মরার গল্প” চতুষ্টয়ের প্রথমসংখ্যক গল্পে বর্ণিত হয়েছে রাজনৈতিক নেতার নির্দেশে পুলিশ-কর্তৃক ভবেনের গ্রেপ্তার প্রসঙ্গ। আর দ্বিতীয়-সংখ্যক গল্পে পুলিশ-কর্তৃক রাজনৈতিক কর্মী সুদীপ-হত্যাকাণ্ড। বাঙলা ছোটোগল্পে এসব কর্মকাণ্ড নিরাশ্রয় হয়ে থাকে নি। বিষয়নির্বাচনে অভিনবত্ব নেই। কিন্তু পরিবেশনার গুণে গল্প দুটি সার্থকতা লাভ করছে। তৃতীয়সংখ্যক গল্পে, “বিপ্রতীপে”, তদন্তকারী জুনিয়ার পুলিশে অফিসারের আত্মগ্লানিতে পুলিশের অন্যায়-অনাচারের প্রতি ধিক্কার জ্ঞাপন করেছেন সন্দীপ। গল্পগঠনের চমৎকৃতি মুগ্ধ করে। এই একই ধারায় চতুর্থসংখ্যক গল্পে অভিব্যক্ত হয়েছে বর্তমান অরাজকতন্ত্রের প্রতি প্রতিবাদ। রাজনৈতিক কর্মী হেমেন লাশকাটা ঘর থেকে উঠে এসেও মৃত হেমেনের পরিচয় এড়াতে পারে নি। অবশেষে আক্রান্ত হয়ে প্রকৃতই মৃত্যুবরণ-কালেসে অনুভব করে—‘মৃত্যুতেও অনেকের সুখবোধ লুকিয়ে থাকে।’

এই পর্যায়ের গল্প-পাঠান্তে জানাতেই হয় যে বাঙলা ছোটোগল্পের ভাণ্ডারে অকৃত্রিম কিছু রেখে যেতে চেনা ভূমির দিকে দৃষ্টি গভীরতর করতে সন্দীপের কাছে আমাদের প্রত্যাশা রয়ে গেল।

বারোটি ছোটোগল্প সংকলিত হয়েছে মিহির ভট্টাচার্যের “পালনপার্বতীর উপাখ্যানে”। মিহির ‘দু কথায়’ (ভূমিকা)

লিখেছেন, ‘গল্প লেখার পেছনে একটাই তাগিদ। মানুষ ও প্রকৃতির নানা ছলাকলায় প্রতি মুহূর্তে মুগ্ধ হই।’ অবশেষে লিখেছেন, ‘লিখতে গিয়ে আমার কালকে, আমার পা যেখানে ঠেকে আছে সেই মাটিকে ছাড়াতে পারি নি, চাই নি।’ লেখকের সংকল্প সাধু। কিন্তু সাধ ও সাধ্যের ফারাক থেকেই যায়। একমাত্র মুগ্ধতাই কখনো সার্থক গল্প হয়ে ওঠায় সাহায্য করে না। চাই শ্রমযোগ। এই শ্রমযোগ উপলব্ধির ও উপার্জনের। মিহির দেখেছেন। কিন্তু পর্যবেক্ষণ করেন নি। পর্যবেক্ষণ অনুভূতির গভীরতা, প্রত্যয়ের বিশিষ্টতা ও নিষ্ঠার ব্যাপকতার অপেক্ষায় থাকে।

মিহির গল্প বানানোর জন্যই উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, কোনো অভিপ্রায়কে ধ্বনিত করতে সক্ষমতা লাভ করেন নি। প্রত্যেক গল্পের উপকরণ সংগ্রহে মিহিরের অকৃত্রিম মনের বিস্তার লক্ষণীয়।

“ফুচির মা” সুন্দর গল্প। “আদিম” গল্পে আদিমতা এসেছে ঠিকই, কিন্তু মদনের কাছে শম্ভুর বউয়ের আত্মসমর্পণ তো ছেনালি। “কালো ঈগলের পরম কথা” রূপকথাই রয়ে গেল। ভিন্নতর স্বাদ বহন করে নি। “জয় বাবা প্রাচীরেশ্বর” নিছকই হাসির গল্প। “কাপুরুষ” বিবরণ থেকে গল্পে উত্তীর্ণ হয় নি। ঠিক এরকম “ভুতো মণ্ডলের পাঁচ কাহন” এবং “হারু পোড়েলের কুরুক্ষেত্র” নতুন প্রতিবেশ, কিন্তু ব্যবহারের অক্ষমতায় বিবরণ হয়েই রইল। “মহাপ্রয়াণ” সংবাদপত্রের রিপোর্টাজ। রিপোর্টাজ তো গল্প নয়। এই গল্পের অনতিব্যক্তকে ক্রমশ ব্যক্ত করার আয়োজন কোথায়? নিতাইকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঠেলে দিতে লেখক পূর্বাহ্নে কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করেন নি। “এক দুগ্গা পিতিমের কথা”, একপাল ছাগলের বৃত্তান্ত”, “পালানপার্বতীর উপাখ্যান” প্রভৃতিতে কোনো বিশেষ সত্য প্রকাশে লেখকের অভিপ্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে নি। মিহিরের শক্তির স্বাক্ষর দেয় “ইতিহাসভ্রষ্টা” গল্পটি। অকৃত্রিম নিষ্ঠায় গল্পের উপকরণ সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন মিহির। বড় খোকাবাবু, অমলের কাছে দুলালের বাপ প্রশ্ন রেখেছে, ‘তুমি ওদের সঙ্গে আছো তো?’ এ প্রশ্ন দুলালের বাপের নয়, ইতিহাসের। শুধু অমলের কাছে নয়, জাতির কাছে। এই গল্পে মিহির উত্তীর্ণ।

---

৪৯৮ পৃষ্ঠার চতুর্থ পাদটীকায় উল্লিখিত গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯৬৯। ভুল করে ১৯৭৬ ছাপা হয়েছে।

প্রতিবেশী সাহিত্য

কাশ্মীরের মহিলা-কবি : তাপসী, প্রেমপিয়াসী

কিরণশঙ্কর মৈত্র

কাশ্মীরী ভাষার উদ্ভব সম্বন্ধে বিভিন্ন মত। তবে কাশ্মীরী-ভাষা-বিশেষজ্ঞগণ এ বিষয়ে একমত যে, কাশ্মীরী ভারতীয়-আর্য ভাষার একটি প্রশাখা।

দ্বাদশ শতকের কলহনের আগেই কাশ্মীরী জনপ্রিয় ভাষা হিসেবে প্রচলিত ছিল। কলহনের "রাজতরঙ্গিণী"তে ব্যবহৃত অসংখ্য সংস্কৃত-ঘেঁষা প্রবাদের মধ্যেই তার প্রমাণ। এই প্রবাদগুলির মধ্যে অনেকগুলি এখনও লোকমুখে প্রচলিত। যেমন—"নৌ সীন্ ছ্হ্ গালান প্রনীচ সীনাছ."—নতুন বরফ পুরানো তুষারকে গলিয়ে দেয়।

"মহান্যায় প্রকাশ"-গ্রন্থের রচয়িতা সিতিকণ্ঠ কাশ্মীরী ভাষার আদিকবিরূপে সম্মানিত। তাঁর জন্ম ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগে বলেই অনুমিত। সিতিকণ্ঠের গ্রন্থের বিষয়বস্তু তান্ত্রিক সাধনা, তন্ত্র-উপাচারের মাধ্যমে গভীর সত্য-উপলব্ধি। সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহারে ক্লিষ্ট এই গ্রন্থটি জনগণের আয়ত্তের বাইরেই থেকে গেছে।

"মহান্যায় প্রকাশে"র পরে একশো বছরের মধ্যে কাশ্মীরী ভাষায় কোনো গ্রন্থের খোঁজ পাওয়া যায় না। কিন্তু এই সময়ে ভাষার যে প্রগতি ঘটেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাই চতুর্দশ শতকে কবি-সাধিকা লালেশ্বরী তাঁর রচনাবলী সর্বজনবোধ্য কাশ্মীরী ভাষাতেই রচনা করেছিলেন। ফলে তাঁর "বাক্য"-বাণী জন-মানসে অচিরেই গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে।

কাশ্মীরী কাব্যসাহিত্যের সূচনা এই তাপসী কবির রচনা-মাধ্যমে। পরবর্তী কালে আরও একাধিক মহিলা-কবির কূজনে গুঞ্জিত হয়েছে কাশ্মীরী কাব্যমালঞ্চ। শুধু তাই নয়, আপন প্রতিভার আলোকে তাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন ভূস্বর্গের কাব্যবিতানকে। তাঁরা সৃষ্টি করে গেছেন একটি ঐশ্বর্যময় উজ্জ্বল ঐতিহ্য তাঁদের সুগভীর ভাবসত্তার আর সুকোমল সংবেদনশীলতায়—যা আজও উত্তর-ভারতীয় সাহিত্য-প্রবাহকে স্পন্দিত করছে।

তাপসী-কবি লালেশ্বরীর ঐশী রচনার সঙ্গেই কাশ্মীরী সাহিত্যের স্বর্ণোজ্জ্বল প্রভাত। তিনি ছিলেন একাধারে সাধিকা, দার্শনিক এবং কবি।

লালেশ্বরীর পরে ষোড়শ শতাব্দীতে রোম্যানটিক 'লোল' কবিতা নিয়ে এলেন হাব্বা খাতুন, যাঁর কবিতায় স্পন্দিত হল মানবিক আবেগ, ভালোবাসা আর আর্তি। কাশ্মীরী কবিতায় প্রাণসঞ্চার করলেন তিনি।

হাব্বা খাতুনের ধারায় শতাব্দীকাল পরে আর-এক মহিলা-কবি আরনিমল। কাশ্মীরী পণ্ডিতের ঘরে তাঁর জন্ম। তিনি পূর্ববর্তী রোম্যানটিক ট্র্যাডিশনকেই অগ্রগতি দিয়েছেন।

এরপরে আবির্ভাব এক সাধিকা কবি রূপা ভবানীর। লালেশ্বরীর মতো তাঁর কবিতাতেও ধ্বনিত ঐশী-বাণী।

বর্তমান নিবন্ধে আলোচ্য এই চার মহিলা-কবির কথা।

ভূস্বর্গের তাপসী-কবি

পাস্‌পার। শ্রীনগরের নিকটবর্তী একটি সৌন্দর্যময় গ্রাম। গ্রামটির খ্যাতি জাফরান-খেতের অপরিমেয় শস্যের জন্যে। বিবাহের পরে অল্পদিন হল শ্বশুরবাড়ি পাস্‌পারে এসেছে সেই কিশোরী মেয়েটি। শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে স্বভাবতই ভয় ছিল, সেই ভীতির ঘড়া দিনে-দিনে পূর্ণ হতে লাগল দুঃখ-যন্ত্রণার অবিরল ধারায়।

ঘরে ছিলেন সৎ শাশুড়ি। তিনি থালাভর্তি ভাত বেড়ে দিতেন বধূর সামনে। কিন্তু আসলে তার সবটাই ভাত নয়—থালায় একখণ্ড পাথরের টুকরোর উপরে অল্প খানিকটা ভাত দিয়ে সুন্দর করে ঢাকা। বধূটি অবশ্য সব দুঃখ-কষ্টই নীরবে সহ্য করত। উদাসীন স্বামী খোঁজ রাখত না স্ত্রীর কর্মময় অস্তিত্বের। শ্বশুর কখনো অত্যাচারের প্রতিবাদ করলে শাশুড়ির নির্যাতন আরও বেড়ে যেত।

দীর্ঘ বারো বছর এইভাবে কেটে যায় তার বিবাহিত জীবন। তারপর পরিণতযৌবনা সেই রমণী একদিন সংসার-সীমা ছেড়ে বেরিয়ে আসেন আধ্যাত্মিক জগতের অসীম আকাশের নীচে। তাঁর সামনে উন্মুক্ত হয় আর-এক পৃথিবীর বিশাল দিগন্ত; এবং উত্তরকালে কাশ্মীরের জনজীবন এবং সাহিত্যদর্শনে চিরকালের জন্যে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকে একটি

নাম—লালেশ্বরী, লাল যোগেশ্বরী বা লালদায়।

ভূস্বর্গের এই তাপসী কবির সবিশেষ পরিচয় দেবার আগে কাশ্মীরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের দিকে একবার দৃষ্টিপাত প্রয়োজন।

কাশ্মীরের প্রথম রাজা গোনন্দ (১ম)। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কুড়ি বছর আগে তিনি রাজত্ব করতেন। মগধের রাজা জরাসন্ধের পক্ষে তিনি কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন বলে কলহনের ইতিহাসে উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম গোনন্দ মথুরা অবরোধ করেছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে তিনি নিজেই নিহত হন। প্রথম গোনন্দের সময় থেকে কাশ্মীরে যে হিন্দু রাজত্বের সূচনা—সেই ধারা প্রবাহিত চতুর্দশ শতকে উদ্যানদেবের সময় পর্যন্ত (১৩২৩-১৩৩৮ খ্রী।। এই উদ্যানদেবের রাজত্বের সূচনা-কালে লালেশ্বরীর জন্ম (আনুমানিক ১৩৩৫ খ্রী)। লালেশ্বরীর জীবৎকালেই কাশ্মীরে মুসলমান রাজত্বের প্রারম্ভ এবং হিন্দু, বৌদ্ধ আর ইসলাম ধর্ম-সংস্কৃতির পারস্পরিক প্রাধান্য-প্রচেষ্টার সংঘাত-সূচনা।

শ্রীনগর শহরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পাণড্রেথান নামক জায়গায় এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে জন্ম হয়েছিল লালেশ্বরীর। অশোকের সময়ে এই স্থানটি ছিল কাশ্মীরের প্রাচীন রাজধানী।

যদিও ঈশ্বরানুভূতি অন্তরে অনেক আগেই জাগ্রত হয়েছিল, বিবাহের বারো বৎসর পরে সংসার পরিত্যাগ করার পরেই লালেশ্বরী সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরোপাসনায় আত্মনিয়োগ করেন। গৃহত্যাগ করে সেদবায়ু নামে একজন শৈবসাধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ক্রমে শৈব-যোগিনী হয়ে ওঠেন। সাধনায় তিনি গুরু সেদবায়ুকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। প্রাচীন বৈদিক যুগের ব্রহ্মবাদিনী তাপসীর মতো কটিবাসমাত্রে আচ্ছাদিত হয়ে লালেশ্বরী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান সম্বন্ধে তিনি ছিলেন উদাসীন। এজন্যে তিনি লোকনিন্দা এবং তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের পাত্রী হয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরচিন্তালীনা এই সাধিকা বলতেন—

> অসার বস্তুর চিন্তায় মন দিয়ো না,…
> হাওয়ার বস্ত্র রাখো গায়ে, লালা
> আকাশের কাপড় পরে, গাও গান।
> আকাশ-হাওয়ার চেয়ে আর
> কী দরকার অধিক আচ্ছাদনের?
> বস্ত্র—আচার-বিধির সংস্কারের পুঁজি
> করবে কি তোমায় পবিত্র?

লালেশ্বরীর জীবনকথা ইতিহাস- ও কিংবদন্তী-মিশ্রিত। বিভিন্ন হিন্দু আর মুসলমান লেখকের রচনায় এই মরমি কবি-সাধিকার জীবনের ঘটনাবলী জানা যায়।

সংসার-উদাসীন লালযোগেশ্বরী যখন অর্ধনগ্ন, কখনও-বা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে কাশ্মীরের জনপদ-উপত্যকায় ঈশ্বরের নামগান নিয়ে মগ্ন থাকতেন—মুসলমান ঐতিহাসিকেরা তখনকার একটি প্রচলিত জনপ্রবাদের উল্লেখ করেছেন। সেই সময়ে তিনি একদিন কাশ্মীরে পরিভ্রমণরত বিখ্যাত পারসিক সুফী সাধক শাহহামদানকে দেখতে পেয়ে বলে ওঠেন—আজ একজন পুরুষ-মানুষকে দেখতে পেলাম। এবং আচ্ছাদনহীন নগ্ন অঙ্গের জন্যে লজ্জা পেয়ে অন্তরালে চলে যান। এরপর থেকে তিনি বস্ত্রপরিধান শুরু করেন, এবং শাহ হামদান সহ তৎকালের সমস্ত মুসলমান সাধকদের সঙ্গে ধর্মালোচনায় যোগ দেন।

পরিণত বয়সে লালেশ্বরীর মৃত্যু হয়। শ্রীনগরের আটাশ মাইল দক্ষিণ পূর্বে বিজবিহার (বা বিজবোর) নামক জায়গায় তিনি নশ্বরদেহ ত্যাগ করেন।

যথার্থ ঐশীজ্ঞানের সন্ধানে লালেশ্বরী বহুস্থানে ভ্রমণ করেছেন, তীর্থযাত্রা করেছেন দূর-দুর্গম জায়গায় এবং আত্মার মুক্তির জন্যে সর্বপ্রকার প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠান পালন করেছেন। কিন্তু সবই বৃথা। অবশেষে সত্য ঈশ্বরবোধ তিনি লাভ করলেন আপন অন্তরে। সেই থেকে ঈশ্বরের সঙ্গে নিজ অস্তিত্বের সাযুজ্য খুঁজে পেলেন তিনি। তাঁর কণ্ঠে গুঞ্জিত হল—

> চলার পথের দস্যুগুলিকে নিপাত করো
> বাসনা, কাম আর অহঙ্কার,
> শ্রেষ্ঠ অস্ত্র আর কী আছে?
> একমাত্র সেবাধর্মই তার তরবারি,
> শুধু সত্যের দীপ জ্বালিয়ে রেখো অন্তরে,
> মানবজীবনের যথার্থ লাভ কেবল ঈশ্বরজ্ঞানে।

লালেশ্বরীর উপদেশরচনাবলী একদিকে যেমন কাব্য-সুষমামণ্ডিত, অন্যদিকে তেমনি লৌকিক দৃষ্টান্তসহকারে সারল্যময়। কার্পাস তুলোর ঘরোয়া উপমা দিয়ে তিনি ঈশ্বরোপাসনার বিভিন্ন স্তর ব্যক্ত করেছেন। প্রথমে কার্পাসকে ভালোভাবে পরিষ্কার করে পাঁজ তৈরি করা হয়, তারপর তা দিয়ে সুতো কেটে বসানো হয় তাঁতে। যখন সেই সুতো দিয়ে কাপড় তৈরি হয়, ধোপা তাকে ধবধবে সাদা বানাবার

জন্যে পাটের ওপর আছাড় দিয়ে কাচে। সেই কাপড় দিয়েই দরজি প্রয়োজনমতো ছোটোবড়ো জামা বানায়। সেই পরিচ্ছদের স্তরেই সাধনার উচ্চতর মার্গ—যখন নানা কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে সে লাভ করে কাঙ্ক্ষিত বস্তু—পরম জ্ঞান।

ধর্মনির্বিশেষে কাশ্মীরের সকল নরনারীর অন্তরে লালেশ্বরী ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্রী। কাশ্মীরে তাঁর প্রভাব এতই বিপুলবিস্তারী যে তাঁর কথা, উপদেশগাথা হিন্দু মুসলমান সবারই কণ্ঠে বাহিত হয়ে স্মৃতির ক্ষত। হিন্দুরা তাঁকে নিজের বলে দাবি করেন, মুসলমানেরা তাঁদের। যদিও ধর্মে তিনি ছিলেন হিন্দু, কিন্তু ইসলাম-সুফী মতবাদেও প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তিনি সর্বধর্মের ঊর্ধ্বে অবস্থান করতেন। তাঁর উপদেশ-বচন তাই সবার কাছেই সমানভাবে আদৃত—

অবিরল অশ্রুধারায় তোমার চোখেরই শুধু ক্ষতি হবে
সে-পথে পৌছতে পারবে না পরম প্রিয়ের কাছে।
মনকে পবিত্র রাখো—সেই পন্থা ঈশ্বরসমীপে,
রোদন শুধু জালবদ্ধ শেয়াল-কুকুরের চিৎকার॥

একাধিক প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের পণ্ডিত মনীষীদের রচনায় লালেশ্বরীর জীবন আর বাণী সম্বন্ধে জানা যায়। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত "দ্য লালা বাক্যানি অর ওয়াইজ সেয়িংস অব লালদেদ অর লাল" নিবন্ধটিতে স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন এবং ডক্টর লায়নেল বার্নেট কর্তৃক অনূদিত কবিতার উদ্ধৃতি আছে। কাশ্মীরের পণ্ডিত আনন্দ কল "লাল যোগেশ্বরী, তাঁর জীবন ও রচনাবলী"-নামে একখানি পুস্তক রচনা করেছেন। স্যর রিচার্ড সি. টেম্পল তাঁর গ্রন্থ "দ্য ওয়র্ডস্ অব লালা দ্য প্রফেটস্"-এর মুখবন্ধে পণ্ডিত আনন্দ কলের রচনা থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন—'লাল-বাক্য বা লালের বচনগুলি কাশ্মীদের কানের ভিতর দিয়ে মর্মে গিয়ে সাড়া জাগায়। তাই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলার সময়েও তাঁর নীতিবাক্য বলে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

লালেশ্বরীর দু-একটি "বাক্য" বা বচনের উদ্ধৃতি দিলে পণ্ডিত কলের এই মন্তব্যের যাথার্থ্য অনুভূত হবে—

ধৈর্য হল সোনার বাটি
মূল্যবান—কে কিনবে সে বস্তু?
ধৈর্য হল নুন, কর্পূর আর জিরার মিশ্রণ
তিক্তস্বাদ—কে নেবে স্বাদ তার?

অথবা—

বালুময় মরুভূমিতে শস্য জন্মায় না,
শস্যহীন খোসায় মাখন লাগিয়ে কী লাভ?
হাবাগোবার মাথায় কি ঢোকে অধ্যাত্মতত্ত্ব?
গর্দভের কাছে কী দাম চিনির দানার?

আদিকবি সিতিকণ্ঠের কবিতায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার সুপ্রচুর। উত্তর-সিতিকণ্ঠ কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লালেশ্বরী। কবি এবং সাধিকা। তাঁর রচনায় সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার থাকলেও আপন আধ্যাত্মিক ভাবনাকে তিনি সহজ ভাষায় বলতে চেয়েছেন। তাঁর বাণী সাধারণ মানুষের কাছে পৌছেছে। তাঁর রচনা কাশ্মীরী ভাষাকে উন্নীত করেছে। ভাষার উচ্চারণেও এসেছে পরিবর্তন। তাই লালেশ্বরী কেবল-মাত্র ধর্মসাধিকা হিসেবেই নন—স্মরণীয়া কাশ্মীরী সাহিত্যের ইতিহাসেও।

স্যর আর. সি. টেম্পল লালেশ্বরীর রচনাবলীর ঐশীভাব এবং কাব্যময়তায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি তাঁর "দ্য ওয়র্ডস্ অব লালা দ্য প্রফেটস"-গ্রন্থের উৎসর্গ-পত্রে লালেশ্বরীকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন—

লালেশ্বরী, তুমি এক অনন্যা সাধিকা,
সত্যের দুহিতা তুমি সকল কালের,
তোমার গীতিমাল্য মুগ্ধ করেছে আমায়—
আমি সহজ মানুষ এক দূর সাগরপারের॥

প্রেমের কবিতায় "কাশ্মীরের নূরজাহান"

হেনায় রাঙিয়েছি আমার হাত
প্রিয়তম, কখন তুমি আসবে?
এসো, তৃপ্ত করো আমার তপ্ত বাসনা
ত্যাখো, মৃত্যুপথযাত্রী তোমার প্রতীক্ষায়।
প্রিয়হীন দিনগুলি ব্যর্থ ধূসর দুঃসহ
কী করে সহ্য করি এই দীর্ঘ বিরহ?
আমার ভাগ্য প্রসন্ন হবে কোন্ শুভক্ষণে,
ফিরে আসবে আবার আমার দয়িত,
কবে—কখন?

—দীর্ঘ বিরহের উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস আর তপ্ত অশ্রুজলে পরিপূর্ণ এই প্রেমগীতিকার রচয়িত্রী ষোড়শ শতকের এক কাশ্মীরী কবি—যিনি জন্ম নিয়েছিলেন কৃষককন্যা হিসেবে, কিন্তু ভাগ্য তাঁকে নিয়ে গিয়েছিল কাশ্মীরের রাজপ্রাসাদে, লাভ করে-

ছিলেন সম্রাজ্ঞীর সম্মান আর মর্যাদা। এর পরের জীবনও নানা ঘটনায় বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই কবির নাম হাব্বা খাতুন। কাশ্মীরের রোম্যানটিক কবিদের অগ্রদূত হিসেবে সুচির-চিহ্নিত একটি নাম।

গভীর, হৃদয়মথিত তীব্র আবেগবোধ এবং সুরমাধুর্য হাব্বা খাতুনের গীতিকবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই গুণ পূর্বসূরী ক্লাসিক কবিদের চিরাচরিত গম্ভীর কাব্যধারা থেকে বিচ্যুত করে তাঁর কবিতায় অনন্যতা দান করেছে।

শ্রীনগর থেকে দশ মাইল দূরে অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ চন্দাহার গ্রামে হাব্বা খাতুনের জন্ম। আবদুল্লা রাথোরের এই মেয়েটিকে বাল্যে "জুন" বা "জুনি" বলে ডাকা হত। কাশ্মীরী ভাষায় "জুন" শব্দের অর্থ চাঁদ। মেয়েটি যথার্থই চাঁদের মতো রূপ নিয়ে জন্ম নিয়েছিল। এবং যেমন রূপে লক্ষ্মী তেমনি গুণেও সে ছিল সরস্বতী। অল্প বয়সেই গুলিস্তাঁ, বুস্তা এবং কোরান প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র এবং পারসিক সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করে। ধর্মগ্রন্থ থেকে সুললিত আবৃত্তি চন্দাহার গ্রামে জুনিকে খ্যাতি দেয়। স্বভাবতই সেযুগের রক্ষণশীল পটভূমিকায় কন্যার এই যশোবৃদ্ধি আবদুল্লা রাথোরকে ভীত করে তোলে। পার্শ্ববর্তী লেভপুর গ্রামের এক কৃষকপুত্রের সঙ্গে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় জুনির।

প্রতিভাশালী বধূটি শ্বশুরগৃহে এসে কাব্যরচনায় মন দিলে নববধূর এই দুর্লভ গুণটি সেখানে কারোরই প্রীতি-লাভে সমর্থ হয় না, বরং সবাই বিরক্ত হয়ে ওঠে কৃষিকর্মে তার নৈপুণ্যের অভাবে। মধুর কাব্যসঙ্গীতের মতো অবাস্তব গুণ দিয়ে কৃষকের ঘরে কী উপকার হবে? শাশুড়ি তাকে নানাভাবে জ্বালাযন্ত্রণা দিতে থাকে, স্বামী উদাসীন। ফলে হাব্বা খাতুনের বিবাহিত জীবন অচিরেই নিতান্ত দুঃখময় হয়ে উঠল। বাস্তব জীবনের সঙ্গে এই সংঘাত হাব্বা খাতুনের অন্তর্জীবনকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে এবং এই সময় থেকে তাঁর কবিতায় যুক্ত হয় এক নস্টালজিক বিষণ্ণতার সুর। এই সুরটি শুধু তাঁর কবিতাতেই নয়, ক্রমে সে যুগের সকল কবির কাব্যেরই একটি বিশিষ্টতা হয়ে দাঁড়ায়। পারিবারিক জীবনের বিরূপতা সত্ত্বেও অচিরেই হাব্বা খাতুনের কবিখ্যাতির সৌরভ সেই গ্রামের সীমানা ছাড়িয়ে রাজধানী শ্রীনগরে পৌছে যায়।

এই সময়ের একটি ঘটনা হাব্বা খাতুনের সমগ্র জীবনে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন আনে। একদা তিনি জাফরান-খেতে দাঁড়িয়ে স্বরচিত একটি গান গাইছিলেন। সে সময়ে সেই খেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন কাশ্মীরের রাজকুমার যুসুফ শাহ্। সঙ্গীতের কাব্যসৌন্দর্য আর সুরমাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে তিনি গায়িকার দিকে তাকালেন। প্রথম দর্শনেই প্রেম। মুহূর্তে নতুন ইতিহাস জন্ম নিল, বদলে গেল হাব্বা খাতুনের জীবনধারা। প্রেমমুগ্ধ রাজকুমার সুন্দরী গায়িকাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন—তিনি কে? তৎক্ষণাৎ রচিত এক চতুষ্পদী কবিতায় হাব্বা খাতুন নিজের পরিচয় দিলেন। যুসুফ শাহ্ দেখলেন—এ নামটি তো তাঁর অতি পরিচিত। পূর্বেই পাসপারের ধর্মগুরু খাজা মাসুদের মুখে এ নামের পরিচয় তিনি পেয়েছেন। রাজকুমার সক্রিয় হয়ে উঠলেন এবং শীঘ্রই হাব্বা খাতুনের বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিয়ে নিজ জীবন-সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করলেন তাঁকে। এবং তারপর পিতার মৃত্যুর পরে কাশ্মীরের সিংহাসনে বসলেন স্বয়ং যুসুফ শাহ্ চক (১৫৭৯ খ্রী)।

এরপর থেকে কাশ্মীরের কলা আর সাহিত্যের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার ভার নিলেন হাব্বা খাতুন। রাজার সহায়তায় হাব্বা খাতুন গুলমার্গ অঞ্চলটিকে পুষ্পবিতানের রূপ দিতে সচেষ্ট হলেন। রাজ্যপ্রশাসনের অন্যান্য ব্যাপারেও তিনি সহায়তা আর পরামর্শ দিতে শুরু করলেন। ফলে লোকমুখে হাব্বা খাতুন উল্লিখিত হতে লাগলেন "কাশ্মীরের নূরজাহান" বলে। কিন্তু রাজাপ্রশাসনের নয়, কাব্যরচনাতেই তাঁর কৃতিত্ব সমধিক।

হাব্বা খাতুন প্রধানত প্রেমের কবি। ভালোবাসার নানা আবেগ বিচিত্ররূপে তাঁর কবিতায় রূপায়িত—সে-ভালোবাসা কখনও প্রতীক্ষায় প্রতপ্ত, ব্যর্থতায় বিষণ্ণ, বিনিময়ে ব্যাকুল, সংশয়ে দ্বিধাগ্রস্ত এবং অপ্রাপ্তির বেদনায় বেপথু—

ভালোবাসা আমাকে বিক্ষত করছে অন্তরে
জলন্ত আগুনের দাহ চতুর্দিক
জলে জলে অস্তিত্ব আমার অঙ্গার।

তাঁর প্রেম-কবিতার প্রেক্ষাপটে ভূস্বর্গ কাশ্মীরের অপরূপ প্রকৃতি:

দূরের পুষ্পকুঞ্জে কুঁড়ির বুকে ফুলের স্বপ্ন
প্রিয়তম, তুমি কি শোন নি আমার অনুনয়?
ফুলগুলি ফুটে উঠছে পাহাড়ের হ্রদে
চলো না আমরা যাই দূরের পুষ্পবিতানে,
তুমি কি শোন নি আমার অনুনয়, প্রিয়তম?

'লোল' হল ছ থেকে দশ লাইনের কাশ্মীরী প্রেমকবিতা যার

মধ্যে একমুখী সংহত আবেগ—যে আবেগে তাঁর প্রেমকামনা, যা প্রায়শ ব্যর্থতায় যন্ত্রণাজর্জর, কদাচিৎ মিলনের আনন্দে মুখর। "লোল" কবিতা হাব্বা খাতুনের লেখনীতে নতুন স্পন্দন আর আবেগ লাভ করেছিল—"লোল" কবিতায় হাব্বা খাতুনের প্রতিভার সমধিক বিকাশ। তাঁর একটি "লোল"-কবিতায় মিলনাকাঙ্ক্ষার নন্দিত প্রকাশ—

আমার ভ্রূ থেকে ঝরে পড়ছে মুক্তোর স্বেদ
ক্লান্তিহীন প্রহরে গোলাপ কুড়োচ্ছি প্রিয়তমের জন্যে।
শালিমার বাগিচায় বসে পূর্ণ করেছি আসব-পেয়ালা
আনন্দ-স্পন্দিত অন্তর আমার, প্রিয়তম আসবে।
গেঁথে চলেছি সুগন্ধি ফুলের মালা
আছাবলে মদিরা-পানপাত্র উপছে উঠছে,
বেণীবদ্ধ আমার উদাস অলকদাম প্রিয়-সমাগমে,
গেঁথে চলেছি অবিরাম সুগন্ধি ফুলের মালা।

এবং রোমান্টিক ব্যথাতুরতা, অন্তহীন আর্তি তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে—

এই পাহাড়-উপত্যকা-ঝিলে অবিরাম আমি খুঁজছি
তোমার দেখা কি পাব না, প্রিয়তম?
বুনো জুঁইয়ের বনে আমি উতল হয়ে ঘুরছি
আর-একবার কি তুমি দেখা দেবে না, প্রিয়তম?
ছাখো, কুঁড়ি গোলাপগুলি এখন যৌবনবতী
তুমি কি কাছে আসবে না, দয়িত আমার?
আমার দেহের দুকূল-ভরা সৌন্দর্য থরো থরো,
তুমি কি একবার আঘ্রাণ নেবে না, স্বপ্ন আমার?

জয় করে তবু ভয় কখনও যায় না রোমান্টিক কবিমনের। অনির্দেশ অনিশ্চয়তা বারবার ছায়া ফেলে যায় নিশ্চিত মিলন-স্বপ্নে, ভালোবাসার উষ্ণ আবেগের উপর দিয়ে বয়ে যায় বেদনার হিমেল হওয়া—

দীর্ঘ প্রহর যাপন করেছি অসীম প্রতীক্ষায়
হৃদয় আমার আশাহীন, শূন্য, উদাসীন—
মিলন-স্বপ্ন ভালোবাসার দুর্মর সংস্কার,
আমার প্রেম ছাপিয়ে থাকে অহঙ্কারের অলঙ্কার,
হেনায় হেনায় রঞ্জিত করি রক্তিম কর-যুগল।
দয়িতের দেহ-মন্দির অভিষিক্ত চুম্বন-পুষ্পে,
স্বর্ণ পানপাত্রে স্বর্ণাভ স্বর্গীয় মদিরা,
হৃদয়-সরোবরে প্রেম-পঙ্কজ আনি উপহার—
তোমার ওষ্ঠে এখনও কি নেই দুর্লভ হাসি?

উজ্জ্বল প্রেম-স্বপ্নে ভরা হাব্বা খাতুন ও য়ুসুফ শাহ্‌ চকের যুগ্ম-জীবনের আনন্দিত আকাশে সহসা দেখা দিল কাল-বৈশাখীর প্রলয়। শ্রীনগরে হঠাৎ শিয়া আর সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। তখন দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট আকবর। এই সুযোগে তিনি সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন কাশ্মীরে। প্রাথমিক বিফলতার পরে আকবরের সৈন্যরা য়ুসুফ শাহকে বন্দী করে নিয়ে যায়। ঘুরে যায় হাব্বা খাতুনেরও ভাগ্যের চাকা। রাজমহল থেকে বহির্গত হয়ে তিনিও সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। রোমান্টিক কবির কাব্যবীণায় এবার যুক্ত হয় একটি বিদ্রোহী সুর। দয়িতের বন্দীদশা থেকে মুক্তির জন্যে তিনি আপন সীমিত সাধ্যের মধ্যে চেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু প্রবল-পরাক্রমশালী মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণে কে তাঁকে সাহায্য করবে? বরং, কাশ্মীরের তৎকালীন শাসনকর্তা হাব্বা খাতুনকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়ে পরওয়ানা জারি করেন। পরে অবশ্য তিনি এই আদেশ প্রত্যাহার করে নিলেন যখন জানতে পারলেন যে হাব্বা খাতুন প্রকৃতপক্ষে এক বিরহিণী সন্ন্যাসিনী ছাড়া আর কিছুই নন।

লাহোরে দু বছর বন্দী হয়ে কাটাবার পরে য়ুসুফ শাহকে মুক্তি দেন সম্রাট আকবর এবং জায়গীর দিয়ে প্রেরণ করেন বাঙলাদেশে। বর্ধমানে য়ুসুফ শাহ্‌ কিছুদিন কাটিয়েছিলেন। ফারগুসনের ইতিহাসগ্রন্থে তার উল্লেখ—'Yusuf showed bravery in returning the attack of Sher Afgan whom he killed near Burdwan in Bengal.' কিন্তু কিছুদিন পরেই সেখানে তিনি নিজেই মারা যান। কাশ্মীরে এই সংবাদ যখন হাব্বা খাতুনের কাছে পৌছল—সমস্ত পৃথিবী শূন্য হয়ে গেল তাঁর কাছে। তাঁর শোক-শতধা ব্যথাদীর্ণ হৃদয় থেকে এই সময়ে যে-কবিতাটি উৎসারিত হল সেটি হাব্বা খাতুনের সমাধি-ফলকে উৎকীর্ণ হবার যোগ্য—

দীন কিষাণের ঘরে জন্ম নিয়েছিল সেই মেয়েটি।
হাব্বা খাতুন তার নাম—
জনতার উৎসুক দৃষ্টির ভিড় পেরিয়ে
বোরখায়-ঢাকা সেই নারী;
অজস্র অনুরাগী অবিরাম অনুসারী
ধ্যান-ভেঙে অরণ্যচর সংযমী তাপস-ও,
এক পলক দেখবার আকাঙ্ক্ষা—
সেই হাব্বা খাতুন॥

হাব্বা খাতুনের প্রথম আঠারো-উনিশ বছর কেটেছে গ্রামের সাধারণ পরিবেশে, পরবর্তী চোদ্দ বছর য়ুসুফ শাহের সঙ্গে "luxuriating in the spell of lovely weather of Gulmarg, Sonamarg, Achabul and on the Dal." এর পরের পঁচিশ বছর আবার সন্ন্যাসিনীর জীবন। অবশেষে এই প্রেমপ্রতপ্ত কাশ্মীর-কলিটিকে মৃত্যু ছিনিয়ে নিয়ে যায় ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিল। কবির বয়স তখন ৫৬ বৎসর।

শ্রীনগর থেকে তিন মাইল দূরে পাণ্ডাছোক গ্রামে—যেখানকার মসজিদে ধ্যানধারণায় শেষ জীবন কাটিয়েছেন—সেখানকার সমাধিস্থলে প্রতিবৎসর এই দিনটিতে হাব্বা খাতুনের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় শ্রীনগর বেতারকেন্দ্র থেকে।

কালের করালদৃষ্টি পেরিয়ে হাব্বা খাতুনের কবিতা আজও অবিনশ্বর। কাশ্মীরের দূর পাহাড় প্রত্যন্তে নিরক্ষর কৃষক-ও "নোট" (মাটির ঘড়া-জাতীয় বাদ্যযন্ত্র), "তুম্বখনারী" (চামড়ায় ছাওয়া মাটির বাদ্যযন্ত্র) প্রভৃতি কাশ্মীরী বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে মিলন-বিরহ-আনন্দ-বেদনার গান গায়। যদিও বাঙলা হরফে লিখলে কাশ্মীরী ভাষার স্বরূপ ভালোভাবে বোঝা যাবে না—তবু হাব্বা খাতুনের তাপসী-জীবনে রচিত একটি গান—যা আজও কাশ্মীরীদের প্রিয়—উল্লেখ করা যেতে পারে—

(১)

"মাজি হুনজো রাজি বায়ো
দোপ্‌সো দায়ো স্বইৎ য়িমোয়।
ছমক্না রোজন্‌
ছুম্‌ গা ছুন ওয়াইরুব
তোহিমে পুইরিব
হাই বাইসব।

(২)

গোছ্‌ সে আসই
চোবি দোজা,
শূর্‌ মে রহস্‌ কুন্‌
য়িন হাজার;
লারুজো সান ছিন্‌
গরুজো লায়ান,
তোহিমে......

(৩)

ছল্‌ সেইয়ে তুম্বিয়ি কেহারইন
হুল্‌ বাদানিচ্‌ ছাম্‌ গাছান্‌
আথা বাদামস্‌ মান্‌ চাইরব্‌
তোহিমে......"

রাজকুমারীর বিদায়বেলায় পরিচারিকা তার সঙ্গে যেতে চাইছে। রাজকুমারী বলছেন—না, আমি তো শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি, তোমাদের যাবার দরকার নেই। আমার জন্যে যদি সত্যিই কিছু করতে চাও—আমাকে সুন্দরভাবে কনের বেশে সাজিয়ে দাও—'তোহিমে পুইরিব হাই বাইসব'। হাঁ, সঙ্গে কিছু মিষ্টি খাবার-দাবার দাও—নববধূর প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাবার সময়ে যা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত। কেননা, শ্বশুর-বাড়িতে গেলে সেখানকার অসংখ্য পরিজন আমাকে ছেঁকে ধরবে, তখন তাদের হাতে আমি কী দেব?

আমার পালকি চারজন বেহারা কাঁধে তুলে নিচ্ছে, কানে আসছে আপন প্রিয়জনদের কান্নার শব্দ। কেন তারা বিদায়বেলায় কাঁদছে? আমি শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছি। আমাকে নববধূর বেশে সাজিয়ে দাও।

এই বঙ্গানুবাদ হাব্বা খাতুনের গীতিকবিতার শব্দার্থ মাত্র। আসলে এই কবিতাটি গভীরব্যঞ্জনাময়। রাজকুমারী মৃত্যুর আগে রাজমহলের পরিচারিকাকে উদ্দেশ করে এইসব কথা বলছে। এখানে শ্বশুরবাড়ি বলতে সে মৃত্যুপুরীকে বোঝাচ্ছে। সে বলছে—পরপারে যাবার আগে আমার সঙ্গে কী সুকৃতি (মিষ্টি খাবার-দাবার) আমি নিয়ে যাচ্ছি? মৃত্যু-লোকের প্রহরীদের হাতে আমি কোন্‌ পুণ্যকর্মের পশরা তুলে দেব? আমার কফিন (পালকি) চারজন লোক কাঁধে তুলে নিচ্ছে, আপন প্রিয়জনেরা কেন কাঁদছে? আমি তো অমরলোকে (শ্বশুরবাড়িতে) যাচ্ছি।

দূর ষোড়শ শতাব্দীতে যে কবি এমন ব্যঞ্জনাময় কাব্য রচনা করে গেছেন—আশ্চর্য কি যে তাঁর দেশের মানুষ এখনও তাঁকে মনের মণি কোঠায় অমর করে রাখবে?

বিরহিণী আরনিমল

শতাধিক কাল পরে হাব্বা খাতুনেরই ধারায় আবির্ভাব ঘটল আর-এক মহিলা-কবির। আরনিমলের কাব্যকুসুমের সৌরভ পরিব্যাপ্ত হল সমগ্র পার্বত্য উপত্যকায়।

এই কবির জন্ম এক সম্পন্ন পণ্ডিত ব্রাহ্মণের ঘরে। তাঁর বিবাহও হয়েছিল পারসিক সাহিত্যে খ্যাতিমান এবং লেখক মুন্সি ভবানীদাস কাচরুর সঙ্গে। এই পণ্ডিত ব্যক্তি কিন্তু তাঁর কবি-স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছিলেন। হাব্বা খাতুনের মতো আরনিমলও তাই বিফল প্রেম আর অসুখী সংসারজীবনের যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। তাঁর কবিতায় অনুরণিত মানবিক আবেগ আর আর্তি।

ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতার ফলে তাঁর কবিতায় একান্ত পার্থিব, মর্মস্পর্শী, অভিমানী অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে। বেদনা-বেপথু কণ্ঠে তিনি বলেছেন—

আমার বস্ত্রপ্রান্ত আর্দ্র হয়েছে অশ্রুধারায়
প্রতীক্ষা আর প্রত্যাশায় কাটে আমার দিন,
আমার অঙ্গনে কবে পড়বে তোমার পদধূলি ?
যা তুলে নেব, প্রিয়তম, আমার মাথায়।
আমি ঘর-সংসার ত্যাগ করেছি
ছিঁড়ে ফেলেছি অবগুণ্ঠন, তুমি এসো।
একদা আমি ছিলাম খ্যাতিময়ী সুন্দরী
প্রথম যৌবনেই ঝরে গেল সে রূপের কলি
প্রিয়তম, তুমি এসো ॥

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ফুলের ফুটে-ওঠা, তটিনীর কলতান, নৈসর্গিক দৃশ্য, মায়াবী পরিবেশ, নয়নাভিরাম বাগ-বাগিচা —আরনিমলের কবিমনকে উদ্দীপিত করেছে, এবং সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর স্বকীয় প্রেমানুভূতি—

আমার পিতার উদ্যানে ফুটেছে ফুল
কিন্তু তুমি আস নি, নিঃসঙ্গ আমি
নিজেকে মনে হচ্ছে অপরাধিনী
সবাই আমাকে উপহাস করে
হেরে গেছি ভাগ্যের সাথে লড়াইতে
নিয়তির বিরুদ্ধে কে পারে জিততে ?
ললাটে কী আছে বিধির লিখন !
পিতার বাগিচায় ফুটেছে যূথী—
বৃথাই করেছি প্রতীক্ষা অন্তহীন।

এইভাবে অধিকাংশ কবিতাতেই স্বামী-পরিত্যক্তার অসহনীয় নিঃসঙ্গ বেদনার মানবিক আর্তি—

শাঁওনের যূথীর মতো আমার রূপ
পাণ্ডুর এখন হলুদে গোলাপের মতো,
ওগো, কখন তুমি আসবে
আর, তাকাবে আমার দিকে ?
ঈশ্বর প্রিয়তমকে দিক শাস্তি
অন্যের প্রতি হোক সে সদয়,
ওগো, আমার প্রিয়, প্রিয়তম,
তোমার জন্যে প্রতীক্ষা আমার অন্তহীন।

আরনিমলের কবিতায় অতীন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক অনুভূতি অনুপস্থিত। তাঁর রচনায় একান্ত মানবী অনুভূতি। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পরে চরখাই হয়ে উঠেছিল তাঁর সব সময়ের সঙ্গী। চরখার আবর্তিত চক্রের সঙ্গে সুর মিলিয়ে তিনি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন—

ওরে চরখা—
বিরক্ত হোস না, করিস না বিড়বিড়—
তোর চাকায় দেব তেল,
কচুরিপানার মতো
উঠবে ফুটে ফুল

আরনিমল শেষ পর্যন্ত তাঁর পিতৃগৃহেই অবস্থান করেছিলেন এবং কাশ্মীরী মহিলাদের অবসর-বিনোদনের সঙ্গী চরখাকেই করেছিলেন একমাত্র অবলম্বন। স্বামীর সঙ্গে তাঁর আর সমঝোতা হয় নি। তিনি কবে মারা যান সে-সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তাঁর সঙ্গে-সঙ্গেই কাশ্মীরী কাব্যজগতে "লোল" কবিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

অলকেশ্বরী রূপা ভবানী

কাশ্মীরী সাহিত্যাকাশে উল্কার মতো দেখা দেন রূপা ভবানী নামে আর-এক দার্শনিক কবি। রূপা ভবানী আরনিমলের সমকালীন হতে পারেন, কারণ তাঁর জন্ম ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু আরনিমলের মতো তাঁর কবিতায় মানবিক প্রেম-প্রত্যাশা-ব্যর্থতার কথা নেই, বরং তাঁর কবিতায় প্রতিভাসিত লালেশ্বরীর মতো আধ্যাত্মিক ভাবনা।

লালদেব যেমন লালেশ্বরী বা লালযোগেশ্বরী নামে পরিচিতা ছিলেন, রূপা ভবানীও তেমনি আখ্যাতা হয়েছিলেন 'অলকেশ্বরী' নামে। এর পশ্চাতে রয়েছে দুটি কারণ। প্রথমত, কেশদাম উন্মুক্ত রাখার জন্যে লোকে তাকে "অলকেশ্বরী" বলতে থাকে; দ্বিতীয়ত—অলোক জগতের ঈশ্বরীরূপে তিনি ছিলেন মাননীয়া।

তাঁর পিতা পণ্ডিত মাধব ধর ছিলেন সন্ন্যাসী-তুল্য এক ব্যক্তি। বাস করতেন শ্রীনগরে। পিতার মতো রূপা ভবানীও প্রথম থেকে ধর্মজগতের দিকে আকৃষ্ট হয়ে ঈশ্বর-অন্বেষায় আত্মনিয়োগ করেন। স্বভাবতই পিতাই তাঁর গুরুরূপে প্রতিভাত হন এবং তিনিই তাঁকে আধ্যাত্মিক জগতের দিকে পথ-নির্দেশ করেন।

পূর্ববর্তী তাপসী-কবি লালেশ্বরীর জীবনের সঙ্গে রূপা ভবানীর জীবনের সাদৃশ্য দেখা যায়. রূপা ভবানীরও বিবাহ হয়েছিল অল্প বয়সে এবং লালেশ্বরীর মতো তিনিও স্বামী-গৃহে শাশুড়ির হাতে নিদারুণভাবে নিগৃহীতা হতে থাকেন।

তাঁর স্বামী পণ্ডিত অলক সাহেব সাপ্রু ছিলেন বাস্তব-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তি। পত্নীর নিগ্রহ তিনি সমর্থন করতেন না। রূপা ভবানী প্রত্যহ হরি পর্বতশিখরে যেতেন ধ্যান করার জন্যে (আজও শ্রীনগরের উপকণ্ঠে হরিপর্বত কাশ্মীরী পণ্ডিত-দের কাছে ধ্যানশিখররূপে সম্মানিত)। কিন্তু তাঁর শাশুড়ি দুর্নাম প্রচার করতে থাকেন যে তিনি দুশ্চরিত্রা, তাই হরি-পর্বতে গিয়ে তিনি তাঁর মন্দ অভিপ্রায় সিদ্ধ করছেন।

মাতার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে অলক সাহেব সাপ্রু কয়েক-দিন তাঁকে অনুসরণ করেন। তিনি দেখেন যে তাঁর স্ত্রী নিন্দনীয় কাজ কিছুই করেন না। একদিন রূপা ভবানী পিছন ফিরে তাঁর অনুসরণকারী স্বামীকে দেখতে পান। যখনই তিনি পিছন ফিরে তাকিয়েছিলেন, কিংবদন্তী অনুসারে, তখনই তাঁর স্বামীকে ঘিরে ধরে অজস্র দংশনোদ্যত বিষাক্ত ভীমরুল। এই সন্দেহপরায়ণ অপ্রীতিকর ঘটনার পরে তিনি স্বামিগৃহ ত্যাগ করে পিতৃগৃহে গিয়ে বাস করতে থাকেন। তবে লালেশ্বরীর মতো তিনি পথে-প্রান্তরে ঘুরে বেড়াতেন না। ১৭২০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করেন কাশ্মীরী পণ্ডিতদের ধর সম্প্রদায়। এখনও তাঁরা তাঁরা মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেন উপবাস আর প্রার্থনার মাধ্যমে। অন্যান্য আরও অনেক কাশ্মীরী পণ্ডিত এইভাবে তাঁর মৃত্যু-বার্ষিকী পালন করেন।

শ্রীনগরে পিতৃগৃহে সন্ন্যাসিনীর জীবন-যাপনের সময়ে তিনি শাহ্‌ শাদিক কলন্দর নামে এক মরমি সাধকের সংস্পর্শে আসেন। তাঁর সঙ্গে তিনি দীর্ঘ দার্শনিক আলোচনায় সময় কাটাতেন।

কাশ্মীরী ভাষায় তিনি যে কাব্যবাণী রচনা করেছিলেন তার মধ্যে গভীর মরমি ভাবধারা প্রবহমান। তার মধ্যে স্পষ্ট শাক্তভাব ও সুফীবাদ, এবং সেই সঙ্গে তাঁর স্বকীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং যোগ-শিক্ষা। কবির মতে, আত্ম-বিলোপ যথার্থ আত্মোপলব্ধির জন্যে বিশেষভাবে প্রয়োজন—

আত্মত্যাগ থেকে নির্ঝরিত আত্মবিলয়
পরার্থপরতাই তার প্রতীক,
আত্মবিলুপ্তির বেদীমূলে হও আনত
শক্তির সর্বোত্তম প্রকাশ আত্ম-বিলয়ের মধ্যে
কাল-প্রবাহের মধ্যে সেই তো পরম।

অন্যত্র—

অজ্ঞাতের মাঝে আমি অবগাহন করি
অতল থেকে আহরণ করি মূল্যবান বস্তু—
পরম সত্য মাতা বসুধার অভ্যন্তরে।
উত্থিত শব্দ—গভীর নাদ—
আস্বাদন করি পবিত্র পানীয়
আপনার মাঝেই অভিজ্ঞতা পরম সত্যের।

রূপা ভবানী একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজসংস্কার সাধন করেছিলেন। পিতৃপরিবারে তিনি এক সময়ে দুই পত্নী গ্রহণ ও বহুবিবাহ বন্ধ করেছিলেন। আইন প্রণয়ন দ্বারা কুপ্রথা বন্ধ করার চেয়ে তাঁর এই সংস্কার ছিল বহুগুণে প্রভাবশালী।

কাব্যরচনায় তিনি লালেশ্বরী দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর কবিতা গভীরভাবে আধ্যাত্মিক এবং জটিল, বিমূর্ত, দুর্জ্ঞেয় শব্দশৃঙ্খলে আবদ্ধ। কাশ্মীরের ধর পণ্ডিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে রূপা ভবানীর ঐশী ভাবনাসম্পৃক্ত গ্রন্থটিকে রক্ষা করে আসছেন। তাঁরা তাঁর রচনাকে, প্রকাশ করাকে অপবিত্র কর্ম মনে করেন।

কাশ্মীর উপত্যকায় এই চার মহিলা-কবি কাশ্মীরী সাহিত্যে নিঃসন্দেহে স্থায়ী আসন অনধিকার করে আছেন।

মতামত

১

আবার স্তালিনের ভুত

সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান প্রমুখ নেতা মিখাইল গোরবাচেভ সমাজতন্ত্রের অগ্রগতির জন্য পার্টি, দেশ, সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি—জীবনের সবদিকই ঢেলে সাজানোর জন্য, ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই গোটা সোভিয়েত রাশিয়া জুড়ে তোলপাড় তুলেছেন। সেই তরঙ্গের ঢেউ সোভিয়েত দেশ পেরিয়ে আছড়ে পড়ছে বিশ্বজনমানসের উপকূলে। লেখা বাহুল্য, আমাদের দেশেও।

তিনি তাঁর এই ঢেলে-সাজানোর পথের নাম দিয়েছেন "পেরেস্ত্রোইকা"—রিস্ট্রাকচারিঙ। ঠিক বাঙলা কী হবে? কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস, নাকি অন্য কিছু? এই পেরেস্ত্রোইকা ঠিক-ঠিক প্রয়োগ করতে হলে যা দরকার তা হল "গ্লাসনস্ত" বা খোলা হাওয়া।

তাঁর এই পেরেস্ত্রোইকার বিস্তারিত আলোচনা সহ একটি বই তিনি পশ্চিম মুলুকের প্রকাশকদের দিয়েছেন তাঁরা সেটি প্রকাশও করেছেন।

বহুদিন বাদে মার্কসবাদী-অমার্কসবাদী-মার্কসবাদবিরোধী প্রায় সব মহলেই গোরবাচেভের এই পেরেস্ত্রোইকা যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছে। মাও-এর সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তত্ত্বের পর এমন জমজমাট মার্কসবাদী-বিতর্ক আমরা দেখি নি।

যাঁরা এখনই পেরেস্ত্রোইকা সম্পর্কে চূড়ান্ত রায় দিয়ে দিতে চান—পক্ষে বা বিপক্ষে—আমি তাঁদের দলে পড়তে রাজি নই। কারণ, প্রথমত, তাৎক্ষণিক-উপলব্ধিজাত জ্ঞানে সব সময়েই ভুল থাকার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্যের এই গোটা সময়টা সম্পর্কে আমাদের তথ্যঋদ্ধ জ্ঞান কতটুকু, সেটা নিশ্চয়ই বিচার্য। এবং কার্যত পেরেস্ত্রোইকা হয়তো এই সবেমাত্র বাস্তবে প্রযুক্ত হতে শুরু করেছে। তার ফলাফলের ইঙ্গিতটুকু অন্তত আমাদের হাতে আসা প্রয়োজন—কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছনোর আগে।

কিন্তু। একটা বড়ো কিন্তু থেকে যায় এই নীতির আন্তরিকতা সম্পর্কে—যখন দেখা যায় পেরেস্ত্রোইকার অঙ্গ হিসাবে আবার নতুন করে গোরবাচেভ নেতৃত্ব 'ডিস্তালিনাইজেশন' কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। স্তালিনের আমলে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত, বিশ্বাসঘাতক রূপে আখ্যাত বুখারিন-জিনোভিয়েভ-রায়কভদের মরণোত্তর পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। কথাবার্তা চলছে ট্রটস্কিকেও তাঁর হৃত সম্মান ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে। "মস্কো ট্রায়াল"কে বিচারের নামে প্রহসন বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে। মস্কো ট্রায়ালের বিচারপতি ভিশিন্স্কিকে মৃত্যুর পরও গোরবাচেভ জমানায় নতুন করে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে।

প্রশ্ন আসে—কেন? ১৯৫৬ সালেই তো ক্রুশ্চভ বিংশ পার্টি কংগ্রেসে স্তালিন এবং স্তালিন-নীতির প্রতি এক দুর্বার আক্রমণ হেনেছিলেন। আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় প্রেক্ষাপটে স্তালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত সি পি এস ইউ (বি)-র তত্ত্ব-কৌশল প্রয়োগ—সমস্ত কিছুই তিনি বর্জন করেছিলেন। আমদানি করেছিলেন '··· সমগ্র জনগণের রাষ্ট্র, শান্তিপূর্ণ-সহাবস্থান-প্রতিযোগিতা এবং উত্তরণের পথ'-এর তত্ত্ব। শুধু এখানেই তিনি থেমে যান নি। স্তালিনের মরদেহ লেনিনের পাশ থেকে অপসারিত করে তাঁকে সমাধিস্থ করেছেন। তারপর গত দীর্ঘ তিরিশ বছরে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালকবর্গের কাছে স্তালিন অচ্ছুত, স্তালিন-পন্থা তাঁদের কাছে বিভীষিকা। ব্রেঝনেভ আমলেও অবস্থার বিশেষ একটা হেরফের ঘটে নি। এ আমলে প্রকাশিত 'দ্য গ্রেট পেট্রিয়টিক ওয়রে' ইতিহাসের প্রয়োজনে স্তালিনের নাম যতটুকু উচ্চারণ না করলে নয়, ঠিক ততটুকুই হয়েছে, কোথাও স্তালিনের ভূমিকার মূল্যায়নের চেষ্টা হয় নি।

তাহলে, ১৯৫৬ থেকে গোরবাচেভ ক্ষমতাসীন হওয়ার সময় ১৯৮৫ সাল—এই দীর্ঘ উনত্রিশ বছরে, আমরা তো জানতাম, সোভিয়েত জনমানসে স্তালিন নিশ্চিহ্ন। শুধু আমাদের মতো কিছু "ডাইহার্ড স্তালিনিস্ট" এখনও স্তালিনকে সভ্যতার রক্ষাকর্তারূপে দেখে থাকি। যে সোভিয়েত রাশিয়ার পার্টি এবং রাষ্ট্রের পরিচালকবর্গের মধ্যে স্তালিনের লেশমাত্র আর কোথাও অবশিষ্ট নেই—সেখানে এই 'নতুন, বৈজ্ঞানিক, বাস্তবসম্মত' পেরেস্ত্রোইকার সঙ্গে কীভাবেই বা ডিস্তালিনাইজেশন খাপ খায়? কেন তেড়েফুঁড়ে নতুন করে স্তালিনের নৃশংসতা, একনায়কত্বের ভূরি-ভূরি 'তথ্য' এবং কাহিনী সোভিয়েত পত্র-পত্রিকা ভরিয়ে তুলছে? এ থেকে যদি আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে—তাহলে কি স্তালিনকে কবরস্থ করার দীর্ঘ তিরিশ বছর পরও, তাঁর যাবতীয় রচনা-প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়ার পরও, আজও সোভিয়েত জনমানস থেকে স্তালিনকে মুছে ফেলা সম্ভব হয় নি—তবে কি প্রশ্নটি খুবই অযৌক্তিক হবে? আর সেজন্যেই যে নবোদ্যমে স্তালিন-নিশ্চিহ্নকরণ অভিযান চালাচ্ছেন গোরবাচেভ—এমন একটা ধারণায় এলে তাও কি অসঙ্গত হবে?

গোরবাচেভের স্তালিন-বিরোধিতার দু-একটি অসঙ্গতি এখানে তুলে ধরা সম্ভবত খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বাটলার অ্যানড ট্যানার লিমিটেডের দ্বারা মুদ্রিত গোরবাচেভের বই "পেরেস্ত্রোইকা—নিউ থিঙকিঙ ফর আওয়ার কানট্রি অ্যানড ওয়ার্লড"-এ তিনি যেসব কথা বলেছেন, তার মধ্যে একটি হল—সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকার্য কি ব্যাহত হয়েছে পাঁচবছরব্যাপী (১৯১৭-২২) ব্যাপক গৃহযুদ্ধ এবং চোদ্দটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ দ্বারা সোভিয়েত রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর? না, তা হয় নি। সে সময়ে কোন্ নীতি নেওয়া হয়েছিল? একটি ইনডাসট্রিয়ালাইজেশন এবং অপরটি কলেকটিভাইজেশন। এর কোনোটিই কি সমাজতন্ত্রবিরোধী ছিল? না, বরং গোরবাচেভের ভাষ্য অনুযায়ীই, এই নীতি সে সময়ে যদি সোভিয়েত না নিত, তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওই ব্যাপক বিশাল আঘাত কোনোমতেই সামলাতে পারত না সদ্য গৃহযুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণে বিপর্যস্ত শিশু সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্র। যে কথাটা গোরবাচেভ কোথাও উল্লেখ করেন নি, সেটা হল, এই সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতির নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল কার আমলে? কার নেতৃত্বে এবং পরিচালনায়? এমন-কী, গোরবাচেভ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির সময়সীমা পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতি তেমনভাবে কোথাও বাধা পেয়েছে বলে মনে করেন নি, যদিও তিনি উল্লেখ করেছেন—অনেক ভুলভ্রান্তি এ সময়ে ঘটেছে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সংকটকাল হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন ছয় আর সাতের দশককে।

গোরবাচেভের ভাষ্য অনুযায়ীই তাহলে কী করে স্তালিন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে পারেন? লেনিনের মৃত্যুর (১৯২৪) পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি (১৯৪৫)—এই দীর্ঘ একুশ বছর জুড়ে যদি সমাজতন্ত্রের অগ্রগতিই ঘটে থাকে, তবে তা ঘটেছিল কার নেতৃত্বে? এ সময় জুড়েই তো স্তালিন সি পি এস ইউ (বি)-র নেতা। ১৯৪৫ থেকে স্তালিনের মৃত্যু (১৯৫৩)—এই আট বছরে যদি ধরেও নেওয়া যায় স্তালিনের অধঃপতন ঘটেছিল, তাহলেও কি পূর্বের দীর্ঘ সময় জুড়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং নির্মাণকার্যে তাঁর প্রয়াসকে অস্বীকার করা সম্ভব?

স্তালিনের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ একটাই। স্তালিন স্বৈরাচারী; তিনি পার্টি গণতন্ত্রের ধার ধারতেন না, এবং "ওয়র কমিউনিজম"-এর ধুয়ো তুলে তিনি তাঁর প্রবল প্রতিপক্ষদের এবং বহু নির্দোষ এবং ফ্যাসিস্ত-বিরোধী সংগ্রামে এগিয়ে-থাকা বীরদের হত্যা করেছেন—কমিউনিস্ট নৈতিকতা তো দূরের কথা, এমন-কী সাধারণ বুরজোয়া নৈতিকতাকেও বিসর্জন দিয়ে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে: এই দুটো স্ববিরোধী বক্তব্যকে কোন্ যুক্তিতে মেলানো সম্ভব? স্তালিন যদি স্বৈরাচারীই হন, এবং পার্টির ভেতর গণতন্ত্রের কোনো স্থান না থাকে, তবে স্তালিন কোন্ পার্টির নেতা ছিলেন? নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট পার্টির নয়। তবে গোরবচেভদের বলতে হয়—১৯২৪-৫৩ সালে সোভিয়েতে ছিল স্তালিন একনায়কত্ব; কোনো কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না। সে কথা তাঁরা বলেন নি। এ ছাড়াও, এই ব্যাখ্যা থেকে সঙ্গত প্রশ্ন আসে: তাহলে স্তালিন এবং তার অনুচররা কোন্ শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব-করছিলেন? শ্রমিকশ্রেণীর নয় নিশ্চয়ই—কারণ কমিউনিস্ট পার্টি নিশ্চিহ্ন করার কাজটা আর যাঁরাই করুন, শ্রমিকশ্রেণীর নেতাদের আদৌ করার কথা নয়। সুতরাং মার্কসবাদসম্মত বিশ্লেষণ অনুযায়ী বলতে হয়, স্তালিন শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে অন্য কোনো শ্রেণীর হয়ে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। কারা সেই শ্রেণী? তাঁরা কি সমাজতন্ত্রের বিকাশ চাইতে পারেন? এর স্পষ্ট জবাব—না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে যখন গোটা দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক "পিতৃভূমি রক্ষার লড়াই"য়ের নাম করে একদেশের শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে অন্য দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সংঘর্ষকে ন্যায়সঙ্গত বলে দাবি করল, তখন তাদের বিশ্বাসঘাতক এবং পুঁজিপতিদের অনুচর বলতে লেনিনের কোথাও আটকায় নি। সুতরাং, গোরবাচেভদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তাঁরা বলতে বাধ্য—স্তালিন হিটলারের থেকেও পুঁজিবাদের জঘন্য প্রতিনিধি। কিন্তু তাহলে কী করে সেই স্তালিনের আমলেই সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতি ঘটতে পারে, অন্তত ১৯৪৫ পর্যন্ত—এর কোনো বিজ্ঞান- এবং মার্কসবাদ সম্মত কী ব্যাখ্যা গোরবাচেভ দিতে পারেন, সেটা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

নতুন করে স্তালিনবিরোধী যেসব সমালোচনা আসছে তার মধ্যে আবার "লেনিনের উইল" প্রসঙ্গটিকে টেনে আনা

হয়েছে। যদিও এ প্রসঙ্গ নিয়ে বহু বিতর্ক অতীতে হয়ে গেছে, তবুও এখানে একটি প্রাসঙ্গিক তথ্য দেওয়া যেতে পারে।

মার্কিন সাংবাদিক ম্যাক্স ঈসটম্যান, যিনি নিজে ট্রটস্কি-পন্থী এবং ট্রটস্কির অনুবাদক, তিনিই প্রথম এই "উইল"টি প্রকাশ করেন। তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী, লেনিনের এই "উইল"-টির রচনাকাল ১৯২৩ এবং স্তালিন "উইল"টি কুক্ষিগত করেন। কারণ এই উইলে লেনিন, বলশেভিক পার্টির সাধারণ সম্পাদকরূপে ট্রটস্কিকে স্তালিনের থেকে বেশি যোগ্য বলে বর্ণনা করেছেন।

এই উইল সম্পর্কে প্রথম দিকে স্বয়ং ট্রটস্কির বক্তব্য কী ছিল? ৮ই অগস্ট, ১৯২৪-এ, ট্রটস্কি "নিউইয়রক ডেইলি ওয়ারকার"-এর কাছে পাঠানো একটি চিঠিতে লিখেছেন—

"উইল সম্পর্কে বলা যায়, লেনিন এমন কিছু রেখে যান নি। পার্টির সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের প্রকৃতি এবং পার্টির যে নিজস্ব চরিত্র, তাতে এ ধরনের 'উইল' লেনিনের পক্ষে রেখে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব।

'উইল' নাম দিয়ে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীরা (emigre), বিদেশী পুঁজিপতিরা এবং মেনশেভিকরা লেনিনের একটি চিঠি থেকে (পুরোপুরি বিকৃত করে) বারবার উদ্ধৃত করেন, যে চিঠিতে সংগঠন সম্পর্কিত লেনিন কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন।

এই গোপন এবং রীতিবিরুদ্ধ 'উইল' সম্পর্কে যত কথা—তা লেনিনের প্রকৃত ইচ্ছার বিরুদ্ধে, তাঁর সৃষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি নোংরা উদ্ভাবন মাত্র।[১]

১৯২৫-এ ট্রটস্কির নিজস্ব এই পরিষ্কার মন্তব্যের পরও ট্রটস্কিপন্থীরা এই "উইল" সম্পর্কিত প্রচার চালিয়ে গেছেন। আর এখন তো সোভিয়েত পার্টির নেতারাই এই "উইল"কে দলিল হিসেবে পেশ করে, স্তালিনের 'কুকীর্তিগুলো' প্রমাণ করছেন।

যখন পেরেস্রোইকার প্রবক্তারা ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন করছেন, যখন অতীতে যাঁদের ওপর 'অন্যায়' করা হয়েছিল, প্রত্নতাত্ত্বিক নিষ্ঠায় তাঁদের অতীত সম্পর্কে 'সত্য' খুঁজে তাঁদের পুনর্বাসন দিচ্ছেন, তখন স্তালিন সম্পর্কেই তাঁরা কেন এত অসহিষ্ণু, এত একপেশে! তাঁদের 'নতুন চিন্তা'র সঙ্গে কি এই মনোভাব খাপ খায়? আমরা এ কথা বলি না—স্তালিন ভুলভ্রান্তির ঊর্ধ্বে ছিলেন। স্তালিন কেন, কোনো মানুষই তা নন। এবং স্তালিনের অনেক ভুলের জন্য তিনি সমালোচিত হয়েছেন। মাও নিজেই চীন বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্য বহু ক্ষেত্রেই স্তালিনের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেছেন। পরে স্তালিনের 'দ্বান্দ্বিক চিন্তা'র মধ্যে যে অসঙ্গতিগুলো ছিল, তা দেখিয়েছেন—এমনকী "দি ইকনমিক প্রবলেমস অব সোস্যালিজম ইন দি ইউ এসএস আর"-এ স্তালিনের সেসব ভুল চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ ছিল, তারও তিনি সমালোচনা করেছেন। স্তালিনের আমলে 'ব্যক্তিপুজো' হয়েছিল, মাও নিজেই এক সরস গল্পের মধ্যে তা ব্যক্ত করেছেন—মাও এবং স্তালিনের ছবিতে, খোদ চীনে স্তালিনকে দু-ইঞ্চি লম্বা দেখানো হত। বাস্তবে মাও ছিলেন স্তালিনের থেকে লম্বা। কিন্তু এত সবেও মাও কি স্তালিনকে খারিজ করেছিলেন? না, তিনি বলশেভিক বিপ্লবে স্তালিনের ভূমিকা, গৃহযুদ্ধ এবং সাম্রাজ্য-বাদী আগ্রাসনকালে তাঁর ভূমিকা, বিধ্বস্ত সোভিয়েত অর্থ-নীতি এবং সমাজকে চাঙ্গা করে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্ব এবং পরিচালনা—সর্বোপরি, দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে 'সোভিয়েত দেশ তথা মানবসভ্যতার রক্ষক' হিসেবে স্তালিনের ভূমিকাকে স্মরণ করেবলেছেন যে সামগ্রিক বিচারে স্তালিনের নেতিবাচক দিক থেকে তাঁর ইতিবাচক দিক অনেক অনেক বেশি। তাই তাঁকে একজন প্রকৃত মার্কসবাদীর সম্মানই আমরা দেব—তাঁর থেকে শিক্ষা নেব (অবশ্যই তাঁর ভুলগুলি সম্পর্কে সজাগ থেকে)।

আমার তো মনে হয়, এই পদ্ধতিই ঠিক। কারণ, দ্বান্দ্বিক বিচারপদ্ধতি অনুযায়ী একশো ভাগ ইতি বা একশো ভাগ নেতি বলে কোনো কিছু নেই। ইতি-নেতির ঐক্য এবং সংগ্রামের অবস্থানই বাস্তব। সেক্ষেত্রে কোনো-কিছুর মূল্যায়নে আমাদের দেখতে হবে, এই সংগ্রামে কে জয়ী। যদি দেখা যায়, কোনো মানুষের ক্ষেত্রে ৬০ ভাগ ইতি, ৪০ ভাগ নেতি—তাহলে বলতেই হয়—ইতির জয়। এবং সেই মানুষটির মূল্যায়নে ইতিবাচক দিকই প্রধান হওয়া উচিত।

এই পদ্ধতি তো এমন-কী লেনিনও বহু আগে প্রয়োগ করেছেন। ১৯০৫-এর ব্যর্থ বিপ্লবের পর প্লেখানভের উক্তির (দে শ্যাড নট হ্যাভ টেকন্ আপ আর্মস) তীব্র শ্লেষাত্মক সমালোচনার সময়েও কিন্তু তিনি রাশিয়ায় মার্কসবাদ প্রচারের ক্ষেত্রে প্লেখানভের অগ্রণী ভূমিকাকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিয়েছেন। কাউৎস্কিকেও তিনি একইভাবে চিত্রিত করেছেন। কাউৎস্কির "রোড টু পাওয়ার" গ্রন্থ লেখার সময় পর্যন্ত লেনিন তাঁকে একজন প্রকৃত মার্কসবাদীর সম্মানই দিয়েছেন—পরবর্তী কালে তাঁর বিশ্বাসঘাতকতাকে তুলে ধরেছেন তথ্য, তত্ত্ব এবং যুক্তির দ্বারা।

স্তালিনের বিরুদ্ধে এই 'নতুন চিন্তা'র প্রবক্তারা একের পর এক যেসব 'তথ্যযুক্ত দলিল' পেশ করে চলেছেন, যেসবের 'অভ্রান্ততা' সম্পর্কে তাঁদের মনে অন্তত লেশমাত্র সংশয় নেই, তার অন্তত একটা নমুনা পেশ করার লোভ সংবরণ করা যাচ্ছে না। দলিলটা হল 'বুখারিনের শেষ চিঠি।'

আনা লারিনা, যিনি তাঁর বাবার বন্ধু বুখারিনকে বিয়ে করেন, তিনি "ওগোনিয়ক" (OGONYOK) পত্রিকার সাংবাদিক ফেলিকস মেদভেদভকে এক সাক্ষাৎকার দেন। সেই সাক্ষাৎকারের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু তুলে ধরছি।

'কমরেড মিখাইল গোরবাচেভ, জেনারেল সেক্রেটারি, সি সি—সি পি এস ইউ……আমি আপনার কাছে আমার স্বামী নিকোলাই বুখারিনের মরণোত্তর পার্টি পুনর্বাসনের প্রশ্নটি উত্থাপিত করছি শুধুমাত্র আমার পক্ষ থেকে নয়, স্বয়ং বুখারিনের পক্ষ থেকেও। কারণ তিনি ১৯৩৭ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)-এর প্লেনারি অধিবেশনে (অধিবেশন একদিনেরও বেশি সময় ধরে চলেছিল) যোগ দিতে যাওয়ার সময়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর আর ফিরে আসা হবে না। সে সময়ে যেহেতু আমি অনেক ছোটো ছিলাম, সেইজন্যে আমার বয়সের সুবিধাটুকু বিবেচনা করে তিনি আমাকে নির্দেশ দেন যে তাঁর নামে, এই যে কালিমা-লেপন, তার বিরুদ্ধে তাঁর মৃত্যুর পরও যেন আমি লড়াই করি……'শপথ করো, তুমি এই কাজ করবে।' এবং আমি শপথ করি। এই শপথ অমান্য করার অর্থ আমার বিবেকের সঙ্গে সংঘাত…

'বুখারিনের গ্রেপ্তারের কয়েকদিন আগে তিনি একটি চিঠি লেখেন—'ভবিষ্যৎ প্রজন্মের পার্টি-নেতাদের প্রতি'। তল্লাসির আশঙ্কায় তিনি তাঁর স্ত্রীকে চিঠিটি মুখস্থ করতে বলেন। যখন বুখারিন নিশ্চিত হন যে তাঁর স্ত্রী চিঠিটি ভালোভাবেই মনে রাখতে পারবেন তিনি হাতে-লেখা চিঠিটি নষ্ট করে ফেলেন। তাঁর বন্দীত্বের এবং নির্বাসনের সমস্ত সময়ে লারিনা প্রার্থনার মতো এই চিঠির বিষয় পুনরাবৃত্তি করতেন।'[২]

সময়টা ১৯৩৭।

লারিনার সেই শ্রুতিতে ধরে রাখা চিঠিই প্রকাশিত হল ১৯৮৭-তে। 'নতুন চিন্তা'র প্রবক্তারা যে কতখানি তথ্যনিষ্ঠ তা বলার জন্য এর ওপর নিশ্চয়ই আর কোনো মন্তব্য করার প্রয়োজন নেই।

মার্কসবাদই বলে চরম সত্য বলে কিছু নেই। আজকের সত্য কাল বাতিল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে যা সত্য, সেটা সে সময়ের জন্য সত্যই থেকে যায়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে পুরনো অনেক সত্য ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হচ্ছে। সে কারণে কিন্তু সে সময়ের সত্যপ্রবক্তারা বাতিল হন না। নিউটনের অনেক তত্ত্বই আজ অকেজো। কিন্তু প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে তাঁর সময়ে তাঁর অবদানকে কেউ ছোটো করে দেখেন না। কারণ তাঁর উদ্ভাবিত সত্যের ওপর দাঁড়িয়েই তাঁর তত্ত্বকে অকেজো বলে জানা গেছে। "দি প্রিন্সিপিয়া" ব্যতীত আজ বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি সম্ভব হত না। সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। স্থান-কাল-পাত্র এবং একটি নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থায় স্তালিনের ভূমিকার মধ্যে যে সত্য, যে ইতিবাচক অবদান মানব-সভ্যতাকে আজও অগ্রগতির পথে নিয়ে চলেছে—সে সত্যকে হাজারো কৌশলে, প্যাঁচপয়জারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা সম্ভব নয়। সোভিয়েতে আবার নতুন করে 'ডিস্তালিনাইজেশন'-এর মরিয়া অপচেষ্টা তার একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ।

সূত্র

১. The Great Conspiracy—Michael Sayers & Albert E. Kahn. First Published : 1947, Reprint by Red Star Press. 1975. Page : 209 [অনুবাদ লেখকের].

২. Sputnik—Digest of the Soviet Press. Issue no : May 1988. Page : 110 & 116 [অনুবাদ লেখকের].

প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়
হাওড়া

২

প্রসঙ্গ প্রেমানন্দ

সেপটেমবর সংখ্যার 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অক্লান্ত যোদ্ধা বাসব প্রেমানন্দর সঙ্গে সাক্ষাৎকার পড়লাম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ২১-৮-৮৮ তারিখে উনি নদীয়া জেলার এই প্রত্যন্ত স্থানে এসেছিলেন, এবং সেদিন সন্ধ্যায় প্রচণ্ড দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও করিমপুর থানার ছুটি গ্রামে

তিনি তাঁর 'মিরাকল শো' দেখান। অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা 'উৎস মানুষ'-এর সাথে হাত মিলিয়েছিলেন স্থানীয় কিছু মুক্তমনের যুবক-যুবতী। সৌভাগ্যক্রমে আমরা দু-একজন সেই অনুষ্ঠানের একটিতে আমন্ত্রিত ছিলাম। বিরামহীন বৃষ্টির কারণে স্থানীয় এক ভদ্রলোকের বাড়ির বৈঠকখানা ঘরের স্বল্পপরিসরে ঠাসাঠাসি লোকের মাঝে শো করতে হয়েছিল। প্রথমত অনেকেই এটাকে নিছক 'ম্যাজিক শো' ভেবেছিলেন। সাঁইবাবার বিভূতি ছিটিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করতেই দর্শকদের মাঝে তা সংগ্রহ করতে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। পরে প্রেমানন্দ কৌতুকের ঢঙে জানালেন যে, তিনি আর সাঁইবাবা একই দোকান থেকে বিভূতি ক্রয় করেন। এরপর তিনি একের পর এক বাবাজীদের অলৌকিক বুজরুকির চতুর উৎসস্থল সম্পর্কে সকলকে সজাগ করে দিতে চান। অগস্ট মাসেরই শেষের দিকে কলকাতায় এ ব্যাপারে তাঁর একটা সাংবাদিক সম্মেলন হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত হতাশ হলাম সেই সম্মেলনের কোনো যুক্তিনিষ্ঠ সংবাদ বড়ো-বড়ো কাগজগুলিতে না দেখে। দু একটি বাদে।

এবারে প্রেমানন্দর মতামত সম্পর্কিত একটু অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাই। তিনি দাঙ্গার প্রসঙ্গে ধর্মান্ধতাকে দায়ী করে সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সাংস্কৃতিক প্রচার আন্দোলনের আশু প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। তিনি যথার্থই রাজনীতিবাজদের কুসংস্কারগ্রস্ত, irrational বলেছেন। দক্ষিণপন্থীদের কথা ছেড়েই দিলাম, কিন্তু মহান্ বিপ্লবের স্বপ্নদেখা বহু বামপন্থী নেতাকর্মীও আজ পর্যন্ত বিপজ্জনকভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন তথা সাম্প্রদায়িক। বহু ক্ষেত্রেই তাঁরা অমানবিক। তাই আজও বামপন্থী বিধায়কের ঘরে নিয়ত লক্ষ্মীপুজা হয়, বামপন্থী পাত্র পণবিরোধী মিছিল সেরে এসে 'মা-বাবার কথামতো' বিয়েতে বিস্তর পণগ্রহণ করেন। অথচ এঁদেরই কথায় প্রশ্নহীন আনুগত্যের শিকার হয় লাখ লাখ 'বোকা' মানুষের দল। প্রচারের যুগে জনচেতনাকে জাগ্রত করার বিরাট ক্ষমতা ধরলেই এই রাজনৈতিক দলগুলি সাধারণত দলীয় পতাকার স্বার্থ ব্যতিরেকে সুস্থ কোনো প্রচার অভিযানে 'অযথা' সময় নষ্ট করতে চায় না। তাই প্রেমানন্দর এই প্রয়োজনীয় মিরাকল শো' অনেক জায়গায় দেখানো সম্ভব হয় না। এটা অতীব দুঃখজনক।

প্রেমানন্দর সঙ্গে সামান্য আলোচনায় জানলাম যে, বিশ্বের অন্যতম বিত্তশালী সাঁইবাবার আকাশ থেকে' (?) সোনাদানা আমদানির বিরুদ্ধে তিনি অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টে যে মামলা করেছিলেন তাতে মহামান্য আদালত নাকি রায় দিয়েছেন এ ব্যাপারে আদালতের কিছু করণীয় নেই, কেননা সাঁইবাবা 'শূন্য' থেকে ওইসব সামগ্রী নিয়ে আসেন এবং ওই 'শূন্য অঞ্চল' আদালতের এক্তিয়ারের বাইরে! শিক্ষকদের একনায়কতন্ত্রী নিষ্ঠুর কর্তৃত্ব বিষয়ে উনি যা বলেছেন তা কখনই সহজ সাধারণীকরণের সূত্র হতে পারে না। শেষত বলি, অলৌকিকে বিশ্বাস না করলেও এখনও কিছুকিছু ঘটনা সংঘটিত হয়—'বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না'। এ ব্যাপারে কিছু আলোকপাত হোক্ না।

বিপ্লব বিশ্বাস
করিমপুর : নদীয়া

৩

একটি সঙ্গত অভিযোগ

চতুরঙ্গ পত্রিকার জুন ১৯৮৮ সংখ্যা পড়লাম। সংখ্যাটি বিশেষভাবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রয়াণের পরে প্রকাশিত হওয়াতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লিখতে বাধ্য হচ্ছি যে—১৯৮১ সালে জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি "আভা" পত্রিকা ে মেন্দ্র মিত্রের জীবিতকালে তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকটি বৈঠক করে "প্রেমেন্দ্র মিত্র সংখ্যা" নামে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিল। তাতে নানা লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্বন্ধে নানা ধরনের আলোচনা করেছিলেন এবং পরিশেষে তাঁর রচিত লেখার একটি গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীঅনিলকুমার দত্ত তাঁর "শিল্প ও সাহিত্য" পত্রিকার ৭ম বর্ষ জুন / জুলাই ১৯৮৩ সালে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে নিয়ে একটি সংখ্যা প্রকাশ করেন—এই সংখ্যায় তিনি "আভা" পত্রিকায় প্রকাশিত গ্রন্থপঞ্জী হুবহু নকল করে ছাপেন, অথচ পত্রিকার কোনো স্বীকৃতি দেন নি। সম্প্রতি আপনার প্রকাশিত "চতুরঙ্গ" পত্রিকায় শ্রীঅনিলবাবুর বইয়ের স্বীকৃতি প্রকাশিত হয়েছে—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বীকৃতি পাবার কথা "আভা" পত্রিকার। পত্রিকার ওই বিশেষ সংখ্যা আপনার কাছে পাঠালাম।

দ্বিতীয়ত, আর-একটি তথ্যগত ভুল আছে—বীণা দেবী প্রেমেন্দ্র মিত্রের দ্বিতীয়া স্ত্রী ছিলেন এবং পুত্রকন্যারা সবাই তাঁর প্রথমা স্ত্রীর ঔরসজাত। নিজের সন্তানের মা'তাই বীণা দেবী তাঁদের মানুষ করেছিলেন। প্রথমা স্ত্রী টাইফয়েডে মারা যান। সন্তানরা সকলেই তখন নিতান্ত শিশু ছিল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁদের জানা ছিল না যে তাঁরা কেউ বীণা দেবীর সন্তান নন।

আপনার পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

রেখা চট্টোপাধ্যায়
কলকাতা-২৬

৪

আরও দু-একটি কথা

অগস্ট ১৯৮৮ সংখ্যায় বাঙলা আধুনিক গান সম্বন্ধে আমার যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে আরও দু-একটি কথা জুড়তে চাই।

এক : কিছু-কিছু ছোটো রেকর্ড-প্রতিষ্ঠান শুভ্র মুখোপাধ্যায়, জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়, কার্তিক কুমার, মীনা মুখোপাধ্যায়, মাধুরী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নবীন শিল্পীদের রেকর্ড প্রকাশ করেছেন। এঁরা প্রতিশ্রুতিমান শিল্পী। কিন্তু বড়ো প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে উৎসাহ না পাওয়ার ফলে এঁদের গান ঘরে-ঘরে পৌঁছতে পারছে না।

দুই : আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র বাঙলা আধুনিক গানের প্রচারে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে, কলকাতার যুবদর্শন সেই তুলনায় প্রায় কিছুই করছে না। ঘটনাটি দুঃখজনক।

তিন : আজকাল গানের জলসার চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। কিন্তু অনেকেরই প্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের অনুষ্ঠানে নিয়ে আসা সম্ভব হয় না। ফলে, তাঁদের জনপ্রিয় গানগুলি অনুরূপ কোনো কণ্ঠে শোনানোর রেওয়াজ দেখা দিচ্ছে। দৈবক্রমে কিছুটা গান গাইতে পারে এমন অনেক ছেলেমেয়ে কোনো-রকম সাধনা ছাড়াই কপিসিঙার বা নকল-গাইয়ের ভূমিকায় নামছে। এটাও বাঙলা আধুনিক গানের নতুন একটা অস্বাস্থ্যের লক্ষণ।

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
বাঘাসত

৫

বঙ্কিম নিঃসন্তান ছিলেন না

চতুরঙ্গের জুন ১৯৮৮ সংখ্যায় অধ্যাপক আহমদ শরীফ তাঁর "বঙ্কিমচন্দ্রের মনোজগৎ" প্রবন্ধের এক জায়গায় (পৃ ১২১) লিখেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন।' এ তথ্য ঠিক নয়। শরৎকুমারী, নীলাব্জকুমারী আর উৎপলকুমারী নামে তাঁর তিন কন্যা ছিলেন। (দ্র. "বঙ্কিম-রচনাবলী", সাহিত্য সংসদ সংস্করণ।)

অনিলচন্দ্র সাহা
বাটানগর। ২৪ পরগনা